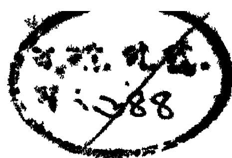
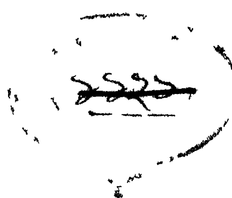
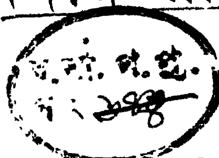





সংখ্যা ৩৪১৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমালোচনী।



প্রথম ভাগ।

উগ্র-ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি প্রভৃতি মাসিক পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ইহাতে বঙ্গদেশের বিবরণ বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তি, বয়ঃক্রম-বিচার, কারক,
বিভক্তির আকৃতি, সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতির
সঙ্গে ইহার ঘনিষ্টতা, ভাষার সংগঠন, বঙ্গীয়
বর্ণমালার উৎপত্তি বিবরণ প্রভৃতি
বিষয়গুলি সুন্দররূপে লিখিত
হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার-বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত।

২০৩। ২ নং করণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

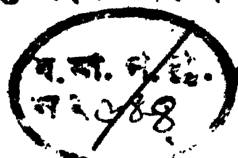
কলিকাতা

৪৬ নং ব্রজনাথ মিত্রের লেন, ঝামাপুকুর, "নূতন আর্য্যমিসন যন্ত্রে"
ডি, ডি, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৯৫।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমালোচনী।



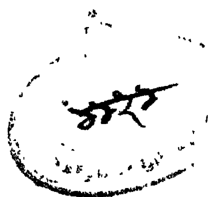
প্রথম ভাগ।

উগ্র-ক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি প্রভৃতি মাসিক পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ইহাতে বঙ্গদেশের বিবরণ, বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তি, বয়ঃক্রম-বিচার, কারক, বিভক্তির আকৃতি, সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতির সঙ্গে ইহার ঘনিষ্টতা, ভাষার সংগঠন, বঙ্গীয় বর্ণমালার উৎপত্তি বিবরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার-বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত।

২০৩। ২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।



কলিকাতা

৪৬ নং ব্রজনাথ মিত্রের লেন, শ্যামাপুকুর, "নূতন আর্য্যমিসন যন্ত্রে"
ডি, ডি, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৯৫।

বিজ্ঞাপন।

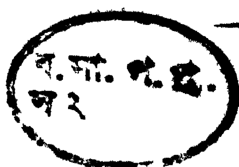
বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনীর প্রথমভাগ প্রচারিত হইল। মৎপ্রণীত কাব্যকুসুমের ভূমিকায় কয়েকখানি পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচন দেখিয়া অনেকে আমাকে বিস্তৃতরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচন লিখিতে অনুরোধ করেন; তাঁহাদের অনুরোধেই আমি একার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। দুই একটী গ্রন্থের সমালোচন লিখিয়া কোন কোন বন্ধুকে দেখাইলে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, 'বাঙ্গালা ভাষার' সমালোচন লিখিতে হইলে, বঙ্গদেশ কোথায়, বাঙ্গালা ভাষাই বা কি? ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে; ইহার কারক-সমাসাদি কিরূপ, উহার বয়ঃক্রম বা কত? অগ্রে এসব লিখিয়া পশ্চাৎ ঐ ভাষার সমালোচন লেখা সঙ্গত; নতুবা আদ্যোপান্ত সুসম্পন্ন হইবে না; অতএব আপনি অগ্রে তাহাই করুন। বন্ধুদের এই যুক্তিযুক্ত কথায় আস্থাবান হইয়া তাহাই করিতে উদ্যত হইলাম। দুই চারিখানি ইতিহাস পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের বিবরণ লিখিলাম বটে; কিন্তু বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তি লিখিতে গিয়াই বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম; দেখিলাম, উহার মূল যেখানে সে ভাষা আমি অত্যল্প জানিলেও যে যে শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়া আসিয়া বঙ্গীয় শাখার বিকাশ হইয়াছে, সেই সেই শাখাপ্রশাখাগুলি আমার জানা নাই; জানিবার জন্য অগত্যা আমাকে ফারসী, উর্দ্দু, হিন্দী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, মারহাটি, গুজরাটী, ভোজপুরী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, তিব্বতী প্রভৃতি নানা ভাষা অল্পাধিক শিক্ষা করিতে হইল। এতগুলি ভাষা আবশ্যকমত শিক্ষা করিয়া ঐ ঐ বিষয়গুলি লিখিতে লিখিতেই সমালোচনীর আকার বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং, ঐ বিষয়গুলি লইয়াই প্রথমভাগ প্রচার করিলাম, ভবিষ্যতে দ্বিতীয়ভাগে হস্তক্ষেপ করা যাইবে, এইরূপ মানস আছে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অনেক কূট তর্ক ও সূক্ষ্ম গবেষণার অধীন হইয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল তন্ন তন্ন করিয়া যে কাণ্ড করিয়াছি, তাহাতে এই নাটক নবেলের দেশে সাফল্যের আশা কোথায় এবং কিরূপ তাহা জানি না। পাঠকবর্গ যদি এতৎপাঠে কিঞ্চিৎও উপকার বা আহ্লাদবোধ করেন, তাহা হইলেই আমার এতটা পরিশ্রম সার্থক হয়। অলমিতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা।
৫ই চৈত্র, সন ১৩০১ সাল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মা।

বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমালোচনী।



উপক্রমণিকা।

হুজুকে পড়িয়াই বঙ্গদেশের দফারফা হ'ল। অন্তঃসার শূন্য হুজুকের হুড়াহুড়িতে বেহুঁস হইয়া, বাঙ্গালী হস্তাস্ফালন পূর্ব্বক লম্ফঝম্প করিতেছে, দেখিলে হাসিও আইসে, আবার অশ্রুসংবরণও দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। এক মহাত্মা বঙ্গগর্ভে জন্মিয়া, চিরদিন তাহারই ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া, কয়েকদিনমাত্র বিমাতার বাহ্য সমাদরে এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, স্বীয় গর্ভধারিণীর নাম পর্য্যন্ত ভুলিলেন, তাঁহার কথাগুলি পর্য্যন্ত স্মরণ রহিল না। এপাপ সহিবে কেন? "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" আর্য্যবংশে কি এ অকৃতজ্ঞতা স্থান পায়। অবিলম্বে পাপের ফল ফলিল; বিনা বা অত্যল্প অপরাধেই রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইলেন। শেষে আর কি করেন, রাজনীতির হুজুক তুলিয়া, বৃথা, অকিঞ্চিৎকর, অসম্বদ্ধ প্রলাপে ভারত মাতাইয়া বিষম বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কথায় বলে "বল বুদ্ধি ভরসা, বিশ পেরুলেই করসা"। যেমন বিপৎপাত, অমনি যেন আর তিনিই নন; মুখসর্ব্বস্ব হুজুকপ্রিয় বাঙ্গালীর বলবীর্য্য প্রায়ই এইরূপে "বালবৈধব্য দগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব" অকালে বিলীন হইয়া থাকে। অন্য এক সাধু পুরুষ কয়েকদিনমাত্র বারাণসী ধামে গুরুগৃহে বাস করিয়া দুই একটী দর্শন-শাস্ত্রে লব্ধপ্রসর হইতে না হইতেই, হুজুকের পাল তুলিয়া বঙ্গসাগরে বাঁচ খেলিবার জন্য পাগল হইলেন। ময়ূরের পক্ষে ভূষিত হইয়া বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে গেলেন। সদর্প হস্তাস্ফালনে, সগর্ব্ব বাগ্‌জালে, অভিনব ধরণধারণে, রুচিব্যঞ্জক ভাবভঙ্গিতে, সাধারণকে তৎকালে মুগ্ধ করিলেন বটে কিন্তু, কোন কোন সুচতুর ভিতরের ভাব বুঝিয়া, পার্শ্ব হইতে দুই একটী পালক তুলিয়া অপদস্থ করিবার উপক্রম করাতে, অগত্যা তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বঙ্গসীমান্তে লুক্কায়িত রহিলেন। ইঁহারই হুজুকে আজ কাল কলিকাতায় একবিধ অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এতকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেবল একটী জন্তু আছে, বাবা সাহেব ও বিবি উভয়েরই গুণবিশিষ্ট। নবহুজুক জীবের

দুইটি বিপরীত গুণ দৃষ্ট হয়, চশমা ও শিখা। মৃত কবিবর প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় দাড়ি ও চশমা দেখিয়াই ত গীত বাঁধিলেন—"চাঁপদাড়ি মুখে, চশমা ঢাকা চোকে, ভয়ানক এক ঢঙ্ উঠেছে বাঙ্গালায়"; আজ তিনি জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই এ জীবকে ঢঙের মিলন শব্দে অভিহিত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তার পর সংবাদপত্রের হুজুক। কোন সম্পাদক হয়ত কিছুকাল সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া হাত পাকাইয়া, কেহ বা নর্ম্মেল স্কুলের দুই একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কেহ বা ইংরাজি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যার খতম করিয়া, চতুরানন্দ পঞ্চানন্দ সমভিব্যাহারে সম্পাদকের আসরে নামিলেন; অগাধ-জলসঞ্চারী রোহিতস্থানে গণ্ডুষজল-ফরফরায়মান শফরী উপস্থিত হইল, কাজে কাজেই নাম দেখিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। নারদের রাগ-আলাপের ন্যায় প্রকৃতকে বিকৃত করিতে লাগিলেন। তারপরত সমালোচ্য গ্রন্থে সি, আই, ই, বা কে, সি, আই, ই দেখিলেই একদম মাত। বৈতালিকরূপী মহাত্মারা অমনি "অস্থিবদ্ধধিবচৈচব শঙ্খবৎ বকবত্তথা" বলিয়া তারস্বরে গুণ-কীর্ত্তনে স্বর্গ মর্ত্ত ছাইয়া ফেলিলেন। একালে সু কি ভু কেহ দেখিতে চায় না। হুজুকপ্রিয় বঙ্গদেশে হুজুকওলাদেরই পোয়াবার। দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে করধৃত-কম্পিতযষ্টি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এই হুজুকের ঢেউএ এমনই বিহ্বল হইয়াছে, যে ভবিষ্যতে তাহাদের কাছে "হুজুগেব পরা বেদা হুজুগেব পরাক্রিয়াঃ। হুজুগেব পরা মুক্তি-র্হুজুগেব পরা গতিঃ" না হইয়া দাঁড়ায়। দেশীয়গণ! ভাল চাওত, হুজুক পরিত্যাগ কর। রাজনীতিই বল, আর ধর্ম্মকর্ম্মই বল, আর সমাজসংস্কারই বল, আর দেশ-হিতৈষীতাই বল, হুজুকে কিছুই হইবে না; তজ্জন্য অন্তঃসারবত্তার প্রয়োজন; সুতরাং তৎসংগ্রহেই সচেষ্ট হও; নতুবা, কখনও আর এই অধোগতির দুস্তর মহাপঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

এবার বিদ্যাশিক্ষা ও ইউনিবার্সিটীর হুজুক। আজকালকার ছাত্রগণত ভারতের ভাবী আশাস্থল (Future hopes of India)। তাঁহারাও কম হুজুকশীল নন। তাঁহারা নামে বিদ্যার্থী, কার্য্যে কিন্তু ঠিক বিপরীত। কেননা, প্রকৃত বিদ্যালাভ বোধ হয়, কেহই ইচ্ছা করে না, কেবল পাস করিয়া কিরূপে লোকের নিকট বাহাদুরী মারিব, তজ্জন্যই সকলে বিব্রত। অকারণ চশমা ধরিয়া লোকের নিকট পঠনশীলতার পরিচয় দেওয়া কেন? রাত্রি জাগরণ করিয়া উহার পরিপূরণের জন্য দিবানিদ্রার আবশ্যক কি? জানি, একথার উত্তরে তোমরাত বলিবেই যে, দিবসে তিন ঘণ্টায় যে কার্য্য হইত, রাত্রে এক ঘণ্টায় তাহা হইতে পারে। তজ্জন্যই রাত্রি-জাগরণ করিয়া দিবানিদ্রায় বাধ্য। তোমাদের এ যুক্তি মানা যায় বটে, কিন্তু তোমারা একথা স্বীকার কর কি বলিতে পারিনা, যে, রাত্রিতে এক ঘণ্টা জাগিয়া দিবসে সাত ঘণ্টা ঘুমাইলেও উহার ক্ষতিপূরণ হয় কি না সন্দেহ। তবে প্রকৃত নিদ্রার সময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া আয়ু কম

করা বৃথা। তোমাদেরত রাধিকা বাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা পড়া আছে (১৮৬৪ সালে স্বাস্থ্যরক্ষা প্রথম মুদ্রিত হইয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক-রূপে নির্দ্ধারিত হয়, তদবধি আজ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর সেইরূপই পাঠ্যপুস্তক আছে, এবং গ্রন্থকারের প্রপৌত্রের জীবিতকাল পর্য্যন্তও থাকিবে বলিয়া বোধ হয়। এই সময় আমাদের চক্ষে অনেক বেশী লাগে, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষদিগের চক্ষে তত বেশী নয়, কারণ আমাদের মনুষ্য বর্ষ, এবং তাঁহাদের ব্রাহ্ম বর্ষ) সুতরাং বেশ জান, যে, বিশুদ্ধবায়ুসেবিত গৃহে বাস করা উচিত; তবে নির্জ্জনতার ভাণে ঘরের সমস্ত দোর জানালা বন্ধ করত, উহার ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাক কেন? প্রাতে উঠিয়াই শৌচপ্রস্রাব ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তোমরা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত লেপ জড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, তৎপরে একেবারে শৌচ-প্রস্রাবত্যাগ ও স্নানাহারান্তে বিদ্যালয়ে যাইবে; কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই সময়ের অল্পতার দের অভিযোগ করিবে। এ সকল বিষয়ে তোমা-কত ভ্রম দেখ; নয়টার সময় শৌচপ্রস্রাবে অল্প সময় লাগে, আর প্রাতে অধিক সময় লাগে, এরূপ নয়। সময় একই। তবে প্রাতেই একেবারে শৌচস্নানাদি সমাধা করিয়া পাঠে উপবেশন কর; যথাকালে আহার করিয়াই বিদ্যালয়ে যাইবে। তাহাতে শরীররক্ষা ও বিদ্যাসাধন দুই হইবে; "গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকিবে, অথচ পিতৃলোকেরও উদ্ধার হবে"। তোমাদেরত তা উদ্দেশ্য নয়; তোমরা লোকেকে দেখাও "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ"। মনে কিন্তু "যেন তেন প্রকারেণ বাহাদুরী মারিষ্যতে"।

কলিকাতা ইউনিবার্সিটিও বেশ হুজুকে তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ, উহার উদ্দেশ্য খুব ভালই ছিল, কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্যবশত এখন ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে তবে মাঝখান থেকে কএকজন লোকেরই মহেন্দ্র যোগ উপস্থিত। কেহ কেহ পাঠ্যপুস্তক সংকলন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; কেহ কেহ উপর্য্যুপরি পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া অর্থলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কেহ কেহ এমনই পসার করিয়া বসিয়াছেন, যে কতকগুলি চিতা ভস্ম সংগ্রহ করতঃ "দুই শত প্রশ্ন" নাম দিয়া এক পুস্তক বাহির করিলেন। দেখিতে ২ পাঁচ সহস্র কাপি বিক্রীত হইয়া গেল। কিন্তু একজন বেপসারে লোক "সহস্র প্রশ্ন" নামে কোন পুস্তক প্রণয়ন করিলেও কেহই তাহা স্পর্শ করেনা। ইউনিবার্সিটির সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করি, সহস্র সহস্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে একখানিও কি তাঁহাদের উপযুক্ত বলিয়া ধারণা হইল না। ভাল, নাই হউক, তজ্জন্যও দুঃখ নাই। তাঁহারাও যে পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাওত দিবা। চতুর্হস্ত, পঞ্চপদ, পক্ষলাঙ্গুল-বিশিষ্ট বলিলেও চলে। আর এককথা, দেশে কি আর অন্য লোক নাই; কএকজন লোকই যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষক নিযুক্ত হন কেন? হাঁ মানিলাম, তাঁহারা যোগ্য লোক বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমকক্ষ লোক যে আর নাই, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব। তবে পাঁড়ে সিং দোবে চোবে সরকার লালাদের মত লোক অনেক আছে; সময়ে সময়ে তাহাদিগকেও এক একবার ডাকা

উচিত। পরীক্ষক নির্ব্বাচনের নিয়মগুলিও চূড়ান্ত। কলেজের অধ্যাপক, সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের সম্পাদক অথবা গ্রন্থকার হইলেই যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষক হইতে পারেন। স্কুল ডিপার্টমেণ্টের কোন শিক্ষক পরীক্ষক হইতে পারিবেন না। এখন যদি কেহ গ্রন্থকার কি সম্পাদক, বা গ্রন্থকার ও সম্পাদক উভয়ই হন, এবং স্কুলে মাষ্টারি কি পণ্ডিতি করেন, তবে কি তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইবে না? কেন যে করা হইবে না, তাহা ইউনিবার্সিটীর সভ্যগণই বুঝেন। অধ্যাপক, সম্পাদক, কি গ্রন্থকার এগুলি কেবল গুণ-পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নয়। কেহ যদ্যপি গ্রন্থকার বা সম্পাদক হন, তাহাতেই তাঁহার গুণবত্তা জানা গেল। তবে তিনি স্কুল ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করেন বলিয়া জাতি-ভ্রষ্ট হইয়াছেন নাকি? যে তাঁহাকে আর পরীক্ষকের অধিকার দেওয়া গেল না। আবার এই নিয়ম কেবল অজ্ঞাত-নামার পক্ষেই খাটে; খ্যাতনামার যত গলদই থাকুক না, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আইসেনা। রেভারেণ্ড ডাক্তার সি বোমান স্কুল ডিপার্টমেণ্টের অধ্যাপক ছিলেন। (যখন তিনি সি, এম এস্ বোর্ডিং স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়াইতেন, তখনও পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহার কেথিড্রাল মিশন কলেজে অধ্যাপকত্বের কথা বলিতেছি না) তিনি অনেক বার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। গৌরীশঙ্কর দে এণ্ট্রান্স ক্লাসে গণিত শিখাইতেন, তিনিও কতবার পরীক্ষক হইয়াছেন। ইউনিভার্সিটীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই; তিনি বলিবেন, তাঁহাদিগকে অধ্যাপক বলিয়া জানি; এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ান কি না আমাদের দেখার আবশ্যক নাই। তবেই ইউনিভার্সিটিতেও হিন্দুধর্ম্মের গতিক দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুদের যেমন কার্য্যে ম্লেচ্ছ যবন হইলেও মুখে হিন্দুত্ব-রক্ষা; ইউনিভার্সিটীও, ভিতরে যত গলদই থাকুক না, মুখে সাফাই মারিয়া কাজ সারিতেছেন। এদিকে ত এই, অন্যদিকে কাগজ পাইয়া অতি অল্প পরীক্ষকই যথা-সাধ্য-পরিশ্রম সহকারে কাগজ দেখেন। শেষে প্রধান পরীক্ষকের নিকট কাগজ পাঠান হইলে, তিনি শতকরা হিসাবে পাস করিয়া সর্ব্ববিধ ঝোঁক হইতে নিষ্কৃতি পান। ইহাতেই স্থূলবুদ্ধির সাফল্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির নিষ্ফলতা ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান উপাধি-প্রাপ্ত যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই যে, সামান্য পত্র লিখিতেও ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল করেন, ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। ইউনিভার্সিটী শতকরা ত্রিশ কিম্বা তেত্রিশটী পাশ করিবেন, ইহাতে হয় ত দশ পনরটী অনুপযুক্ত ছাত্রও উত্তীর্ণ হইতে পারেন, আবার দশ বিশটী উপযুক্তেরও নিষ্ফলতা অপরিহার্য্য। ইহাকে আর গুণের পরীক্ষা বলা যায় না। সংখ্যার পরীক্ষাই বলা উচিত।

আবার আজকাল ইউনিভার্সিটীর লোকদিগের কাছে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এই মহাবাক্যের বড়ই আদর দেখা যায়। পরীক্ষক দশজন; সকলেই বলিতেছেন —"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—আমরাত সামান্য মনুষ্য, সকল সময় কি মাথা ঠিক থাকে, যে বুঝিয়া সুঝিয়া নম্বর দিব। সময়ে সময়ে এমনই চিত্তবিকার জন্মে, যে কত

নম্বর দিব, তাহা ঠিক করিতেই আত্ম-বিস্মৃতি হয়; তখন অচেতন পদার্থ হস্তস্থিত কলমের উপরই ভার দিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকি। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি কলম মহাশয় এপাশ ওপাশ ফিরিয়া দুই এক অঙ্ক প্রসব করিয়াছে। তখন তাহাকেই বালকের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করি।" এই চিত্ত-বিকৃতি বা আত্ম-বিস্মৃতি যদি শতকরা একজনেরও উপর ঘটে, তাহা হইলেই পঞ্চাশটী বা ততোধিক ছাত্রের পরিণাম এইরূপে মাঠেই মারা যায়। তৎপরে সমষ্টিকারী মহাশয় বলিতেছেন—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, অন্যে পরে কা কথা—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্যই আমাদের হস্তের উপর ন্যস্ত। তিন আর দুয়ে পাঁচ, আর তিনে আট, আর পাঁচে তের, এ বিড়ম্বনা যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনিই ইহার মর্ম্মজ্ঞ। ইহাতেত পদে পদেই ভুল চুক হইবার সম্ভাবনা"। সুতরাং তাঁহাদের ভুলচুকেও অনেকছাত্র অব্যাহতি পান না। তারপর কেরাণী বাবুরা বলিতেছেন—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—যখন কোন কোন কার্য্যে মুনিদিগেরও মতিভ্রম ঘটে, তখন আমাদের ঘটিবে না কেন? যত বালক উত্তীর্ণ হইল, সকলের গুণানুসারে বা নামের বর্ণমালানুক্রমে তালিকা প্রস্তুত করা আমাদের কার্য্য। চারি পাঁচ হাজার ছাত্রের নাম লিখিতে কি একটীও এড়াইয়া যাইতে পারে না? কত সাবধান হইব। মানুষের ভ্রম পদে পদে।" অতএব এস্থানেও যে কেহ এড়াইলেন না এমন নহে। ইহার পরই প্রেসে উক্ত তালিকা প্রেরিত হইল। তথায়ও কম্পোজিটার, বা রিডার বা প্রুফকারেক্টারগণও কি "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এই মহাবাক্য হইতে অব্যাহিত পাইবে? কখনই না! সেখানেও উক্ত বাক্যের সার্থকতা সমর্থিত হইল। এইরূপ নানা গোলযোগেই বর্ষে ইউনিভার্সিটীর গলদ বাহির হয়। ইউনিভারসিটীর লোকগুলাকে কনের মা বলিলেও চলে। কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে। যে কার্য্যের মূলে স্বার্থ আছে, তাহা কখনই সুযশ প্রসব করিতে পারে. না। এরূপ অসার ইউনিভারসিটীর কাছে, আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকারের সম্ভাবনা দেখি না। সমস্তই অপকার। সুতরাং যত শীঘ্র ইহার উচ্ছেদ হয়, ততই মঙ্গল।

তারপরত খ্যাতনামাদের হুজুক। ঈশ্বরেচ্ছায় যাঁহার একটু পসার হইয়াছে; তিনি মদগর্ব্বে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া এক প্রকাণ্ড উচ্ছৃঙ্খলবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। যা বলিতেছেন, তাহাতেই অমনি দেশের লোক অনিবার বাহবা বর্ষণ করিতেছে। বিলাত-প্রবাসী মহামহোপাধ্যায় ভট্ট ম্যাক্সমুলার এক অদ্বিতীয় প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। একাল পর্য্যন্ত প্রাণপণে অনেকগুলি ভাষার অনুশীলন করিয়াছেন। সুতরাং, ভাষাসম্বন্ধীয় কোন কথায় তাঁহার অভিপ্রায় বেদবাক্য। তিনি যেই বলিলেন "এক সহস্রটী মূল ধাতু আছে, ইহা হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে"। অমনি তাড়িত বেগে এই নবাবিষ্কার পৃথিবীর একসীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল; সংবাদপত্রের জিহ্বায় জিহ্বায় উদেবাষিত হইয়া দিগ্বিদিক্ ছাইয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিকেই তাঁহার নামের ও গবেষণার চি টি পড়িয়া গেল। তিনি

আরও বলিলেন—"ঋ ধাতু হইতে আর্য্য-শব্দ নিষ্পন্ন; ঋ ধাতুর অর্থ চাস করা; সুতরাং, আর্য্য শব্দের অর্থ চাসা"—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর আর্য্য শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহা চূড়ান্ত। এইরূপ পণ্ডিতের বলিহারি বলিতেই হইবে। অহো গবেষণা! অহো অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি! অহো শাস্ত্রমর্ম্মগ্রাহিতা! ঋগ্বেদের সার গ্রহণ করতঃ পণ্ডিতপ্রবর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে পূর্ব্বকালে আর্য্যেরা কৃষিকর্ম্ম করিতেন; তাঁহারই পুচ্ছাবলম্বনে, অক্ষয়কুমার দত্তও অমনি লিখিলেন—"যে দিন আর্য্যগণ হলস্কন্ধে স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে ভারত ভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। ম্যাক্সমুলার আর্য্যদিগকে চাসা বলুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, অক্ষয় বাবুও তাহাতে মতপ্রদান করিলেন কেন? ভট্ট মহাশয়ত ঋগ্বেদের দোহাই দেন, অক্ষয় বাবুও কি তাহাতেই সায় দিয়াছেন? ম্যাক্সমূলার রজঃপ্রকৃতিক ম্লেচ্ছ, বেদের বিপরীত অর্থই বুঝিয়াছেন; কিন্তু দত্তজ মহাশয়ত সত্ত্বপ্রকৃতিক হিন্দু ছিলেন; তিনিও যে বিপরীত অর্থ বুঝিলেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে!

ম্যাক্সমূলার কেশবচন্দ্র সেন লিখিতে "Keshab Kandra Sen" এইরূপ লিখেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাঁহার একটু শদার হইয়াছে, তিনি কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-রহিত। ভট্টজী কেশব চন্দ্র ইত্যাদি স্থলে ক ও চ এই দুয়ের স্থানেই কেমন করিয়া এক K তে সারিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি কেশব স্থানে Ceshab ও চন্দ্রস্থানে Kandra লিখিতেন, তাহা হইলেও না হয়, বুঝিতাম, যে কলিকালের মত কার্য্যই হইয়াছে। আবার যদি কোনটীর পরে ব্যঞ্জন-বর্ণ থাকিত, তাহাহইলেও না হয় মনে করিতাম, যে ব্যঞ্জন পরে K র উচ্চারণ চ'র মত হয়, তাহাও হয় নাই; উভয়ই স্বরবর্ণ। তবে কি এক স্বরে দুই স্থানে দুই প্রকার কার্য্য করিল। আমরাত বুঝি, ইহা ভট্ট মহাশয়ের নূতনত্ব দেখান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত তদীয় Literature of Bengal নামক পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 'From the stiff unmusical Vedic style, to the sweet harmonious strains of Kalidas' ইহাঁরাই ঠিক "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"। দত্তজর বেদে কত দৌড়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ইহাঁর ঋগ্বেদের এডিসনও তদ্রূপ। সামগান শুনিলে পাষণ্ডের ও মন গলিয়া যায়, দত্তজ মহাশয় অনায়াসেই তাহাকে unmusical বলিলেন। তৎপরে প্রশংসা করা হইল, 'sweet harmonious strains of Kalidas' বলিয়া! রমেশ বাবুর এইরূপ ধারণায় আমাদের একটী যৎসামান্য পুরাতন গল্প মনে পড়িল। "কুয়ে বলে গুয়ে দাদা, বনমালী নাম শুনেছিস্। চুপ কর্ চুপ কর্, পাদী দিদি শুন্‌লে পরে হেসে মরবে"। পাঠকবর্গ বোধ হয়, এই গ্রাম্য কবিতার আবৃত্তিমাত্রেই গল্পের ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তজ্জন্য ইহার বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে। কোন গ্রামে কুয়ে ও গুয়ে নামে

দুই সহোদর বাস করিত। পাদী নামে তাহাদের এক জ্যেষ্ঠা সহোদরাও ছিল। তাহাদের ধারণা, যে, লোকের নাম কুয়ে কি গুয়ে কি পাদী এইরূপই হয়। অন্যরূপ নাম এপর্য্যন্ত তাহাদের কর্ণে উঠে নাই। হঠাৎ একদিন কুয়ে শুনিল, কোন লোকের নাম বনমালী। সে এই অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব নামশ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি গুয়ে দাদার নিকট যাইয়া বলিল "গুয়ে দাদা গুয়ে দাদা। বনমালী নাম শুনেছিস" গুয়েও অমনি ব্যস্ততা সহকারে ব'লল, "চুপ কর চুপ কর, পাদী দিদি শুনলে পরে হেসে মরবে"। কুয়ে গুয়ের অজ্ঞতা বশতঃ যেমন অতি কদর্য্য কুয়ে গুয়ে বা পাদী নামই তাহাদের উৎকৃষ্ট বোধ হইত, এবং অতি সুন্দর বনমালী প্রভৃতি নামও যেমন তাহাদের উপহাসাস্পদীভূত হইয়া দাঁড়াইত, তদ্রূপ অজ্ঞতাবশতই দত্তজ মহাশয়ের নিকট বেদের unmusical style এবং sweet harmonious strains of Kalidas ঘটিয়াছে। দত্তজর বোধ হয় বনমালীবৎ উদাত্তানুদাত্তস্বরিত স্বরসমন্বিত বেদ পাঠ কখনও কর্ণ-প্রবিষ্ট হয় নাই। অহো আমিও ত কম অজ্ঞান নহি। তিনি শূদ্র, তাঁর বেদ পাঠ শ্রবণ কিরূপে সম্ভবে। বেদ পাঠী ব্রাহ্মণগণত কখনও শূদ্রসমক্ষে বেদোচ্চারণ করেন না। তাহাতে আবার তিনি বিলাতপ্রত্যাগত হইয়া ম্লেচ্ছপদবাচ্য হইয়াছেন। যাহা হউক, অজ্ঞতাবশত যে রমেশ বাবু উক্তরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সংশয় নাই।

আজকালত দেশে ধামাধরা লোকই অনেক। প্রকৃত সারবান্ লোকত "লাখে না মিলিল এক" বলিয়াই বোধ হয়। নতুবা হোমরা চোমরা সকলকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতানুসরণ করিতে দেখি কেন? আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহারই সমর্থনার জন্য অসার প্রমাণ, কূট তর্ক, মিথ্যা যুক্তি, অসম্বদ্ধ বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় খ্যাতনামা মহাত্মাগণও তাহারই পোষকতা করিবেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও ইহার প্রসঙ্গ। বালকগণ প্রথম হইতেই এই ভ্রমময় শিক্ষা পাইয়া সমস্ত জীবনের মত আত্মহারা হইতেছে। তাহারাও এখন হইতে আপনাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বাস্তুত্যাগী অসভ্য বলিয়া জানিবে। ইংরাজ চক্ষে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া উপনিবেশ করিয়া থাকা, সভ্যতার চিহ্ন হইতে পারে, আমাদের চক্ষে কিন্তু উহা বিপরীত দেখায়। কথায় বলে বাস্তুভূমি একবার পরিত্যাগ করিলে, সাতবার উদ্বাস্তু হইতে হয়। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ম্লেচ্ছগণই প্রকৃত বাস্তুত্যাগী অনার্য্য। নতুবা, মধ্য এসিয়া হইতে যাওয়া অবধি আমেরিকা প্রভৃতি কত স্থানে কত বার উপনিবেশ স্থাপন করত বসতি করিবে কেন? আর্য্যগণ যদি মধ্য এসিয়া হইতে ভারতভূমে পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই এখানেও চিরদিনের মত থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং আর্য্যগণকে মধ্য এসিয়া-নিবাসী বলা ঘোরতর পাষণ্ডের কর্ম্ম। এরূপ পাষণ্ডের কথায় কেহ যেন আস্থাবান না হন।

ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন—"Their laws, like those of rude nations, in general, are in verse, their sacred books, and even their books of science are in verse, and what is more wonderful still, their dictionaries." ভট্ট প্রবরের মতে আর্য্যেরা অসভ্য ছিলেন, কেন না, তাঁহাদের যাবতীয় গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধ পদ্যে লিখিত। বহুদর্শী ভট্ট মহাশয়ের এ ধারণা কোথা হইতে আসিল যে rude-nation দিগেরই গ্রন্থ সকল পদ্যে লিখিত হইয়া থাকে। সভ্য জাতিদিগের হয় না। আমাদের ধারণা ত ঠিক বিপরীত। আমরা জানি, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতির সমগ্র উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থই পদ্যে লিখিত। জার্ম্মন ভাষায় 'Lay of Hildebrand and Hadubrand,' 'Lay of Nibelungen,' 'Heljand,' অটফ্রিড সঙ্কলিত পবিত্র কাব্য 'Krist' ; 'Ludwigslied' ; গ্রীক্ ভাষায় ভাষায় হোমর প্রণীত 'Illied,' 'Odyssey,' হিসিঅদ প্রণীত 'Works and Day, এবং 'Theogenia' ; ইতালীয় ভাষায় ডান্টে প্রণীত 'Divine Comedy,' 'Vita Nuova,' 'Convito,' কিম্বা 'De Monarchia' ; লাটীন ভাষায় 'Laws of Numa,' Laws of the Twelve Tables,' 'Salian Hymn,' 'Annales,' 'Menander,' ও 'Eneid,' হোরেস ও ভর্জিলের গ্রন্থনিচয় ; ফরাসী ভাষায় 'Roman de Renard, 'Roman de la Rose' ; এবং হিব্রু ভাষায় Old testment প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় কি পদ্যে লিখিত নয়? আদিম কালের যাবতীয় গ্রন্থই পদ্যে লিখিত হইত, এবং তাহাই হওয়া উচিত। আজকালই গদ্য লেখার ভূয়িষ্ঠ প্রচলন হওয়াতে যেখানে সেখানেই অসংখ্য গ্রন্থকার পাওয়া যায়। যাহা হউক, পদ্যের উপর ভট্টজীর এত আক্রোশ কেন? আবার ভয় হয়, পাছে কোন দিন বা বলিয়া বসেন—'Rude Bengalis, in general, with pearl-like teeth.'

ভাই বঙ্গবাসী তোমাদিগকে শত শত বার ধিক্কার দিলেও চিত্তের ক্ষোভ দূর করা যায় না। 'তোমাদের বেদমাতা, গায়িত্রী জননী, সংস্কৃত ভাষাকে ম্লেচ্ছগণ সেমেটিক শাখায় অন্তর্ভুক্ত করিল, আর তোমরা হাতে সোনার চাঁদ পাইয়াছ মনে করিয়া সহস্র মুখে তাহাদেরই দোহাই দিতেছ। নোহার পুত্র শেম যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, তাহাই সেমেটিক। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রেই শেমাদির উল্লেখ আছে, বেদমাতা আর্য্য ভাষার সঙ্গে তাহার সংস্রব কি? প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শেম বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নামে আর্য্যভাষার নামকরণ হইল। কিন্তু, শেম কি নোহারও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভাষার প্রচলন ছিল, সত্যপ্রকৃতিক মহর্ষিগণ যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, হিন্দুরা যাহাকে আজ পর্য্যন্ত দেবভাষা বলিয়াই জানে, আত্মগৌরবেচ্ছু ম্লেচ্ছগণ সেই ভাষার গৌরব লাঘবমানসেই শেমাদির অবতারণা করেন, দেশীয় মহাত্মারা ত তাহা বুঝেন না। (অথবা সে সকল বুঝিবার লোকই বা কে আছে, যে আছে, সে লোকের নিকট নগণ্য) ম্লেচ্ছদের প্রতারণা-জালের অবাক্তর ভেদ করিতে না পারিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহারই পোষকতা করেন।

ম্লেচ্ছগণ তোমাদের সনাতন-ধর্ম্মের,তোমাদের সত্যশাস্ত্রের,তোমাদের মাতৃভূমির,তোমাদের আর্য্যত্বের গৌরবলাঘবমানসেই পেলেষ্টাইন, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্যসঞ্চার বলিয়া কল্পনা করে; (কেন না, তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐরূপ লিখে) তোমরা তাহাই গুরুমন্ত্র ভাবিয়া করপুটে নিয়ত জল্পনা কর! বালকদিগকেও ঐ মূলমন্ত্রে দীক্ষা দাও!! ঐ সকল স্থানকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষাধিষ্ঠিত মনে করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হও!!! ইহা কি রক্তমাংসের শরীরে সহ্য হয়? "বাপ পিতামহের নাম ডুবাইয়া হিদে জোলার নাতী" হইতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না?

সুচতুর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই (অবশ্য আধুনিক-সীমান্তর্গত ভারতবর্ষ নহে) মনুষ্যসঞ্চার হইয়াছিল; ভারতবাসীরাই প্রকৃত আর্য্য; দেবভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সকল ভাষারই মূলস্বরূপ; ভারতবর্ষই সর্ব্ব-প্রথমে সভ্যতার সোপানের উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিল; ভারতীয় ধর্ম্মই প্রাচীনতম, অদ্বিতীয়, সুতরাং সংজ্ঞাবিহীন; —তথাপি আত্মগৌরবপ্রখ্যাপনেচ্ছায় অনর্গল বাগ্‌জাল বিস্তারকরত তোমাদিগকে ফাঁকি দিতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? তাহারও ভারতে আসিয়া 'হাম্ বি কায়েত' হইতে চাহে, আর তোমরাও, তাহাতে আপত্তি না করিয়া 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' ভাবে অনুমোদন করিতেছ! বেদ তোমাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্র, তোমাদেরই বেদিতব্য, কিন্তু তাহাতে তোমাদের ক অক্ষরও জ্ঞান নাই দেখিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ বহিরেব মনোহর' হইয়া সহস্র সহস্র বিরুদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন, আর তোমরা অন্যায়ত্তের ন্যায় 'হবেও বা হবেও বা' বলিয়া আপনাদের হীনতা স্বীকার করিতেছ! ভাই! ইংরাজি ট্রান্সলেশন পড়িয়া তোমাদের বেদে বিদ্যা। আবার সেই ট্রান্সলেসনগুলিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের লীলাভূমি। তাঁহারা অনেক স্থানেরই প্রকৃতার্থ-গ্রহণে অসমর্থ, তথাপি গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে ছাড়েন নাই। কোথাও বা আর্য্যদিগের গৌরবলাঘবমানসে প্রকৃতার্থের গোপন করিয়া নানা খেল খেলিয়াছেন। আমাদের বেদ-বেদান্তাদিশাস্ত্রে অধিকারী হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, কৈ ম্লেচ্ছদের মধ্যে ত তাহার একটীও পরিদৃষ্ট হয় না। তবেই আমাদের স্থূল বুদ্ধির মতে, তাঁহারা উহাতে আদৌ অধিকারীই হয়েন নাই; তাঁহাদের মতগ্রহণের কথাত দূরে থাকুক। অদ্যাপি আমরা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রনিচয়ের কোন কোন দুরধিগম্য স্থলের মর্ম্মাববোধে অক্ষম হইলে, আপনাদের অনধিকারিত্বই নির্ণয় করিয়া মৌনী হইয়া থাকি। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পল্লবগ্রাহিতাগুণে দুরূহত্যাগ ও সুগমগ্রহণজন্যই তাঁহারা তত্তৎ-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারী। তজ্জন্যই অনেকস্থলে মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে। যে সকল গ্রন্থ এইরূপ দ্বৈধীভাবে পরিপূর্ণ; সাহেবকৃত বলিয়া তাহাতেই আস্থাপ্রদর্শন যেন দেশীয়দিগের উৎকট ব্যাধিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওহে হামমস্ত হুজুকপ্রিয় দিগ্‌গজগণ! এতাদৃশ গ্রন্থের উপর বিশ্বাস করিয়া তোমরা

আপনাদিগকে মধ্য আসিয়ার আদিমনিবাসী মনে কর, তাহাতে নিষেধ করি না; কিন্তু অধস্তন সন্তানদিগের কচি মাথা আর খাইও না। তোমরা আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম অতল সাগরগর্ভে ডুবাও, তাহাতে ক্ষতি নাই; যদি কস্মিন্‌কালে তোমাদের বংশধরেরাও সেই সকল পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষদিগের চিরনিমগ্ন নামের উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়, তাহার পথ এখন হইতে রুদ্ধ করিও না! করিও না!!

সংস্কৃতভাষা মৃত হইলেও আমাদেরই মাতৃভাষা। সত্ত্ব-প্রকৃতিক হিন্দুগণ এভাষায় যেরূপ লব্ধাধিকার হইবেন, ম্লেচ্ছ-প্রভৃতি জাতির পক্ষে ততদূর হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কলির প্রভাবে নানাপ্রকারে শৌচাচার-বিহীন হওয়ায় সেই হিন্দুদিগের মধ্যেও আজ বার আনা লোক সংস্কৃতজ্ঞানবিহীন। তথাপি তাঁহারাও বেদাদিশাস্ত্রের উপর মত চালনা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। ইংরাজি ভাষায় out study চলিতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় উহার বৃত্তি একবারেই প্রতিহত। যিনি একরূপ-শাস্ত্র-অধ্যয়নে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, দেখিয়া শুনিয়া যে তিনি অন্য শাস্ত্রে অধিকারী হইবেন, তাহার যো নাই। তজ্জন্যই এতদ্দেশে একবিধশাস্ত্রাধ্যায়ী সুধিগণের এক একটী স্বতন্ত্র উপাধি আছে; যথা, নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত, বৈদান্তিক, বৈদিক ইত্যাদি। কিন্তু আজকালকার সংস্কৃতজ্ঞানহীন ভায়ারাও পূর্ব্বোক্ত সকল উপাধিগুলিই একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একজন কোন বিষয়ে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিলেন, তৎপ্রবন্ধপাঠে অন্যান্য সকলেই তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া বসিলেন। ইংরাজদিগের মধ্যে এই রোগ বড়ই সংক্রামক; তজ্জন্য প্রথমে যিনি 'শকুন্তলা' or 'Fatal Ring,' 'মৃচ্ছকটিক' or 'Toy Cart,' "যজ্ঞোপবীত" or 'sacred string,' "যজ্ঞ" or 'ceremony,' "হোম" or 'pouring ghee on fire', "আত্মা" or 'self,' 'পরমাত্মা' or 'Supreme self' লিখিলেন, তদবধি শত শত লেখক পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি সমভাবেই রাখিয়াছেন, কিছু-মাত্রও ইতর-বিশেষ করেন নাই। এইরূপ অনুবাদ পড়িয়াই আজ ইংরাজমাত্রেই শকুন্তলার সুরস-রসাস্বাদনে কৃতার্থম্মন্য; ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ প্রভৃতির গূঢ় রহস্যোদ্ভাবনে সমর্থ। ইংরাজগণ, বেদের মধ্যে ঋগ্বেদেরই বেশী বেশী দোহাই দেন, সামের কাছে বড় ঘেঁসিতে পারেন নাই। প্রিয় প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ! সরল অকপট হৃদয়ে বল দেখি, বেদান্তের পঞ্চীকরণে জগৎ-সৃষ্টির কি মর্ম্মগ্রহ করিলে? পঞ্চদশীর—'অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা। অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ'॥ এই শ্লোকের কি ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞানলাভ করিলে স্পষ্ট করিয়া বল। তোমারা আপনাদের বিদ্যা-প্রকাশ-ভয়ে, একজন যাহাকে ভাল বলিয়াছে, যাহার প্রশংসা করিয়াছে, তাহারই দোহাই দিয়া সহস্র প্রকারে বাহাদুরী মারিতেছ; রাজপুত্রদত্ত ভস্ম চক্ষে দিয়া 'বাহবা, বেশ দেখা যাচ্চে'

ইত্যাদি বলিয়া আপনাদিগেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ। পাঠকবর্গ! ঈশ্বরদত্ত বাক্‌শক্তি পাইয়া লোকে সময়ে সময়ে এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহা সামলাইতে তাহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। দেখুন না আমিও সেই শক্তির জোরে রাজপুত্রদত্ত বলিয়া ফেলিয়াছি; এখন ইহার ভিতরের কথাটিত না বলিলে চলিবে না; তাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন দেশে এক ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিলেন; তাঁহার দুই পুত্র। একদা তাঁহার মনে হইল, বিদ্যা ও সামাজিকতা এই দুয়ের মধ্যে উৎকর্ষ কার। এইরূপ ভাবিয়া এক পুত্রকে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী করিবার জন্য বিচক্ষণ সদ্‌গুরুর সমীপে প্রেরণ করিলেন; দ্বিতীয়কে কথায় বার্ত্তায় বিবিধপ্রকারে সামাজিক করিবার ইচ্ছায় বাক্‌পটু, উপস্থিতবক্তা, সুরসিক লোকদিগের সহবাসে রাখিয়া দিলেন। কতিপয় বর্ষমধ্যেই অগ্রজ নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠও তৎসঙ্গে সঙ্গে বৈদগ্ধী, চাতুর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বক্রোক্তিতে সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে বিশেষ পারদর্শী হইল। একদা উভয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত সুবিজ্ঞ নৃপতি, একটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত কৌটার মধ্যে চারিটী চিতাভস্ম রাখিয়া, উহার উপরিভাগ বনাত, সাটীন, মখমল দ্বারা আবৃত করত জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, বৎস! এই মহামূল্য উপহার অমুক দেশের রাজার সমীপে গিয়া প্রদান কর। পুত্রও পিত্রাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যথা-কালে চতুরঙ্গসেনা-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল। ক্রমে পূর্ব্বোক্ত রাজার রাজ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, তিনিও সাতিশয় সম্মান-প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই রাজপুত্রের প্রত্যুদ্গমনের জন্য অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত প্রেরণকরত তাহাকে রাজসভায় উপস্থাপিত করিলেন। রাজকুমার উপস্থিত হইয়া নৃপতিকে যথোচিত সম্মানসহকারে অভিবাদন করত তৎসমীপে জনকপ্রদত্ত উপহার-স্থাপন-পূর্ব্বক রাজাদেশে নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইল। নৃপবর উপহারের প্রথম আবরণ বনাত, দ্বিতীয় সাটীন ও তৃতীয় মখমল, এবং পাত্রটী সুবর্ণনির্ম্মিত দেখিয়া মনে করিলেন, না জানি, ইহার মধ্যে কি মহামূল্য দ্রব্যই আছে! কিন্তু খুলিবামাত্রেই দেখেন, উহার ভিতর কতকগুলি চিতাভস্ম। তখন অবমান এবং উপহাসবোধে ক্রোধান্ধ হইয়া রাজপুত্র ও তৎসমভিব্যাহারী সমস্ত লোককে কারাবদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। অগত্যা জ্যেষ্ঠ রাজকুমার এই অজ্ঞাত দেশে বন্দীরূপে কাল-যাপন করিতে লাগিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গিয়া প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, তথাপি পুত্র প্রত্যাগমন করিল না। রাজার চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। পুত্রের পরিণাম জানিবার নিমিত্ত কনিষ্ঠকেও তদ্রূপ দ্রব্য ও লোকজন-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিলেন। যথাকালে সেও রাজসভায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্তভাবে উপহার প্রদান করিলে রাজাও খুলিয়া পূর্ব্ববৎ চিতাভস্ম দেখিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার শিরচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, কনিষ্ঠ রাজপুত্র বড়ই চতুর, বাঙ্‌নিপুণ ও প্রত্যুৎপন্নমতি। রাজাজ্ঞা-শ্রবণে ঝটিতি তাহার মস্তকে বিপৎপ্রতীকারের বুদ্ধি আসিয়া উপ-

স্থিত হইল, এবং বিনয়পুরঃসর করযোড়ে কহিল, মহারাজ! মদীয় জনক আপনার পরম সুহৃৎ। তৎপ্রেরিত ভস্মের বিশেষ গুণ না জানিয়াই আপনি আমার প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দিতেছেন। ইহার অসাধারণ গুণ এই, সুজন্মা পুরুষ ইহার দ্বারা চক্ষে প্রলেপ দিয়া মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গের যাবতীয় দেবতাকে দেখিতে পান। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন! যিনি বিজন্মা, তাঁহার ভাগ্যে এই সুখ ঘটিবে না। রাজপুত্রের বাক্যশ্রবণে মহারাজ ব্যগ্রতাসহকারে কিঞ্চিৎ লইয়া চক্ষুতে প্রলেপ লাগাইয়া স্বর্গপানে চাহিয়া দেখেন, কোথায় বা ইন্দ্র, আর কোথায় বা ব্রহ্মা, আর কোথায় বা বিষ্ণু, আর কোথায় বা ত্রেত্রিংশকোটী দেবতা! যদিও কিছুই দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু রাজসভায় সে কথা প্রকাশ করিলে পাছে লোকে বিজন্মা বলে, এই আশঙ্কায় মনোভাব গোপনকরত বলিলেন, 'বাহবা, ঐ যে ইন্দ্র শচী সহ বিমানারোহণে নন্দন কাননে ভ্রমণ করিতেছেন; এই যে হংস-বাহনে চতুর্মুখ ব্রহ্মা; আহা কি চমৎকার! মহাদেব ডম্বরুহস্তে কেমন রাগ আলাপ করিতেছেন'। মহারাজের দেখাদেখি মন্ত্রী মহাশয়ও গোটাকতক লইয়া চক্ষে প্রদান-করত পূর্ব্বোক্তরূপে স্বীয় মনোভাব-গোপনে বলিলেন, 'তাইত কি আশ্চর্য্য! গরুড়—বাহনে শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণের কি অপ-রূপ মূর্ত্তি। পাশহস্তে বরুণ কোথা যাচ্চেন!' ক্রমে ক্রমে পাত্রমিত্র ও সভাসদ্গণ সকলেই লয়েন, আর দেখুন আর নাই দেখুন, সকলেই মুখে বাহাদুরী করেন; স্পষ্টকথা কাহারও বলিবার যো নাই, পাছে গোড়ার কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কেহই দেখিলেন না, বুঝিলেন না, অথচ সহস্রমুখে প্রশংসা করিতেও ছাড়িলেন না। অস্মদ্দেশ এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যাভিমানী দেশের অবস্থাও আজকাল ঠিক এইরূপ। অনেকেই প্রকৃত তথ্য বুঝেন না, অথচ 'The melodious and remarkable alliterations of Joydeva,' 'The vivid fancy and far-reaching imagination of Bidyapati,' 'The considerable deep feelings of Chandidas' বলিতেও ছাড়েন না। না বলিলেইত বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। প্রশংসালিপ্সা বড়ই উৎকট ব্যাধি। এই রোগের বশে কত লোক যে কত প্রলাপ বকিতেছে, তাহা ভাবিলেও আমাদিগের শরীর শিহরিয়া উঠে। দেশীয় ও বিদে-শীয় স্তাবকগণ! তোমাদের নিকট কর-যোড়ে প্রার্থনা, না বুঝিয়া সুঝিয়া কপট-হৃদয়ে কোন বিষয়ে মত প্রদান করিও না। বুঝিবার অসাধ্য হয়, স্পষ্ট বলিতে আপত্তি কি? পৃথিবীতে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তজ্জন্য দুঃখ করিবার কারণ নাই। পেটে এক, মুখে আর, করিয়া আর পাপ-সংগ্রহ কর কেন?

যাক্, আর ওসব কথায় কাজ নাই, আমরা ধান ভান্তে শিবের গীত আরম্ভ করিয়াছি। বাঙ্গালা-সাহিত্যশাস্ত্রের সমা-লোচন করিতে বসিয়া কতকিসের সমা-লোচন করিয়া ফেলিলাম। বাজে কথায় অনেকক্ষণ কাটাইলাম। এক্ষণে প্রকৃত-প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করাই উচিত; কিন্তু আর একটী সমালোচন বাকী আছে; সেটীও

আবার সাহিত্য-সমালোচনের কাছাকাছি; সুতরাং, তদ্বিষয়ে দুই চারিটী কথা না বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভাল দেখায় না। উৎসুক পাঠকগণ আমাদের এই কালাতিরেকে ক্ষমাপ্রদর্শনকরত ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমরা মন্তব্য কেচ্ছা (১) সুরু করিয়াই দস্তবদস্ত (২) তমাম করিয়া লইব। আপনারা বলিতে পারেন, এত আর চাহার দরবেশেরও কেচ্ছা নয়, কিংবা নিজাম পাগলারও কেচ্ছা নয়, অথবা কেচ্ছা সাহারামও নহে, তবে কিসের জন্য অপেক্ষা করিব। এতদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই, যে, যদিও এ কেচ্ছায় পরীজাত (৩) আসিয়া নিদ্রিত শাহজাদীকে (৪) বহনকরত বাদশাহজাদার (৫) কাছে পৌছাইয়া দিবেনা বটে, কিন্তু তৎসদৃশ কোন বস্তু থাকিবে। যদিও এ কেচ্ছায় আশক মাশুকের (৬) আশনাই দেখিতে পাইবেন না সত্য, কিন্তু তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিবেন। এ কেচ্ছা কি, তাহা বোধ হয়, পাঠকগর্ণ বুঝিতে প্যারেন নাই, তজ্জন্য বলিয়া দিই। ইটি ইন্‌স্পেক্টর কেচ্ছা।

বিদ্যালয় সকলের উন্নতিপরিদর্শন এবং যথোপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন, এই দুই কার্য্যের জন্যই ইন্‌স্পেক্টরী পদের সূত্রপাত। বলিতে কি, উক্ত দুই কার্য্যেই ইনস্পেক্টর মহোদয়গণ অমনোযোগী। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একবার একজন ইন্‌স্পেক্টর (ডেপুটী নন) কোন বিদ্যালয়-পরিদর্শন করিতে গিয়া তত্রত্য বালকগণের গুণাগুণ কিছুই দেখিলেন না, কেবল লোহার বীমে কড়া আঁটিয়া কিরূপে পাখাগুলি ঝুলান হইয়াছে, তাহারই পরিদর্শন করিয়া এবং হেডমাষ্টার মহাশয়কে তদ্বিষয়ে দুই একটী প্রশ্ন করিয়াই আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন। শুদ্ধ ইনিই কেন, এঁরা যাবতীয় বিদ্যালয়ই যে এইরূপে পরিদর্শন করেন, তদ্বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ-ব্যতীত আর কাহারও সন্দেহ নাই। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি বলিব, ১২৯৮ সালের ১৬ই শ্রাবণের "সময়" পাঠে অবগত হইলাম, যে ঢাকা বিভাগের কোন কোন ইন্‌স্পেক্টর মহাপুরুষ বিদ্যালয়ে পদধূলি পর্য্যন্ত দেন না, আপন বাসায় বালকদিগকে আনিয়া পরীক্ষা করেন। স্কুলের শিক্ষকদিগের ইহাতে আপত্তি করিবার যো নাই, কারণ, তাঁহারা খোর্দ্দমহল-বাসিনীর (১) ন্যায় ইন্‌স্পেক্টর জাঁহাপানার অপাঙ্গদৃষ্টির ভিখারী। পাঠক! এদৃশ্য কি আশকমাশুকের দৃশ্য অপেক্ষা সুদৃশ্য নয়! আবার কোন সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় পথের কর্দ্দমে যাওয়া অসম্ভব বিবেচনায় ইন্‌স্পেক্টর সাহেব কোন শিক্ষককে ক্রোড়ে করিয়া কর্দ্দম পার করিতে বলেন। পাঠক! তোমার চক্ষে পরীজাতের শাহজাদীর বহন অপেক্ষা কি এ বহন ভাল লাগে না! কর্ত্তৃপক্ষ এ সকল বিষয় কিছু দেখিতে পান না বলিয়া আমরা দুঃখ করি; কিন্তু, তাঁহারা

(১) কেচ্ছা—অদ্ভুত গল্প। (২) দস্তবদস্ত—হাতে হাতেই অর্থাৎ শীঘ্র। (৩) পরীজাত—পরীসকল। (৪) শাহজাদী—রাজকন্যা। (৫) বাদশাহজাদা—সম্রাটের পুত্র। (৬) আশকমাশুক—প্রণয়ী ও প্রণয়িনী।

(১) খোর্দ্দমহল—যেখানে বাদশাহদিগের বেশ্যারা থাকে।

কেমন করিয়া দেখিবেন, ও যে "ঢাকা" বিভাগ। "ঢাকা" থাক্‌লে কেহই ত কিছু দেখিতে পায় না। যদি বল হুগলির কথা— সেখানেও "গলির" ভিতর কি লোকের দৃষ্টি যাওয়া সম্ভব। যদি কলকেতার কথা বল—এখানে একমাত্র কেতা দোরস্ত থাকিলেই সব সারিবা যায়। ইন্‌স্পেক্টরদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলে এই সমস্ত সুবিধাগুলি ঘটিয়াছে।

আমরা বেশ দেখিতেছি, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিয়ম ও অপামার্গের মূল উভয়ই একগুণ-বিশিষ্ট। কেন না, অপামার্গের শিকড় গর্ভিণীর কেশমধ্যে বাঁধিয়াদিলেই তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। কিন্তু তখনই উহাকে কেশ হইতে অপসারিত না করিলে, উহা ভালমন্দ বাছিবেনা; গর্ভিণীর নাড়ীপর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিবে। উহার গুণই হচ্ছে টানিয়া বাহির করা; তা কে জানে সন্তান, আর কে জানে নাড়িভুঁড়ি। সরকারী চাকরী গুলিও ঠিক তদ্রূপ। যাহার ভাগ্যে উহা ঘটিয়াছে, সে উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত কোনরূপ বিচার না করিয়া কেবলই উহা তাঁহাকে টানিয়া তুলিতেছে; তাই বলি সরকারী চাকরী অপমার্গ-গুণ-বিশিষ্ট নয়ত কি! নতুবা, পঞ্চদশমুদ্রা হইতে একজনকে পাঁচশত মুদ্রায় টানিয়া আনিবে কেন? অথবা নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষকইবা কিরূপে শেষে সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর হইতে পারেন? তাহাতেই আমাদের ধারণা, যে অপামার্গগুণবিশিষ্ট বলিয়াই সরকারী চাকরীগুলি ভালমন্দ না বাছিয়াই ইহাদিগকে টানিয়া তুলিয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, সরকারী চাকরী পাইয়া যে সকল ভাগ্যধর বিশ পঁচিশ হইতে হাজার বারশয় উঠিয়াছেন, বেসরকারী চাকরী হইলে, তাঁহাদের কৃষ্ণকেশ ধবলিত হইত, অথচ দুই চারিটাকা বেতন-বৃদ্ধি হইত কিনা সন্দেহ। প্রায়ই প্রত্যক্ষ হয় সরকারী বৃত্তিভোগীর মধ্যে গুণবান্ লোক অতি অল্প।

পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনও ইনস্পেক্টরদিগের অন্যতর কার্য্য। অনেকে বলেন, তাঁহারা একার্য্যে বড়ই শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা বলি যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে এ বিষয়ে এত তৎপর হন, যে পুস্তক যন্ত্রস্থ হইল না, অথচ তাহাকে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহাদের চিত্ত এমনই উদার, যে, তাঁহারা পুস্তকের দোষের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপই করেন না। তাঁহাদের আশ্রিত-বাৎসল্য-গুণে সহস্র সহস্র দোষও ক্ষমার মধ্যে পড়িয়া যায়। তৈল জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয় না, কিন্তু দুগ্ধ জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। ইন্‌স্পেক্টরদিগের স্বভাবও দুগ্ধের ন্যায়; যতই দোষ থাকুক না কেন, উত্তমরূপে মিশিয়া যায়, কেহ জানিতে পারেনা। আরও তাঁহাদের এক অসাধারণ গুণ এই, যে, তাঁহাদের ক্ষুদ্রদৃষ্টি আদৌ নাই, মহৎদৃষ্টিই সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাগরাদির উপরে তাঁহাদের তীব্র নজর; ক্ষুদ্র কূপাদির দিকে দৃক্‌পাতও করেন না। বাইবেলে লিখিত আছে, "তুমি এরূপে দান করিবে, যেন তোমার বামহস্ত জানিতে না পারে"। ইহাঁদের দান তদপেক্ষাও গুপ্ত। যাহাকে বাক্য দেন, তথায় সেই অনুরোধ

করিবার লোক ভিন্ন (যাহার কথা ঠেলিলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়) আর কেহই থাকে না। তাঁহারা এমনই ক্ষমাশীল, যে, সহস্র ২ লোকের কটূক্তি, সংবাদপত্রের তিরস্কার, আপামর সাধারণের তাড়না অনায়াসেই সহ্য করেন। অধিকন্তু, তাঁহাদের আরও একটী মহান্ গুণ এই যে, তাঁহারা আপনার নাম জাহের করিতে বড় অভিলাষী নহেন। আপনি পুস্তকরচনা করিয়া অন্যের নাম জাহের করেন। তাঁহাদের লোভও অনেকটা সংযত। তাঁহাদের অনুগ্রহে যে সকল পুস্তক বিক্রীত হয়, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা উহার লভ্যাংশ সমস্তই কবলিত করিতে পারেন; কিন্তু, তাহা না করিয়া কিঞ্চিৎ লইয়াই নিরস্ত হন। আরও সংসারের ইহা এক বিচিত্র গতি, যাহার ধনসম্পত্তি আছে, বিষয়-বৈভব আছে, স্বর্ণ-রৌপ্য আছে, মণিমাণিক্য আছে, লোকের চিত্ত স্বভাবতই তৎপ্রবণ; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর-দিগের চিত্ত, যাহার তৈল আছে, প্রায়ই তৎপ্রবণ দেখা যায়। তেল দিলে নরম হয় না, এমন দ্রব্য জগতে অতি বিরল। এমন যে কঠিন লোহার কল, তাহাও তেলে জল হইয়া যায় কে না জানে। "তৈলমুষ্টিমযোঽপি মার্দ্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিষু।" "অভিতপ্তং" নয়, উহা কালিদাসের ভুল। ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়দিগের এই সমস্ত অমানুষগুণেই বিদ্যালয় সকলের বিপরীত উন্নতি হইয়া থাকে। তা হউক, তাহাতে কার কি ক্ষতি; টুকলমান্ মহাত্মাদিগের কিন্তু খুব সুযোগ উপস্থিত। প্রকৃত গুণের আদর আর নাই; কৃতযুগে ত নির্গুণেরই খুব আদর ছিল। দেবতাগণ নির্গুণ শব্দে অভিহিত হইতেন। আজকালও ত নির্গুণের তেমনি আদর দেখা যাইতেছে। কৃত-যুগ আবার উপস্থিত হইবে নাকি? পূর্ব্ব লক্ষণত দেখা দিয়াছে।

কৃতযুগের আর একটী লক্ষণও দাঁড়াই-য়াছে। ঐ যুগে মীন কূর্ম্ম বরাহ অবতার হইয়াছিল। সম্প্রতি খরগোস অবতারও জাজ্বল্যমান। যে এই অবতারের আশ্রয় লইতেছে, সেই সিদ্ধমনোরথ হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ প্রবন্ধকুসুম অন্যত্র ফুটিয়াছিল; জনক-কন্যা সীতাও অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; ছাত্রজীবন বা শিক্ষকজীবন সকলেরই মূল প্রথম ভিন্ন স্থানে; তখন তাহাদের মনোরথসিদ্ধি হয় নাই। যেই খরগোসরূপ নবাবতারের আশ্রয় লই-য়াছে; অমনি যাহাদের চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে। ধন্য শশকাবতার, তুমিই ধন্য! কলিতে তুমিই যথার্থ অবতার!

পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচন-বিষয়ে আজকাল ভারি গোলযোগ উপস্থিত। যাঁহাদের হস্তে উক্ত গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা এমনই ধর্ম্মজ্ঞানপরিশূন্য যে, স্বার্থপরবশ হইয়া ঘোরতর পাতক করিতেও কুণ্ঠিত হন না। পুস্তকমাত্রেই অচেতন পদার্থ, সুতরাং, চলিতে পারে না, তাহাত সকলেই জানে; তবে কয়েকখানি পুস্ত-কই বা বেশ চলে কেন? ইহাদিগকে চলিবার শক্তি কে দিল? সৃষ্টিকর্ত্তা দিলে ত আর কাহারও আপত্তি থাকিত না। রচয়িতার রচিত গ্রন্থ নির্জীবই বটে, চল-চ্ছক্তিহীন; কিন্তু সম্বন্ধস্পর্শীতে ও ইন্‌স্পেক্টরের দমে বারমাসই টুক টুক করিয়া চলিতেছে। বন্ধ হইতে আর চায় না। যদি কখন

স্প্রীঙ্ ছিড়ে, কি দম ফুরাইয়া যায়, তখন বন্ধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু স্প্রীঙ্ ছিড়া একপ্রকার দুরাশা; কেন না উহা পাকা ষ্টীলের তৈয়ারী, শীঘ্র ছিড়িবে না। আর দমও ত রোজ রোজ, কি সপ্তাহে সপ্তাহে দিতে হয় না যে, দৈবাৎ ভুলও হইয়া যাইবে। এ দম বৎসরে একবার, সুতরাং ভুলও হয় না। তাই চিরকালই যে চলিবে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি। অন্য অন্য গ্রন্থকারদের ত আর সম্বন্ধ স্প্রীঙ্ নাই; সুতরাং, তাঁহাদের গ্রন্থ চলিবার আশা আর হিমাদ্রির অপসারণে ভারতের অশীতভার আশা দুই সমান। অনেকে সময়ে সময়ে ভ্রমান্ধতাবশত ইন্স্পেক্টরের দম দিয়া লন বটে, কিন্তু তাহা কোন কার্য্যেরই হয় না। স্প্রীঙ্ না থাকিলে দম লাগিবে কিসে।

সম্প্রতি একটী বিষয় লইয়া স্থানে স্থানে তর্কবিতর্ক হইতেছে। বিষয়টি এই; পাঠ্য পুস্তকরচয়িতৃগণের চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া উচিত কি না? ন্যায়পরতা কিংবা ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব আছে কি না? অন্যান্য বিবাদের ন্যায়, ইহাতেও দুই দল আছেন। এক দলের অভিপ্রায়, রচয়িতা যেরূপ চরিত্রেরই লোক হউন না, যদি তৎকৃত গ্রন্থে তদীয় স্বভাবের পরিচয় আদৌ না পাওয়া যায়, তবে সে গ্রন্থ কেন না আদরণীয় হইবে। দ্বিতীয় দলের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন, যদিও ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্ম বা ন্যায়পরতার হানি হইতেছে না, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে ঘটিতেছে। বর্ষায় নদীতে জলবৃদ্ধি অধিক হইলেই যেমন উহার তরঙ্গেরও প্রাবল্য প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ আয়পথ প্রশস্ত থাকিলে পাপাচারীর পাপের স্রোতও প্রবল হয়; আয়পথ সংকীর্ণ হইলে কখনই তভটা সম্ভবে না; সুতরাং তাদৃশ গ্রন্থকারের গ্রন্থ পরিচালন ও পাপের প্রশ্রয়দান একই কথা। পশুধর্ম্মী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থগুলি যাহাতে একেবারে পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত না হইতে পারে, তজ্জন্য সাধারণের সবিশেষ চেষ্টা একান্ত প্রার্থনীয়।

আজকাল ডিরেক্টর অব্ পবলিক ইন্ষ্ট্রাকসন স্বয়ংই পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রস্তত করিতেছেন; কিন্তু তাঁহারত বাঙ্গালা ভাষায় এত অধিকার নাই, যে, তিনি পুস্তকের দোষগুণ বিচার করতঃ তাহাকে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। অধিকন্তু, তিনি একাকীই কি এত অধিক কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিতে পারেন? কখনই না, সুতরাং তাঁহাকে পরসাপেক্ষ হইতেই হইবে। তজ্জন্যই তাঁহাকে Text Book Committeeর তালিকা হইতে বাছিয়া কতকগুলি পুস্তক লইতে হয়! Text Book Committeeর মেম্বরগণ কেহ বেতনভুক্ নহেন। তাঁহাদিগের স্ব স্ব কার্য্যনির্ব্বাহার্থই তাঁহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। এই পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে যে টুকু অবসর পান, তাহাতেই পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিয়া তাহাকে কমিটীর তালিকাভুক্ত করেন। অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক যেমন নাম দেখিয়া পুস্তকের সমালোচন করিয়া থাকেন, ইঁহারাও তদ্রূপ গ্রন্থকার বা প্রেসের নাম দেখিয়া সেই পুস্তক তালিকাভুক্ত করেন কি জানি না: তবে উপরোধ অনুরোধ যে অনেকটা রাখেন,

তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপেই অনেক পুস্তক Text Book Coommiteeর দ্বারা পাস হইয়া যায়। তৎপরে, যাঁহারা ডিরেক্টরের সহকারীরূপে বিরাজ করেন, তাঁহাদের সকলেই রক্ষক ও ভক্ষক। পূর্ব্বে যে ইন্স্পেক্টরদিগের দোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ইন্স্পেক্টরদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ইহাতে সম্পূর্ণ সহায়তা করেন। তাঁহারই সাহায্যে তাঁহার অভিপ্রেত পুস্তকগুলি ডিরেক্টরের তালিকার স্থান পায়। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি বলিব, কলিকাতার কোন প্রেসে পুস্তক ছাপাইলে, সেই পুস্তক শীঘ্রই Text Book Committeeর দ্বারা পাশ হইয়া পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ত গেল এদিকের কথা, শেষে আবার সর্ব্ববিধ ইন্স্পেক্টরগণই স্ব স্ব অধিকারভুক্ত বিদ্যালয় সমূহে আপনাপন অভীষ্ট পুস্তকের গুণ বর্ণনা করিয়া সেই খানিই পড়াইবার নিমিত্ত শিক্ষকদিগকে অনুরোধ করেন; সুতরাং তাঁহার রাজ্যে তাঁহার পুস্তকই চলে। অহো স্বার্থান্ধতা!!! ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন অজ্ঞ লোকেরা যে, স্বার্থের জন্য লোকের মস্তকে লগুড়াঘাত করে, তাহাদের স্বার্থপরতা কি ইহাদের স্বার্থপরতার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? তাহাদের স্বার্থের পরিণাম অপেক্ষা কি ইহাঁদের স্বর্থের পরিণাম গুরুতর নহে? তাহারা এককালে একজন বা এক পরিবারের বৈ সর্ব্বনাশ করিতে পারে না। ইহাঁরা এককালে সহস্র সহস্র লোকের বা পরিবারের সহস্র সহস্র প্রকারে সর্ব্বনাশ করেন। তজ্জন্য আমরা ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকুট সবিনয়ে অনুরোধ করি, এবার হইতে তিনি কোন প্রকাশ্য স্থলে Lottery করিয়া পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত করুন। Text Book Commiteeর যে কয়জন মেম্বর আছেন, তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া, তাঁহাদের স্থানে কয়েকজন বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করতঃ যাহাতে দোষগুণের সুবিচার হয় তাহার বন্দ ও বস্ত করিয়া, তাঁহাদের দ্বারাই দোষ-গুণ-গুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া লউন। পরে লিপিবদ্ধ দোষগুণের বিচারপূর্ব্বক কমিটী যে যে পুস্তক যে যে ক্লাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবেন, সেই পুস্তকগুলি লইয়া লটারি করিলে, যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাহারই নাম উঠিবে; অথচ Text Book Committeeর তালিকাভুক্ত কোন পুস্তকের নাম উঠাতে, বালক-দিগেরও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না। আমাদের বিবেচনায়, এইরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে প্রতি বৎসরই এক একজন নূতন গ্রন্থকার প্রতিপালিত হইতে পারেন। চিরকালই আর একজনের পেটভরান হইবে না। এতাদৃশ উপায়ে আয়পথ সঙ্কীর্ণ হইলে দুই একজন পাষণ্ড গ্রন্থকারের পাপস্রোতও কতকটা কমিয়া যাইতে পারে; তাহাতেও সাধারণের পুণ্যসঞ্চয়ের সম্ভাবনা! ডিরেক্টর মহোদয় আমাদের এ অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন কি?

আমরা দেখিতেছি বিধাতা বড় নির্ব্বোধ। একবার তিনি কোন রাজপুত্র ও রাজকন্যার ভাগ্যে 'অশ্বগবাদি বিক্রয় ও বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে' লিখিয়া বিষম বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার চৈতন্য হইল না। তিনি সেকেলে লোক—সাদা সিদে; কুটবুদ্ধির ত ধার ধারেন না; তাই তাঁহাকে সময়ে সময়ে বড়ই

বিপদে পড়িতে হয়। আজ কাল এটর্ণি বেরিষ্টারের যেমন ছড়াছড়ি, কূটবুদ্ধিরও তেমনি দৌড়। আমাদের ভাগ্যবান্ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যেমন অনেক সময় ইহাঁদের সাহায্যে আইনের রহস্যভেদ করিতে পারেন, প্রাচীন পিতামহের রাজ্যে জনকতক এইরূপ ব্যবহারাজীব থাকিলেও তিনি অনেক সময় অনেক সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। "ঘোটকে চড়িয়া এই স্থান দিয়া যাইলে দশ টাকা জরিমানা।" যদি কেহ ঘোটকীতে চড়িয়া যায়, সেও এই নিয়মের অন্তর্ভূক্ত হইবে কি না, পাছে ইহা লইয়া কখন বিসংবাদ ঘটে, এই ভাবিয়া কূটবুদ্ধিমান্ আইনকর্ত্তাগণ অমনি নোট করিলেন—"এস্থলে ঘোটক অর্থে ঘোটকীও ধরিতে হইবে।" আমাদের বৃদ্ধ পিতামহের কি এত বিষয়বুদ্ধি বা দূরদর্শিতা আছে! থাকিলে আর রাজপুত্র ও রাজকন্যার বেলায় অত নাকাল হইতেন না। পাঠকবর্গ বোধ হয় রাজপুত্র ও রাজকন্যার কাছে বিধাতার নাকালের কথা শুনেন নাই; আমার কাছে শুনুন।

ভরতরাজার বর্ষ মধ্যে এক অতুলবিভূতিভাক্ নরপতি ছিলেন। হস্ত্যশ্বরথপত্তি-প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ সেনা, যানাসনবাহন, সুহৃদমাতাকোষ, মণিমাণিক্য-রত্ন প্রভৃতি কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। ভারতবর্ষের জলবায়ুর এমনই গুণ, যে, রাজা হইলেই যেন তাঁহাকে অপুত্রক হইতে হইবে। তাই এ রাজাও অপুত্রক। পুত্রমুখদর্শনে বিমুখ হইয়া সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ থাকেন। একদা এক তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধবাক্ যোগী রাজভবনে উপনীত হইয়া "স্বস্তি" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে নরপতি সাশ্রুনয়নে কহিলেন, যোগিবর! আমার আর মঙ্গল কি? আমি অপুত্রক। যে কয়দিন ধরাধামে থাকি, কেবল বিড়ম্বনাভোগ; পরকালেও অনন্ত নরক। রাজার নির্ব্বেদবাক্যে যোগীর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ত্রিকালত্রয়দর্শী। তপোবলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বা ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট সকলই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। দেখিলেন, মহারাজের একপুত্র ও এককন্যা হইবে। কিন্তু পুত্র হইতে রাজ্যনাশ ও বংশলোপ ঘটিবে; আর কন্যাটি কুলকলঙ্কিনী হইবে। আপাততঃ সামান্য অরিষ্টবশতঃ তাহাদের জন্ম হইতেছে না। দিব্যচক্ষে এই সমস্ত ব্যবহিত বিষয়ও প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিয়া ঋষিবর রাজসমক্ষে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার একপুত্র ও এক কন্যা জন্মিবে। পুত্র হইতে রাজ্যনাশ ও বংশলোপ ঘটিবে; এবং কন্যাটি কুলকলঙ্কিনী হইবে। এখন পঞ্চম স্থানে শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকায় তাহাদের জন্মের বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। বৃহস্পতির দশায় শনির দৃষ্টি-হ্রাস হইলেই তাহাদের জন্ম অনিবার্য্য। ঋষিবাক্য শ্রবণে রাজার অন্তরে যুগপৎ হর্ষবিষাদের আবির্ভাব হইল; কিন্তু নিয়তিসূত্র সর্ব্বথৈব মানবশক্তির অখণ্ডনীয় বিবেচনায় কথঞ্চিৎ স্বস্থচিত্তও হইলেন। প্রস্থানকালে তপোধন আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনাকে একটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিতে হইবে। রাজ্ঞীর প্রসবকালে আমাকে সূতিকাগৃহের দ্বাররক্ষা করিতে দিবেন। আমি যেখানেই থাকি, তৎকালে আসিয়া উপস্থিত হইব। ভূভৃৎ তদীয় বাক্যে সম্মতিপ্রকাশ করিলে, তপস্বী

যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে রাজ্ঞীর গর্ভসঞ্চার হইল। প্রকৃতিপুঞ্জ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এ শুভ সংবাদ-শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। নরপতিও পুত্রমুখদর্শনে পৈতৃক ঋণ ও পুন্নামক নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এই পারত্রিক মঙ্গলে পুলকিত হইলেন। একাদিক্রমে নবম মাস অতীত হইলে, দশম মাসে রাজ্ঞীর প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ইত্যবসরে পূর্ব্বোক্ত যোগী আসিয়া রাজাজ্ঞামতে সূতিকাগৃহের দ্বার আবদ্ধ করিয়া, যেন কেহ প্রবেশ করিতে না পারে, এই ভাবে শয়ান থাকিলেন। এই সময়ে বিধাতাও বালকের ললাটে শুভাশুভ লিপি করিতে আসিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বারত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে, যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? আগন্তুক উত্তর করিলেন—আমি বিধাতা।

যোগী—কিজন্য গৃহাভ্যন্তরে যাইবেন?

বিধাতা—বালকের অদৃষ্টে সমস্ত জীবনের শুভাশুভ লিপি করিতে।

বিধাতার এতদ্রূপ বাক্য-শ্রবণে মহানুভব তাপস দ্বারত্যাগ করিলেন, এবং পিতামহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তিনি পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইলেন। পরমেষ্ঠী স্বীয় মন্তব্য লিপি করিয়া প্রত্যাগমনকালে পুনর্ব্বার দ্বারত্যাগ করিতে বলিলেন। সাধু কোন মতেই দ্বার ছাড়িবেন না, বলিলেন, কি লিখিয়াছেন অগ্রে বলুন, তবে দ্বারত্যাগ করিব।

বি। আমার লিপি কাহাকেও বলি না।

যো। তবে দ্বারও ছাড়িব না।

বি। সে কথা শুনিয়া তোমার কি লাভ হইবে?

যো। যাহাই হউক, না বলিলে আমি কখনই আপনাকে যাইতে দিব না।

সুরজ্যেষ্ঠ বিষম বিপদে পড়িয়া অগত্যা বলিলেন "ইহা হইতে পৈতৃক রাজ্যাদি নষ্ট হইবে; এ এক একটী অশ্ববিক্রয় করত জীবিকানির্ব্বাহ করিবে" ইহাই লিখিয়াছি। যোগীবর দ্বার ত্যাগ করিলে পিতামহ অন্তর্হিত হইলেন। তপোধনও "কন্যা জন্মিবার কালে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইব" এই কথা মহারাজের নিকট জ্ঞাপনকরতঃ পুনরায় দেশভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

আবার গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় কালও ছুটিতে লাগিল। প্রথম বৎসর যেদিকে গেল, দ্বিতীয়ও তৎপশ্চাৎ ছুটিল; তৃতীয় চতুর্থও সেইদিকে চলিল, পঞ্চমও তদভিমুখী হইল। রাজ্ঞী পুনর্ব্বার অন্তর্বত্নী হইলেন, এবং যথাকালে এক কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যোগী মুহূর্ত্তজ্ঞ। যে মুহূর্ত্তে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই দিব্যচক্ষে দেখিতে পান। সুতরাং, রাজ্ঞীর কন্যা-প্রসব-ব্যাপার অবগত হইয়া আবার আসিয়া সূতিকাগৃহের দ্বারে চাপিয়া শুইলেন। পূর্ব্ববৎ বিধাতা আসিলে, যাইবার সময় পথ দিয়া প্রত্যাগমন-কালে বলিলেন, কি লিখিয়াছেন অগ্রে বলুন, তবে দ্বার-পরিত্যাগ করিব। বিধাতাও স্বলিপি-প্রকাশ করিবেন না, যোগীও যাইবার পথ দিবেন না। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর বিধাতা বলিলেন "এ কন্যা দুকুল খাইয়া শেষে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করিবে" ইহাই লিখিয়াছি। এই বলিয়া

মুক্তদ্বারে অন্তর্হিত হইলে যোগীও প্রস্থান করিলেন।

কালপ্রবাহ অনন্ত ও অসীম। কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথা যাইতেছে কে বলিবে? কালের এই ধারাবাহিক গমন বড়ই বিস্ময়াবহ। রত্নাকর অভাবের সময় সহস্র সহস্র নদী হইতে সাহায্য গ্রহণ করে বটে, কিন্তু নিজে পূর্ণ হইলে আবার তাহাদিগকে স্ব স্ব অংশ ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু কালস্রোত যে অনন্ত অসীম অগাধ সমুদ্রে পড়িতেছে, কত যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইল, কত মন্বন্তর কাটিয়া গেল, তথাপি কি ইহার পূর্ণতা সম্পাদিত হইল না! হইলে ত গতকাল আবার প্রত্যাগত হইত। এইরূপ অপ্রত্যাবৃত্তভাবে দেখিতে ২ বৎসরা-নুক্রমে সার্দ্ধৈক যুগ অতিবাহিত হইল। কালের ভীষণ সংঘর্ষণে মুহূর্ত্তৈক মধ্যে যে কত খণ্ডপ্রলয় ঘটিয়া থাকে, তাহা কে বলিতে পারে। কালের এই করাল নিষ্পেষণ দেখিয়া মহাত্মা কবীর সাশ্রুনয়নে বলিলেন—'চলন্তী চক্কী দেখ্ কর্ দিয়া কবীরা রো। দো পাটন কে বীচ আ ন সাকত গিয়া কো।" ইহার অর্থ এই,—চালিত পেষণী (জাঁতা) যন্ত্রে শস্য পড়িয়া নিপিষ্ট হইতেছে, কেহই নিষ্কৃতি পাইতেছেনা, দেখিয়া মহাত্মা কবীর রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার রোদনের তাৎপর্য্য এই, পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই এইরূপ কালের পেষণীতে নিপিষ্ট হইতেছে, কেহইত নিষ্কৃতি পাইতেছে না। আজ অনেক বৎসর ধরিয়াই আমাদের পূর্ব্বোক্ত রাজবাটীতে কালের "চক্কী" ঘুরিতেছে। তাহাতে রাজরাণী, সুখসমাজ, কোষদুর্গ, রাষ্ট্রবল, কিছুই নিষ্পেষিত হইতে বাকী রহিল না। ধন, ঐশ্বর্য্য, বিষয়, বৈভব, সম্পত্তি, মণি, মাণিক্য, রত্ন সকলই গেল! অশ্বশালায় যে কতিপয় অশ্ব ছিল, তাহারই এক একটীর বিক্রয়লভ্য অর্থে রাজপুত্রের কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ হইতে লাগিল। রাজকন্যারও শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলে কেহই রক্ষক না থাকায়, সে কুক্ষিপোষণার্থ বার-যোষিদ্-বৃত্তি অবলম্বন করিল।

প্রায় বিংশতি বৎসর পরে রাজপুত্র ও রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে যোগীবর সেই রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজবাটীর চিহ্নও নাই। লোক পরম্পরায় অবগত হইয়া রাজপুত্র-সমীপে উপনীত হইলেন, এবং আপনাকে তাহার পিতার সুহৃৎ বলিয়া পরিচয় দিয়া নানাবিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

যো। তোমার পিতার বিষয় সম্পত্তি সব গিয়াছে, এখন কি উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছ;

রা। সে দুঃখের কথা কন কেন! এক একটী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা অতি-কষ্টে কালযাপন করি। আর অল্পই ঘোড়া আছে, ফুরাইলে কি হবে জানি না। যত কমিতেছে, আমিও তত খরচ কমাইতেছি।

যো। আমার কথা শুন। তুমি রাজ-পুত্র; এত কষ্ট কি তোমার সহ্য হয়; তুমি প্রতিদিনই এক একটী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া পাঁচ সাতশ টাকা যা পাও, একদিনেই তাহা খরচ করিয়া ফেল।

রা। ঘোড়াগুলি ফুরাইয়া গেলে কি করিব। তখন যে অনাহারে মরিতে হইবে।

যো। তাও কি হয়। যিনি তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তোমার

আহারও দিবেন। তুমি রাজপুত্র, তোমার ভাগ্যে তিনি এত কষ্ট কখনই লেখেন নাই।

যোগিবাক্যশ্রবণে রাজপুত্র ভাবিলেন, তাওত বটে; আমি রাজপুত্র, আমার ভাগ্যে কি তিনি এতকষ্ট লিখিয়াছেন। অদ্য হইতে আমি প্রতিদিনই এক একটী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া পাঁচ সাতশত টাকা যাহা পাইব, সমস্তই একদিনে খরচ করিব; দেখি ভবিষ্যতে অনাহারে মরি কি না। এই বলিয়া সে প্রতিদিনই এক একটী অশ্ব বিক্রয় করত তদ্দ্বারা মহাসমারোহে দিনপাত করিতে লাগিল। অশ্বশালায় শতাধিক ঘোটক ছিল না, মাসত্রয়মধ্যেই সেগুলি নিঃশেষ হইল। কল্য কি উপায়ে দিনপাত হইবে, তাহার সংস্থান নাই, রাজপুত্র ভাবিয়া আকুল হইলেন; এদিকে বিধাতাও ভাবিলেন, ইহার ভাগ্যেত অশ্ববিক্রয় করিয়া দিনপাত করিবে লিখিয়াছি, অশ্বশালায় ত আর অশ্ব নাই, কল্য কি বেচিবে! আমার লিপিত ব্যর্থ হইবে না। যাই অশ্বশালায় একটী অশ্ব রাখিয়া আসি, এই বলিয়া তথায় এক অশ্ব রাখিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজপুত্র অশ্বশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটী অশ্ব রহিয়াছে; সে আহ্লাদে উহাকে বিক্রয় করত যা পাইল, সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিল। বিধাতা সে দিন আবার একটী অশ্ব দিয়া গেলেন। পরদিন রাজপুত্র সেটিকেও বিক্রয় করিয়া সুখসচ্ছন্দে দিনপাত করিল। এইরূপে প্রতিদিনই বিধাতা অশ্ব যোগান, আর রাজপুত্র তাহা বিক্রয় করিয়া দিনপাত করেন। অশ্ব যোগাইতে যোগাইতে বিধাতার প্রাণ ওষ্ঠাগত। কি করিবেন, নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগ কাহাকেও বলিবার যো নাই। যোগিরাজ দেখিলেন, বিধাতা ত রাজপুত্রের নিকট খুবই নাকাল হইতেছেন; এখন রাজকন্যার কাছেও উহাঁর কিছু নাকাল আবশ্যক। বিরিঞ্চিকে ভালরূপ শিক্ষাদিবার এই উপযুক্ত অবসর। নিজের হাতের কলমে যা ইচ্ছা লিখেন, কখনত দায়ে ঠেকিতে হয় না। এবার তাঁহাকে যথোচিত শিক্ষা দিব। এই বলিয়া রাজকন্যার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার পিতার সহৃদয় মিত্র ছিলাম। তাঁহার রাজ্যনাশ ও তোমাদের এবংবিধ বিপৎপাতে আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতেছে। যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করি; কি উপায়ে দিনপাত করিতেছ। রাজকন্যা স্বীয় জঘন্য বৃত্তির পরিচয় দিয়া অতিকষ্টে দিন যাপনের কথা বলিলেন।

যো। আমার কথা শুন, তুমি ত রাজকন্যা; এত কষ্ট তোমার সহিব কেন! বিশেষত তুমি কিছু কুরূপাও নও। তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবে, লক্ষমুদ্রা ব্যতীত কাহাকেও গৃহে স্থান দিব না।

ক। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিলে লোকে আসিবে কেন! দুই এক টাকাতেই প্রতিদিন লোক জুটে না।

যো। অবশ্য আসিবে! প্রতিজ্ঞা চাই; লক্ষহীরা-প্রভৃতিও ত ছিল; তাহাদের কাছে লোকে লক্ষ হীরা দিতে পারিত, আর তোমাকে লক্ষ মুদ্রা দিবে না! ভাল এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াই দেখ না। আর এক কথা, যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ মুদ্রা পাও, পরদিন সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিবে, এক কপর্দকও সংস্থান রাখিবে না। আমার

সন্ধ্যাকালে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিবে। তুই একদিন এরূপ করিয়াই দেখ না। অবশ্যই প্রত্যহ লক্ষ মুদ্রা পাইবে।

যোগীর বাক্যে রাজকন্যা সে দিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বহিল। অনেক ছোট খাট বাবু আসিল, কিন্তু দর শুনিয়া সকলেই প্রস্থান করিল। ক্রমে রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, বিধাতার উৎকণ্ঠা ততই বাড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, ইহার ভাগ্যে ত বারাঙ্গনাবৃত্তি লিখিয়াছি। আজ লক্ষমুদ্রাদায়ী লোক না আসিলে ত আমার লিপি ব্যর্থ হয়। যাই কোথাও একজন এইরূপ লোকের অনুসন্ধান করি। এই বলিয়া যত রাজারুজির ছেলের খোসামোদ করত একজনকে পাঠাইলেন। সে লক্ষ মুদ্রা দিয়া এক রাত্রি রাজকন্যাগৃহে যাপন করিল। রাজকন্যা রাত্রিতে লক্ষ মুদ্রা পাইয়া, পরদিন সমস্ত ব্যয় করত সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। হিরণ্যগর্ভ আবার অনুসন্ধান করিয়া এক লক্ষমুদ্রাবান্ ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। পরদিন রাজকন্যা তদ্দত্ত সমস্তই নিঃশেষ করিল। সে প্রতিদিনই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে; আর, পদ্মযোনি প্রতিদিনই 'নাকের জলে চোকের জলে' হইয়া লোক জুটাইয়া দেন। আপনি যা করিয়াছেন, তাহারত আর চারা নাই। আগে ভাবেন নাই, তাহার ফল ভুগিতেই হইবে। পাঠকবর্গ! কমলযোনির দুর্গতি দেখুন। রাজপুত্রের ঘোড়া ও রাজকন্যার নাগর জুটাইতে জুটাইতে তাঁহার 'নাকে দম' হইল। এত কষ্ট ভোগ করিয়াও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। তবুও তিনি বুঝিয়া সুজিয়া লিখিতে শিখিলেন না; তবুও তিনি জনকতক লোকের ভাগ্যে লিখিয়াছেন— 'তোমাদের বই স্কুলে 'চলিবে'। তিনি ভাবিয়াছিলেন ইহাদের পুস্তক ভাল হউক, মন্দ হউক, পাঁচ সাতটা স্কুলে (তৎকালে পাঁচ সাতটা বৈ স্কুল ছিল না) চলিলে কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধির দূরদর্শিতা আদৌ নাই। তিনিত তখন এরূপ ভাবেন নাই যে, যদি কালক্রমে দুই চারি হাজার স্কুল হয়, আর তথায়ও এই পুস্তকগুলি চলে, তাহা হইলে আমার সৃষ্ট অন্যান্য গ্রন্থকারগণ একবারেই বিফল মনোরথ হইবে। আর ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ করতঃ বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিবে। তাঁহার এই অদূরদর্শিতার জন্যই আজ বঙ্গে দুই চারি জন ভিন্ন সকল গ্রন্থকারই নিরুদ্যম ও ভগ্নসাহস। যদি তিনি লিখিবার সময় 'বর্ত্তমান' এই কথাটি অধিক লিখিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে নিজের লেখার জন্য অনুতাপ করিতে হইত না। তাই বলি, এত ঠেকিয়াও তিনি শিখিলেন না। এখন কেবল সান্ত্বনার জন্য বিড়ম্বিত গ্রন্থকারগণকে বলিতেছেন—'পৃথিবীর কিছুই চিরস্থায়ী নয়, যদুবংশ ধ্বংস হইবে; শশী সূর্য্য গ্রহ কিছুই থাকিবে না; এ সংসারে চিরকালই কি অক্ষয় থাকিবে। স্বয়ং ঈশ্বরও এ নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারিবেন না। কৃষ্ণই বল, আর রাধিকাই বল, এ বোলবোলা কদিন। সকল মনুষ্যই, তারা কুমার হউক, আর বুবাই হউক, নবীনই হউক আর প্রবীণই হউক, একদিন যাইবেই যাইবে। তোমরা কয়েক দিন অপেক্ষা কর; উহাদের ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছি, তাহা ঘটিতে দাও। উহাদের পর তোমাদেরই জয়জয়-

কার হইবে'। বিড়ম্বিত গ্রন্থকারগণ! আপনারা সৃষ্টিকর্ত্তার বাক্যে আস্থাবান্ হইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করুন। বৃদ্ধ পিতামহ এক কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বার বার তিরস্কার করিলে আর কি হবে। সহৃদয় পাঠকবর্গ! আপনাদিগকেও ইনস্পেক্টর কেচ্ছা বলিবার পূর্ব্বে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া অনেকক্ষণ ডিটেন করিয়াছি; তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। মুখে যা বলা যায় কার্য্যে তার অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে। পাঠকবর্গ! আপনারা যদি আমাকে—'ওজুদের বিচে দেখ জবান হালাল। এনচানে একবার রাখেন বাহাল' (অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে জিহ্বাই পবিত্র, কেননা উহার দ্বারা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া লোকে কৃতার্থ হয়। সেই জিহ্বা পাছে অপবিত্র হয়, এই ভয়ে যিনি মনুষ্য, তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেন তাহা নিশ্চিতই পূর্ণ করিয়া থাকেন) এই শ্লোক দ্বারা দোষী করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আমিও 'Quick promisers are often slow performers' অর্থাৎ শীঘ্র অঙ্গীকারকারীরা প্রায়ই বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি করে' এই বলিয়া আমার নিজের দোষটুকু কাটাইয়া দিব। যাহা হউক, দোষ কাটাইলাম বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব না। সত্বরই আমরা মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদেশের বিবরণ।

ভারতবর্ষের যে খণ্ডে আমাদের নিবাস, ইহারই নাম বঙ্গদেশ এবং ইহার অধিবাসীরা যে ভাষায় কথোপকথন বা লিখিত গ্রন্থাদি প্রকাশ করে, তাহারই নাম বঙ্গভাষা। উহারই অপভ্রংশে বাঙ্গালা ভাষা নাম হইয়াছে। বঙ্গদেশ কতটুকু, উহা কোন্ কোন্ সীমার অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে অনেক মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন দেশ যে চিরকালই এক সীমার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিবে, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে; তজ্জন্য বঙ্গদেশেও হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজদিগের সময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন সীমার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, অতি প্রাচীনকালে সোমবংশীয় বলি নামক নৃপতির অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি ক্ষেত্রজপুত্রগণ এক এক দেশে রাজ্য স্থাপন করত ঐ ঐ স্থান স্ব স্ব নামে অভিহিত করেন, তদবধি সেই সকল দেশ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নামে খ্যাত হয়। ইহাতেই নিশ্চিত প্রতীতি হইতে পারে, যে, যে দেশে বঙ্গনামা বলিপুত্র রাজ্য করিয়াছিলেন তাহাই বঙ্গদেশ। যদিও এইরূপে বঙ্গদেশের সত্তা স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু উহার সীমানা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে—

'রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্রের কূল হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বলিপুত্র বঙ্গের রাজ্য, ইহা সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক। শাস্ত্রীয় এই বচনে আমরা কেবল মাত্র বঙ্গদেশের উত্তর দক্ষিণ দুই দিকের সীমানা পাইলাম। পূর্ব্ব পশ্চিমের কোনরূপ সীমার নির্দ্দেশ হইল না। যদি আমরা ব্রহ্মদেশকেই পূর্ব্বসীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করি, তাহা হইলেও পশ্চিম সীমার পক্ষে গোলযোগ রহিল। এখন শাস্ত্রে যে ব্রহ্মপুত্রের কথা নির্দ্দেশ

করিয়াছে, সেই ব্রহ্মপুত্রকেই পশ্চিমসীমা নির্দ্দেশ করিলেও করা যায়; কারণ, ব্রহ্মপুত্র গৌহাটী, গোয়াল পাড়া প্রভৃতি স্থান দিয়া পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া ধুবড়ি পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তৎপরে ধুবড়ী হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া রঙ্গপুর, বগুড়া সিরাজগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি কয়েকটী জেলা পশ্চিমে রাখিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুরের মধ্যে মেঘনার সহিত মিলিয়া সাগরে সঙ্গত হইয়াছে। যদি ইহাকেই শাস্ত্রোক্ত বঙ্গের চতুঃসীমা ধরা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, যে, বর্ত্তমান চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়,গোয়ালপাড়া,কামরূপ, দরং, নওগাঁ, শিবসাগর প্রভৃতি জেলা এবং গারো, খস, জয়ন্তিয়া,নাগা, কুকী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিদিগের বাসস্থান গুলিই উক্ত বঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের আর একটী শাখা বগুড়ার পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত হইয়া ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জের নিকট দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম মুখে আগমন করত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বলে; যদি আমরা এই পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকে পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে আরও দুই একটি জেলা কমিয়া যায়। যাহা হউক, প্রথম কথিত স্থানগুলিই আমরা পূর্ব্বকালের বঙ্গ বলিয়া স্থির করিলাম। এক্ষণে এই সীমান্তর্গত বঙ্গের লোক যে ভাষা কহে, তাহারই নাম বাঙ্গালা ভাষা বলিতে গেলেই, আমাদের মূল অভিব্যাপ্তিতেই দোষ ঘটে। সুতরাং এ বঙ্গ আমাদের বক্তব্য নহে।

আমরা সংক্ষেপেই শাস্ত্রীয় বঙ্গের সীমা নির্দ্দেশ করিলাম। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের শাস্ত্রীয় সীমানির্দ্দেশ করিতে হইলে আরও অনেক লেখা যায়, কিন্তু তাহাতে অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তৎপরবর্ত্তীকালে হিন্দুদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গের সীমা পশ্চিমে আরও বিস্তৃত হইয়া ভাগীরথী পর্য্যন্ত আইসে। তাহাতে খুলনা, যশোহর, পাবনা, রঙ্গপুর, কুচবেহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, নদীয়া ও চব্বিশপরগণ বঙ্গীয় সীমার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। এই সময়েই বোধ হয় গৌড় রাজ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আমাদের শাস্ত্রে এবং বিজাতীয়দিগের ইতিহাসে গৌড়দেশ ও গৌড় রাজধানীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তদ্দারা উক্ত রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

'সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া
মৈথিলোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্য-
স্যান্তরবাসিনঃ॥
কার্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা
রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণ-
বাসিনঃ॥'

এই শ্লোকদ্বয়ে উৎকলকে (উড়িষ্যাকে) বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎকলকে বিন্ধ্যের দক্ষিণবর্ত্তী বলাই সঙ্গত; গুর্জ্জরকে (আধুনিক গুজরাটকে) দক্ষিণদিকবর্ত্তী

বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা দক্ষিণবর্ত্তী নয়, বরং উত্তরবর্ত্তী। ইহাতে স্বতই এইরূপ ধারণা হয়, যে, উক্ত দুই স্থানের স্থিতির কিছু ইতরবিশেষ হইয়া থাকিবে। আমাদের বোধ হয়, আদিকালে প্রাচীন ঋষিগণ ভারতবর্ষের যে দুই বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রথমভাগে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ গৌড় এবং দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটাদি পঞ্চ দ্রাবিড় হইতে পারে। মনুসংহিতাতে আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ বিবরণ আছে।—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যো-রার্য্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥

অর্থাৎ সমুদ্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং হিমালয়ের দক্ষিণ ও বিন্ধ্যের উত্তর, এই স্থানকে পণ্ডিতগণ আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। অমরকোষে লিখিত আছে—

আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্ম্মধ্যং বিন্ধ্য-হিমালয়োঃ।

অর্থাৎ, হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী পুণ্যভূমিই আর্য্যাবর্ত্ত। কিন্তু অনেক স্থলে উড়িষ্যাকে দক্ষিণ-দিক-মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, এবং তাহাই করা উচিত। তবে উহাকেও আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে ধরিতে হইলে, বিন্ধ্যপর্ব্বতকেও পশ্চিম সমুদ্রকূল হইতে গণ্ডওআনার নিম্ন দিয়া ভুবনেশ্বর অথবা পুরীর নিকট বঙ্গোপসাগরে মিলিত এইরূপ কল্পনা করিতে হইবেক *। তাহা হইলেই সারস্বত প্রদেশ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানই গৌড়দেশ। তাহাতে আমাদের পূর্ব্বকথিত, বঙ্গ এবং সারস্বত প্রদেশ ও কান্যকুব্জের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী ভূভাগই গৌড় নামে খ্যাত হইতে পারে। পাশ্চাত্য কোবিদবর Monier Williams অনুমান করেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা ও দীল্লি প্রদেশ গৌড় নামে আখ্যাত হইত। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট আপনাকে গৌড়ীয় নন্দনবাসীনামক কুলজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ের সীমাবিষয়ে কোন গোলযোগ মিটিবার নহে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদঃ ॥

অর্থাৎ, বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ পর্য্যন্ত গৌড়দেশ। এখন ভুবনেশ কোথায়? উৎকল-দেশে ভুবনেশ্বর বলিয়া একস্থান আছে। উহা পুরীর কিঞ্চিৎ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। যদি আমরা সেই ভুবনেশ্বর ধরি, তাহা হইলেত আদৌ গৌড়ের সীমা-নির্দ্দেশই হইল না। কেন না, কোথায় গৌড় আর কোথায় ভুবনেশ্বর। তবে বোধ হয়, পূর্ব্বে ভুবনেশ নামে অন্য কোন স্থান ছিল।

পালবংশীয় রাজাদিগের পরে ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন কোন মহাত্মা দিনাজপুরের রাজবাটীতে বিরূপাক্ষ দেবের এক মন্দির প্রস্তুত করান, উহার একটী স্তম্ভে—

'কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং প্রাসাদো নির-মায়ি'

* হইলার সাহেব তদীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিন্ধ্য পর্ব্বতকে পূর্ব্বসমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইত্যাদি লিখিত আছে। উক্ত শ্লোকে 'গৌড়পতিনা' লিখিত থাকায় অনুমান হয়, এই সময়ে গৌড়রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। তৎকালে উহার রাজধানী দিনাজপুর। আদিশূরের সময়ে বিক্রমপুর রাজধানী হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভাগীরথীর পূর্ব্বপার বঙ্গ ও পশ্চিম পার গৌড়। তাঁহাদের এ ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত নয়; কারণ,প্রথমতঃ ভাগীরথী পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্য স্থাপিত হইলে, হুগলীর সন্নিহিত সপ্তগ্রামই উহার রাজধানী হয়। এককালে এই সপ্তগ্রাম গৌড়েশ্বরের হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত ছিল; এককালে সহস্র সহস্র বাণিজ্যপোতে উহার কাঞ্চী উদ্ভাসিত থাকিত; এককালে সুদূর ইউরোপেও উহার বাণিজ্যের কথা উঠিয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে অনেকানেক ভগ্নাবশেষদ্বারা উহার ভূত ঐশ্বর্য্যের স্মরণ করাইয়া দেয়।

কোন স্থানের সীমা কিছু চিরদিনই একরূপ থাকে না। তজ্জন্যই বোধ হয়, পরবর্ত্তী কালে গৌড়ের সীমা দিনাজপুর ও বিক্রমপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই অগ্রসরের সময়, আমাদের বোধ হয়, বল্লালসেনের রাজত্ব বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বকাল। কারণ, যৎকালে ভরদ্বাজাদি পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্ন পুত্র রাজদত্ত ছাপ্পান্ন গ্রামে সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র দুই বিভাগ করেন। যাঁহারা রাঢ় অর্থাৎ অসুগঙ্গ প্রদেশ সকলে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয়, আর যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাই বারেন্দ্র হইলেন। ইহাতেই স্পষ্ট জানা যায়, যে, আদিশূরাদির কালের গৌড় ও রাঢ় একই স্থান, নামান্তর ভেদ মাত্র। এই সময়েই বঙ্গ ও রাঢ় বা গৌড় মিলিয়া বাঙ্গালা নামে খ্যাত হয়।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইল, যে, আদিশূরাদির রাজত্বকালে বঙ্গ ও গৌড় মিলিয়া বাঙ্গালা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা কি প্রকারে হইল, সহজেই এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। অগ্রে আমরা সেই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। দুই উপায়ে আমরা 'বঙ্গালা' বা 'বাঙ্গালা' শব্দ সিদ্ধ করিতে পারি। প্রথমতঃ, সংস্কৃত-ব্যাকরণ-ঘটিত-সূত্র দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ, অধিকারীবাচক হিন্দি 'ওআলা' শব্দ দ্বারা। 'বঙ্গ এবাং নিবাসঃ' ইতিবাক্যে 'লোপো বহুবচনে' এই সূত্রদ্বারা প্রত্যয়ের লোপ হইয়া 'বঙ্গাঃ' এই পদ সিদ্ধ হইতে পারে। তৎপরে 'বঙ্গা বিদ্যন্তে অস্মিন্' এই বাক্যে 'চূড়াদের্লঃ'এই সূত্রে বঙ্গ+ল হইয়া 'নাম্নস্ত্যর্থে অচোর্ঘ্যঃ' এই সূত্রে দীর্ঘ হইয়া 'বঙ্গাল্' এই পদ সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ বঙ্গরা যে দেশে থাকে, তাহাই বঙ্গাল দেশ। তৎপরে ঐ বঙ্গাল শব্দ হইতেই বাঙ্গালা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ঘাটাল শব্দও এইরূপে সমুৎপন্ন। অধিকারীবাচক 'ওআলা' (১) শব্দ হইতেও বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন

(১) এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে হিন্দি 'ওআলা' শব্দ সংস্কৃত 'বল্' প্রত্যয়েরই অপভ্রংশ। অস্ত্যর্থক হিন্দি 'ওআলা' শব্দ 'বালা' এইরূপে লিখিত হয়। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ 'ওআ' এইরূপ। সুতরাং, 'বালা' হইতেই 'ওআলা' দাঁড়াইয়াছে। হিন্দি 'বালা' সংস্কৃত 'বল্' প্রত্যয় হইতে গৃহীত। ব্যাকরণ-সূত্রে'রজঃ আদেলর্ব অর্থাৎ রজঃ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে বল প্রত্যয় হয়। যথা, কৃষি আছে যার=কৃষীবল; দন্ত আছে যার=দন্তাবল। শিখা আছে যার=শিখাবল। ইহাদেরই হিন্দি হইল, কৃষিবালা, দন্তবালা, শিখবালা, পুত্রবালা ইত্যাদি। ইহাদেরই 'কৃষিওআলা', 'দন্তওআলা', 'শিখাওআলা' 'পুত্রওআলা' এইরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে।

হইতে পারে। যথা বঙ্গ+ওআলা=বাঙ্গালা। এইরূপ গো+ওআলা=গোআলা কিম্বা গয়লা। অনেকে বলেন, আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে, পূর্ব্বকালীন রাজগণ দেশের নিম্ন প্রদেশে ১০ হস্ত উর্দ্ধ ও ২ হস্ত প্রশস্ত এক এক আল বা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা-তেই বঙ্গ+আল বা বঙ্গাল হইতে বাঙ্গালাদেশ নাম হইয়াছে। আমরা এ সিদ্ধান্তকে সর্ব্বতো-ভাবে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। কারণ, নিম্ন ভূমিতে আল দিবার প্রথা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে, উহা ভেড়ী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন সহস্র সহস্র স্থানে আল দিবার প্রথা দেখা যাইতেছে, তখন একমাত্র বঙ্গদেশই আল-যুক্ত বলিয়া বাঙ্গালা নাম ধারণ করিল, আর কোন স্থান করিল না কেন? আল যুক্ত বলিয়া বঙ্গদেশের বাঙ্গালা নাম হইলে আরও দুইচারিটী স্থানের তদ্রূপ নাম শ্রুতিগোচর হইত।

এস্থলে আরও একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, সাধারণ বিশেষণ দ্বারা কাহাকেও বিশেষ করা যায় না। 'হাতওআলা মানু-ষকে ডাক,' 'চারপেয়ে গরু আন' এইরূপ বলিলে যেমন এক বিশেষ ব্যক্তি বা গো'র বোধ জন্মে না, তদ্রূপ সাধারণ বিশেষণ 'আল' দ্বারা বঙ্গের কি বিশেষ জানা যাইবে। যদি কেবল বঙ্গেরই আল থাকিত, তাহা হইলে 'আল-যুক্ত' বঙ্গ এরূপ বলার কতক সার্থকতাও সম্পাদিত হইতে পারিত। সুতরাং, আইন-ই-আকবরীর মতে আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। অধিকন্তু, আমরা দেখি-তেছি, আকবরের অনেক পূর্ব্বে কোন কোন লোকের নামও 'বাঙ্গাল' ছিল। ধ্রুবানন্দমিশ্রি-প্রভৃত কুলজীর বচনে দৃষ্ট হয়, যে বল্লালসেন চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জনকে কুলীন করেন*। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদিশূরাদির রাজত্বকালে বঙ্গদেশের বাঙ্গালা নাম হইয়াছে; সুতরাং, তৎকালে কেহ কেহ 'বাঙ্গাল চন্দ্র' এইরূপ নাম ধারণ করিয়া থাকিবে; সেই 'বাঙ্গাল চন্দ্রই' বল্লালের নিকট কেবল 'বাঙ্গাল' নামে কথিত হইয়াছে। অদ্যাপিও 'বাঙ্গাল চন্দ্র', 'নবদ্বীপচন্দ্র' ইত্যাদি নাম শুনা যায়। এই সমস্ত যথাযথ বিবেচনা করিয়া আমরা একরকমে 'বাঙ্গালা' শব্দের মূল স্থির করিলাম। আমাদের সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত, তাহা বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

হিন্দুদিগের রাজত্বকালের বঙ্গদেশের বিবরণ আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম, এক্ষণে মুসল-মান ও ইংরাজদিগের সময়ের বঙ্গের কথা কিছু বলা আবশ্যক। মুসলমানদিগের রাজত্ব-কালে ফার্সী এবং আরবীভাষার বহুল প্রচার হইয়াছিল। সমগ্র ইউরোপ যখন অমানিশার ঘোর তামসীতে সমাচ্ছন্ন; যখন ইদানীন্তন সুসভ্য ব্রিটিস্‌জাতি ধনুর্ব্বাণ হস্তে বনে বনে মৃগয়া করিয়া আমমাংসভক্ষণ এবং পশুচর্ম্মে কথঞ্চিৎ লজ্জানিবারণ করতঃ স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া মৃত্তিকার নিম্নে অধিবাস করিত, তাহারও অনেক পূর্ব্বে আরবীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন পূর্ণমা-ত্রায় বিরাজ করিয়াছিল। পারস্য ভাষারও সাহিত্য ইতিহাসের অসদ্ভাব নাই, তবে দুঃখের বিষয় এই যে সকল গুলিই আধুনিক। অতি

অতএব মূলানুসন্ধান করিতে গেলে হিন্দি বা বাঙ্গালা 'ওআলা' শব্দ সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন বলিলেও বলা যায়।

* বহুরূপঃ শুচো মায়া অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥

প্রাচীনকালের উক্ত ভাষার কোনরূপ গ্রন্থাদি ছিল না, একথা বলা যায় না, তবে কোন প্রকারে সে গ্রন্থগুলি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজকাল যে গুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের সকলগুলিই মুসলমানরাজত্বকালে বিরচিত। তারিখ-ই-ফিরিস্তা নামক ইতিহাসে হিজরী ৩৮৩ অব্দ হইতে আকবারের মৃত্যু ১০২৩ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরীনামক গ্রন্থও মুসলমানদিগের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয়। ইহাতে কেবল আকবরের সমকালের রাজ্যের অবস্থা, আয়ব্যয় এবং রাজসংক্রান্ত সকল বিষয়ই বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। তৎকালে সমগ্র রাজ্য অষ্টাদশ সুবায় বিভক্ত ছিল। এই সকল সুবারও সম্পূর্ণ বিবরণ উহাতে বিবৃত আছে। আইন-ই-আকবরীতে ভারতের প্রাচীন কথা অত্যধিক লিখিত হয় নাই।

ইবন-বটুআ নামক জনৈক আফ্রিকাদেশীয় পর্য্যটক মহম্মদ-বিন-তোগলকের রাজ্যকালে দিল্লীর প্রাড্‌বিবাক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অবশেষে চীনদেশের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে ভারতের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ঐ গুলির নামমাত্রই কেবল অস্তিত্ব বজায় করিতেছে, মূলগ্রন্থ অনেক অনুসন্ধানেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

গজনীনগরাধিপতি মামুদ প্রাচীন পারসীক ভূপালদিগের ইতিবৃত্ত লিখিবার নিমিত্ত তাৎকালিক কোবিদবর ফারদুসীকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে সাহনামানামক কাব্য বিরচিত হয়। সাহনামা ইতিহাস না হইয়া পুরাণের ন্যায় অলৌকিক অসম্বদ্ধ বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অধিকন্তু, ইহাতে মহম্মদ বা কোরাণের বিষয় কিছুই লিখিত না হওয়ায়, মামুদ যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হন, এবং গ্রন্থকারকে অঙ্গীকৃত স্বর্ণমুদ্রাস্থানে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করেন। এই ক্ষতিতে ফারদুসী এরূপ অবসন্ন হইয়াছিলেন, যে, সেই অবসাদেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। শুনা যায়, সুলতান আক্ষেপ করিয়া অবশেষে অবশিষ্ট স্বর্ণগুলি পুনঃ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু, তৎকালে কবিবরের স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়ায়, মুদ্রাগুলি তদীয় কন্যার হস্তে অর্পিত হয়। পাঠকমহোদয়গণ! সাহনামার রস্তমের হিকমত শুনিয়াছেন; সে জন্মিয়াই দশটী গাভীর দুগ্ধ পানকরিয়াছিল; তিন বৎসর বয়সের সময় অদ্বিতীয় অশ্বারোহী হয়, এবং দশ বৎসরের সময় অসমকক্ষ যোদ্ধা হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত তারিখ-ই-যাসীনা, তাজ-উল-মআসির; তবকাত-ই-নাসিরীনামক আরও কয়েক খানি ইতিহাস আছে। আমরা এই সকল গ্রন্থ হইতে মুসলমানদিগের বঙ্গাধিকারের স্থূল স্থূল বিবরণ প্রকাশ করিব।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে গজনীনগরাধিপতি সবক্তাজিন-পুত্র মামুদ উপর্য্যুপরি ষোড়শ কি সপ্তদশ বার ভারতের নানাভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গে প্রবেশ করেন নাই। তৎকালে ভারতের নানা দেশে হিন্দু ভূপালগণ রাজত্ব করিতেন। মামুদের আক্রমণে কাহারও স্বাধীনতার হানি হয় নাই। অর্থগৃধ্নু মামুদ সমরানল প্রজ্জলিত করিয়া, তাহাতে সহস্র সহস্র মনুষ্যের উত্তপ্ত শোণিত আহুতি দিয়া এবং শত শত নরমুণ্ড সেই যজ্ঞে বলিদান করত উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলেই, 'এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া অকামীর ন্যায় যাঁহার রাজ্য তাঁহাকেই পুনরর্পণ করিতেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অর্থাৎ মামুদের

মৃত্যুর পর একশত চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ অনেকবার অনেক বিজাতীয় বীরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সম্যক্ অধিকৃত হয় নাই। কান্যকুব্জাধিপতি আপনাকে রাজাধিরাজ বলিয়া আখ্যাত করিতেন। অভিষেকাদিকালে অন্যান্য রাজারা আসিয়া তাঁহার সেবা না করিলে, তাঁহার মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকিত না। তদীয় অভিষেক সময়ে নানাদিগ্দেশাগত নৃপতিবৃন্দ বিবিধ শুশ্রূষা করিল, কিন্তু দিল্লীশ্বর আসিল না। ইহাতে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া দিল্লীশ্বরের এক মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া, দ্বারবানের দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তদীয় কন্যার স্বয়ম্বরোপলক্ষে রাজন্যবর্গ সমাহূত হইলে, রাজকন্যা বরমাল্য হস্তে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও মনোনীত না করিয়া দ্বাররক্ষকের স্বরূপ মৃন্ময় দিল্লীশ্বরের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিল। ইত্যবসরে প্রকৃত দিল্লীশ্বরও কোথা হইতে আসিয়া নিমেষমধ্যে রাজকন্যাকে লইয়া পলায়ন করিল। সভাস্থ সমস্ত নৃপতি অবমানবোধে দিল্লীশ্বরের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। এই বিস্ময়াবহ-ব্যাপার-দর্শনে কান্যকুব্জরাজ যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন এবং স্বয়ং প্রতীকারে অক্ষম হইয়া গিজনীপতি সুলতানকে দিল্লী আক্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। তদনুসারে এক উদ্দৃপ্ত সৈনিক ব্যূহ দিল্লী অবরোধ করিল। অধিপতি বিভীষিকাপূর্ণ-হৃদয়ে ভার্য্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু সেই নবোঢা বধূ কাঞ্চীশোভিত কমনীয় নিতম্বে ভীষণ তরবারি আলম্বিত করিয়া বীরোচিতস্বরে—'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং' বলিয়া স্বামীকে সমরোন্মুখ করিল। কিন্তু লক্ষ্মী চিরকালই নীচগামিনী। তাই নিরামিষভোজী সাত্ত্বিক হিন্দুপতি পরিত্যাগ করত মদ্যমাংসাহারী পলাণ্ডুলশুনপ্রিয় রাজসিক যবনের করতলগত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। দিল্লীশ্বর সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিলেন, তৎপত্নীও জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিল। এই সময় হইতেই দিল্লীর তখতে যবনাধিকার বদ্ধমূল হয়।

উর্দ্দুতে একটী প্রবাদ আছে—'জিন্‌হোনে জাল ঔঁরো কে লিয়ে বিছায়া বহ (Pr ও:) আকসর খোদ ফঁাসতে হৈ। ইহারই ঠিক অনুরূপ ইংরাজি 'Men are often to get caught themselves in the snare they set for others.' আমরাও বলি, 'পরের মন্দ করতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।' কনোজাধিপতির তাহাই ঘটিল। বিজয়দৃপ্ত আফগান সৈন্য অবিলম্বে কনোজ আক্রমণ করিল। তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। তদীয় রাজ্য যবনের কবলিত হইল। যবনসেনানীরা দিল্লী ও কনোজের স্থানে স্থানে বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণকরাইয়া তাহাতে—

'বিসমোল্লা হের্ রহমা নের্ রহিম—

আইস আমরা পরম দয়ালু ঈশ্বরের নামে এই কার্য্য আরম্ভ করি।

এল্লেল্লাহ আলাকুল্লে শেইন কদীর—

বাস্তবিক ঈশ্বর সকল বস্তুর উপরেই শক্তিমান।

আল্লাহো নুরুচ্ছুমাবাতে বলা আরদে—

ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবীর আলোক।

আল্লাহো আহদ আল্লাহো ছমদ—

বল, যে ঈশ্বর এক এবং পবিত্র। তাঁহার জন্মদাতা নাই।

লাএলাহ্ এল্লেল্লাহ্ হোজল হৈয়ল কয়ুম—ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি অনন্তকাল জীবিত এবং স্থির থাকিবেন ইত্যাদি লিপি করিল এবং হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ প্রয়াগক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া, উহার নাম রাখিল 'আল্লা আবাদ' অর্থাৎ খোদার স্থান। ঐ আল্লা-আবাদ এখনও ইংরাজিতে Allahabad লিখিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই প্রকৃত উচ্চারণটী করেন না। উল্লিখিত শব্দটীর উচ্চারণ দেখুন, Allah—আল্লা; abad=আবাদ। এইরূপ উচ্চারণ বৈষম্যে কত শব্দের নাম যে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলিবার যো নাই।

লাক্ষণেয়ের অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অর্থাৎ ১২০২ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার (বখত—ভাগ্য; এক্তিয়ার বশীভূত; যাহার ভাগ্য বশীভূত) খিলজি বাঙ্গালা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই বেহার অধিকার করেন। স্থবির লাক্ষণেয় অন্তিমে গঙ্গাতীরে বাসকল্পে শান্তিসুখভোগ করিবার বাসনায় নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে যবনচমূর আক্রমণ-বার্ত্তাশ্রবণে ভীত হইয়া পলায়নপর হইলেন। (১) লাক্ষণেয় শব্দটী আমরা লক্ষণশব্দের উত্তর অপত্যার্থক ফেয় প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন করিলাম, অর্থাৎ আদিশূর হইতে নবম পুরুষোদ্ভব লক্ষণের বংশজাত বলিয়া আমরা ইহার নাম লাক্ষণেয় ধরিলাম। এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণও তাঁহাকে লাক্ষণেয় নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কুলপঞ্জিকাগ্রন্থে (২) ও তবকাত-ই-নাসিরী নামক মুসলমানী ইতিহাসে তাঁহাকে লক্ষণসেন লিখিয়াছে; আর আইন ই-আকবরীতে ২য় লক্ষণসেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। জয়দেবও লক্ষণের সভার পঞ্চরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন (৩)। অস্মদ্দেশে একবংশে দুই জনের একনাম কখনই হয় না। বিশেষতঃ পঞ্চম পুরুষের মধ্যে হইলে পিণ্ডদোষ জন্মে। ইংরাজদিগের মধ্যে একই নাম পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চলিতে পারে; কেবল ভেদজ্ঞাপনার্থ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি এক একটী বিশেষণ পূর্ব্বে দিলেই চলিয়া যায়। আমাদের দেশে এ প্রথা ছিলও না এবং অদ্যাপিও নাই। এই সমস্ত যথাযথ বিবেচনা করিয়া, আমরা ২য় লক্ষণসেনকে লাক্ষণেয় বলিলাম। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গের ইতিহাস লেখক মার্শমান সাহেব তাঁহাকে লাক্ষ্মণাউ বলিয়াছেন (৪)।

বখতিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা অধিকার করিয়া গৌড়নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বখতিয়ারের পর খিলিজিবংশীয় আরও কয়েক জন ভূপতি বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে গয়াসুদ্দিন বঙ্গেশ্বর হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিলে, সুলতান আলটমাস জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দিনকে পাঠাইয়া,তাহার বিনাশসাধন করেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নসিরুদ্দিনের হস্তেই বঙ্গের শাসনকার্য্য থাকে; কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তওগান খাঁ বাঙ্গালার মসনদে উপবে-

(১) কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, যে লক্ষণসেন পলাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে আশ্রয় লন, এবং তথায়ই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

(২) বল্লাল সুতের পুত্র মাধেতে লক্ষণ। মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কেশব ভূপতি হন মাধব তনয়। তার সুত গুণযুত লক্ষণ সে হয়॥

(৩) গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষণস্য চ॥

(৪) Abridgement History of India; History of Bengal, By Marshman. তদীয় বৃহৎ ইতিহাসেও লক্ষণসেনই লিখিত আছে।

শন করেন। এইসময়ে উড়িষ্যার রাজা গৌড় নগর অবরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়াতে প্রত্যাগত হন।

ইহার পর আরও দুই একজন রাজা বঙ্গ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তৎ-পরে সমস-উদ্দিন আলটমাস দ্বিতীয় পুত্র নাজির-উদ্দিন মামুদকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করেন। কোন কোন ইতিহাসে (কোন কোন কেন, প্রায় সমস্ত ইংরাজি ইতিহাসেই) সমস-উদ্দিন আলটমাসের দুই পুত্রই নাসি-রুদ্দিন নামে অভিহিত হইয়াছে। মার্সমান সাহেব নাজির-উদ্দিনই লিখিয়াছেন। অন্যান্য দুই একখানি ইংরাজি ইতিহাসেও নাজির-উদ্দিন দেখা যায়। উক্ত দুইটি নামের অর্থ-গত অনেক পার্থক্য আছে। নাজিরউদ্দি-নের অর্থ—মজহব দেখনে বালা—যে ধর্ম্ম দেখে। কিন্তু নসির-উদ্দিনের অর্থ—দিন মদত করণে বালা—যে ধর্ম্মের সাহায্য করে। ফিরিশতায় নাজির-উদ্দিনই লিখিত আছে। নাজির শব্দটী ইংরাজিতে 'Z' দিয়াই লিখিতে হয়। কিন্তু কোন স্থলে 'S'রও 'Z'র ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে; যেমন Civilisa-tion. বোধ হয়, এই জন্য কোন কোন ইং-রাজি ইতিহাস লেখক নাজিরকে ইংরাজিতে Nasir লিখিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, যে লোকে 'S' কে 'Z'র ন্যায় পাঠ করিবে। ইহার আরও একটী প্রমাণ এই যে, কেহ কেহ 'Nasir' লিখিয়া 'a'র মস্তকের উপর দীর্ঘস্বর-ব্যঞ্জক রেফের ন্যায় '´' এইরূপ এক চিহ্ন দিয়া থাকেন। তাহাতে 'না' এইরূপ উচ্চারণ হইলে, নাজিরই পঠিত হইতেপারে; কারণ, পারস্যভাষায় নসির ও নাসির শব্দের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই; নাজির শব্দেই আছে। সুতরাং, নাজির-উদ্দিন স্থলেই বোধ হয়, ইংরাজিতে 'Nasir-uddin' লিখিত হইয়া থাকিবে। তাহাই এক্ষণে পারস্যভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় ইতিহাসবেত্তৃদিগের নিকট নাসির-উদ্দিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মৃত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পারস্যভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নাসিরউদ্দিন লিখিয়া স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। যাহা হউক, আমরা আলটমাসের দ্বিতীয় পুত্র নাজির উদ্দিনকেই বঙ্গেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলাম। মার্সমান সাহেব তাঁহাকে আলটমাসের Yrandson বলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে পৌত্র কি দৌহিত্র কিছুই বুঝা যায় না। মেডোজ টেলার সাহেব দ্বিতীয় পুত্রই বলিয়াছেন। ইনি রাজ্যেশ্বর হইয়া বিমাতা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন, কিন্তু ভ্রাতৃপুত্র মসুদ-সাহায্যে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ফিরিশতা গ্রন্থে তাঁহার অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি একাধিক দারপরিগ্রহ করেন নাই। এই স্ত্রীই স্বহস্তে তাঁহার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া না দিলে তিনি আহার করিতেন না। এক দিবস রাজ্ঞী খাদ্য প্রস্তুত করিতে হাত পোড়া-ইয়া তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপন করিলে, তদুত্তরে তিনি বলেন 'সহ্য কর, ঈশ্বর তোমাকে পরি-তুষ্ট করিবেন'। কারাবাসকালে নাজির কোরাণের সংশোধন করেন। তাঁহার সন্তা-নাদি ছিল কি না; তদ্বিষয়ে কিছু স্থিরতা নাই; মুসলমানদিগের ইতিহাসে তাহার কোনরূপ উল্লেখ দেখা যায় না।

তৎপরে তুগ্রল খাঁ নামক জনৈক মুসল-মান বঙ্গেশ্বর হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করত বিদ্রোহী হইলে দিল্লীশ্বর তদ্বিরুদ্ধে

যাত্রা করেন এবং তাহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বপুত্র বগরা খাঁকে অভিষিক্ত করত প্রত্যাগত হন। তিনি কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, তদীয় দ্বিতীয় পুত্র কয়কাউস সিংহাসন অধিকার করে। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে কয়কাউসের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সাহেব উদ্দিন গৌড় সিংহাসন সুশোভিত করেন। এই সময়ে তদীয় ভ্রাতা বাহাদুর সাহ সুবর্ণগ্রামের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু উভয়েই অচিরকাল মধ্যেই নিহত হইলে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে ফকির-উদ্দিন সুবর্ণ গ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। তৎকালে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজ্যের তৃতীয়বর্ষে ইনি মোবারেক-কর্তৃক নিহত হইলে, মোবারেক আলাউদ্দিন নাম গ্রহণ করত দুই বৎসর রাজত্ব করেন। ফিরিশতা ইহাকে অতি সামান্য নৃপতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছে। তৎপরে হাজিইলিআস সমসউদ্দিন নামে রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য-বিস্তৃতি করায় সম্রাট ফিরোজ সাহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া একদালার দুর্গে আশ্রয় লন। দিলীশ্বর কৃতকার্য্য হইতে না পাবায় প্রত্যাগত হওয়ায় তদবধি বঙ্গদেশ প্রায় শতাব্দী ব্যাপিয়া স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিয়াছিল। সমসউদ্দিনের পর আরও কয়েক জন যবন রাজা রাজত্ব করেন। তৎপরে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা কংস বঙ্গসিংহাসন অধিকার করতঃ ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র জিৎমল ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জেলালউদ্দিন নাম ধারণ-পূর্ব্বক সপ্তদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৪০৯)। তৎপুত্র আমেদও অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্যভোগ করেন। তৎপরে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৩ পর্য্যন্ত আট দশ জন ভূপতির রাজ্যকাল।

দিল্লীশ্বর আকবরের পিতামহ বাবর তৈমুর ও জেঙ্গিসের বংশোদ্ভূত। উক্ত বংশীয়েরা সমরকন্দ, বোখারা বলখ প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন। উত্তরাধিকারী-সূত্রে বাবরেরও উহাতে স্বত্ব বর্ত্তে। ৯৩০ হিজরীতে তদীয় অন্তঃকরণে রাজবিস্তারের ইচ্ছা বলবতী হয়, তদনুসারে তিনি ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়া বেহার ও লাহোর হস্তগত করেন। অনন্তর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইয়া ইব্রাহিম লোদীর সম্মুখীন হন। ৯৩২ হিজরী, ৭ই রজবে পানিপাতের যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাস্ত ও নিহত হইলে বাবরই দিল্লীর পাদসাহ-পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে নসরতসাহ বাঙ্গালার মসনদে বিরাজমান ছিলেন। বাবর তদ্বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলে তিনি বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া নিষ্কৃতি পান। মোগলকুলতিলক আকবরসাহ দিল্লীশ্বর হইয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা কুত্রাপি বিক্রম প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। তৎকালে দাউদ ও মনিম খাঁ বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন। এই সময়ে জায়গীরদারদিগের উপদ্রব হওয়াতে পাঠানেরা বাঙ্গলার কিয়দংশ অধিকার করেন। তাহাদিগের বিদ্রোহ নিবারণের জন্য সম্রাট মানসিংহের হস্তে বাঙ্গালা ও বিহারের রাজ্য-ভার প্রদান করেন। কবিকঙ্কণ স্বরচিত চণ্ডীকাব্যে মানসিংহের গুণ গান করিয়াছেন, যথা—

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে।
বিধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে
খেলাত পায় মামুদ সরীফে॥

জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যপুত্রকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে সে কচুবনে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করে, তাহাতে তাহার কচুরায় নাম হয়। কচুরায় সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া তৎসমীপে প্রতাপের অত্যাচারের কথা বর্ণন করিলে, তিনি তাহার দমনের নিমিত্ত মানসিংহকে পাঠাইয়াছিলেন। মানসিংহ প্রথমে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া তথায় বীরসিংহপুত্র ধীরসিংহের আতিথ্য-গ্রহণ করেন। পরে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অগ্রদ্বীপে গোপীনাথজী দর্শন-পূর্ব্বক নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তৎপরে বল্লভপুরে ভবানন্দের বাটীতে সবিশেষ সমাদরের সহিত কয়েক দিবস বাস করিয়া ভবানন্দসহ যশোহরে উপনীত হইয়া প্রতাপকে গ্রেপ্তার করত দিল্লী প্রেরণ করেন। প্রত্যাগমন-কালে তিনি ভবানন্দকে চতুর্দ্দশ পরগণার জমীদারী প্রদান করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের সময়ে বাদশাহ ব্যতীত দেওয়ান, দারোগা, কাজী, মুফতী, মহত-সিব, ফৌজদার, কানুনগু, কোতয়াল প্রভৃতি নানা লোকের উপর রাজ্যের নানা কার্য্যের ভার থাকিত। রাজস্ববিভাগে নায়েব, পেশকার, খাজাঞ্চী, গোমস্তা, মহাফেজ, মোহরের, তহশীলদার প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ কর্ম্ম করিত। আদল শব্দের অর্থ বিচার। আদালত শব্দের অর্থ বিচারের স্থান। রবিবারকে রোজ আদালত কহিত। ঐ দিবস সম্রাট স্বয়ং গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতেন। কাজির হস্তে উত্তরাধিকার-বিচার ও ধর্ম্মবিষয়ক-কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত। মুফতীগণ আইন-ব্যাখ্যাতা ছিলেন। কিন্ত হুইলার সাহেব (Talboys Wheeler) বলেন—"The Cazis were judges, and decided law cases; the Muftis were officers appointed to enforce the observance of religious duties.

আমরা হুইলার সাহেবের এ ধারণায় অনুমোদন করিতে পারিলাম না। মহতসিব মাতাল বা নেশাখোরদিগের শাসন এবং ব্যবসায়ীদিগের পরিমাণ দ্রব্যসকল পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। কানুনগু ভূসম্পত্তির রেজেষ্টরী ও কোতোয়াল রাত্রিতে নগর-রক্ষা করিতেন। অধ্যাপনাকার্য্যে মুন্সী, মৌলবীরা নিযুক্ত থাকিতেন। সাতখানি কোরাণ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ থাকিলেই, তিনি হাফেজ নামে অভিহিত হইতেন। হাফেজগণ-মুসলমানসমাজে বড়ই সম্মান পাইয়া থাকেন।

এইবার আমরা ইংরাজাধিকারে বঙ্গের বিবরণ প্রকাশ করিব। ইংরাজাধিকারে বঙ্গের উত্তরদিকের সীমা নেপাল, ভুটান ও সিকিম। পূর্ব্বসীমা আসাম দেশ। দক্ষিণ সীমা ভারতীয় আখাত। দক্ষিণ পশ্চিম উড়িষ্যা ও গণ্ডআনা; এবং পশ্চিম সীমা বেহার। ইহার পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩৫০ মাইল বিস্তৃতি। উত্তর দক্ষিণে ৩০০ মাইল। ইহাতে যশোহর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, কটক, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, রঙ্গপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, পাটনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি জিলা আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে আসামও বঙ্গদেশ মধ্যে পরিগণিত ছিল। একণে স্বতন্ত্র। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সকল নিম্নলিখিত জাতি

প্রেসিডেন্সীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা; (১) বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (বেঙ্গল, বেহার ও উড়িষ্যা সহিত) ; (২) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ (ইহার মধ্যে করদ এবং মিত্ররাজ্যসকলও পরিগণিত) ; (৩) পাঞ্জাবপ্রদেশ ; (৪) মধ্যপ্রদেশসকল (ইহাতেও কয়েকটী করদ রাজ্য আছে) ; (৫) ব্রিটিস্ ব্রহ্ম (পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু এক্ষণে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন বলিয়া উহাকেও ভারতবর্ষ মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে) ; (৬) আসাম (এই রাজ্য এক্ষণে চীফ্ কমিসনরের অধীনে রক্ষিত হয় ; (৭) বম্বে প্রেসিডেন্সী ; (৮) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

পারস্যভাষায় একটী প্রবাদ আছে—'না বোরদা রনুজ গনজ্ ময়চ্ছর ন মীশোদ' 'অর্থাৎ, দুঃখ না সহিলে সম্পত্তি লাভ হয় না। আরবীয় ভাষায় বলে—'ইন্নামা আল আছরে ইয়েছরা কায়েন্ নামা আল আছরে ইয়েছরা' অর্থাৎ দুঃখের পর সুখ হয়। সংস্কৃতে বলে—'নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে'। দুঃখ ব্যতীত সুখলাভ হয় না। লাটীন ভাষায় আছে—'Fel latet in melle'. দুঃখব্যতীত সুখ কোথায়?

ইংরাজগণই উক্ত প্রবাদগুলির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া অকুল পাথারে অনাহারে এবং ঝটিকাদিবিপৎপাতে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণসঙ্কট করিয়া পূর্ব্বদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা তাহাদের চিত্তে উদিত হইবে কেন? অষ্টম হেনরির রাজ্যকালে রবর্ট থরননামক এক বণিক্ চীনদেশের সহিত বাণিজ্যের কথা তুলেন। তাহাতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন তিনি খানি অর্ণবপোত সর হগ উইলুবীর অধীনে গ্রীনউইচ হইতে যাত্রা করে; পথিমধ্যে দুই খানি লোকজনসহ বিনষ্ট হয়; এক খানি কেবল ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছিল। ১৫৭৭খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ফ্রান্সিস্ ড্রেক পাঁচ খানি জাহাজ লইয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর প্রদক্ষিণ করিয়াই প্রত্যাগত হন, ভারত তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়নাই। এই অভিযানেও বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ১৫৮২ সালের ১লা মে অপত্য-যাত্রায় এডওয়ার্ড ফেণ্টন চারি খানা জাহাজ লইয়া বহির্গত হন; কিন্তু একখানিমাত্র সঙ্গে লইয়া স্বদেশবাসীকে কালামুখ দেখাইয়াছিলেন। ১৫৯১ অব্দে এক বণিকব্যূহ তিন খানি অর্ণবযান লইয়া যাত্রা করিল। কিয়ৎদূর আসিলে সমুদ্রের বিসদৃশ বায়ু লাগিয়া অনেক লোক গলগণ্ড-রোগে প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট সকলেই প্রায় জীবন্মৃত হইল। তজ্জন্য "রএল এডওয়ার্ড" আর অগ্রসর না হইয়া রোগীদিগকে লইয়া প্রত্যাগমন করিল। দুই খানি ভারতাভিমুখে আসিতেছিল। তন্মধ্যে 'পেনিলোপ' যেন পর্য্যটন-ক্লেশে আক্রান্ত হইয়াই সমুদ্রগর্ভে বিশ্রাম করিতে গেল। এখন কেবলমাত্র 'এডওয়ার্ড'ই কর্ত্তব্যসাধনে উন্মুখ হইয়া পূর্ব্ব মুখে চলিতে চলিতে ব্রেজিলের উপকূলে পৌছিল। আরোহীরা প্রায় অনেকেই তীরে অবতরণ করিয়াছে, এমন সময়ে দুর্ব্বৃত্ত জাহাজের রজ্জু কাটিয়া বেড়াতে

জাহাজ বায়ুবেগে যে কোথায় চলিয়া গেল, কিছুই ঠিকানা হইল না। পোতাধ্যক্ষ ল্যাঙ্কেষ্টার সাহেব অপর ছয়জন লোকের সহিত একখানি ফরাসী পোতে উঠিয়া স্ব দেশাভিমুখে চলিলেন; আসিতে আসিতে ছয় জনই মানবলীলা সম্বরণ করিল; অবশেষে তিনি একাকী ১৫৯৪ অব্দের ২৪শে মে তারিখে ইংলণ্ডে পৌছিলেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে এলিজিবেথের রাজ্যকালে ত্রিশ সহস্র পাউণ্ড মূল ধনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই পর্ত্তুগীজরা ভারতের সহিত বাণিজ্যের উদ্যোগে ছিল। উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাস কো ডিগামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন খানি তরি লইয়া ভারতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৪৯৮ সালের ২০ শে মে কালিকাটে পৌছিয়া তত্রত্য মুরজাতীয় জমরিন (বাদশাহ) সমীপে পর্ট্‌গালের রাজার দত্ত উপহার গুলি প্রদান করিলেন। পাঠক! ইয়ুরোপীয় ঐশ্বর্য্য দেখিতে চানত একবার আমার সঙ্গে আসিয়া উপহার গুলি স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন সার্থক করুন। ঐ দেখুন চারি খানি সালুর কাপড় উপর্য্যুপরি রাখা হইয়াছে। এই কাপড় আমাদের দেশের জমিদারেরা পূজা বা অন্যান্য পার্ব্বণের সময় আপনাদের বাটীর পাইকদিগকে দিয়া থাকেন। তার পর ঐ দেখুন ছয়টি সোনার টুপি। ঐ সোনায় এদেশীয়ের কি কার্য্য হইবে? প্রকৃত অবস্থায় থাকিলেও একদিন উহারা চকমকির উপকরণ হইত। অনন্তরে দেখুন চারিটি প্রক্ষালনপাত্র, ছয়টি almosar এবং কতক গুলি পিত্তল-নির্ম্মিত তৈজস। এদিকে দেখুন এক বাক্স শর্করা, দুই পিপা তৈল এবং এক পিপা মধু। আমমাংসভোজী ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট শর্করা উপাদেয় এবং দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু ভারতে যে বর্ষে বর্ষে কোটি কোটি মন শর্করা প্রস্তুত হয়, তাহা তাহারা স্বপ্নেও জানিত না। যাহারা তৈলাভাবে চর্ব্বি মাখে, তাহাদের কাছে তৈল অবশ্যই বহুমত হইবে; তাই অদ্য ভারতীয় সম্রাট সমীপে তৈলোপহার প্রদত্ত হইয়াছে। মধুপাঠানর কারণ বলি শুনুন। বোধ করি আমাদের বেদোক্ত—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধিঃ মধু নক্তো মুতোষসো। মধুমান্ নঃ বনস্পতিঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্ অস্তু সূর্য্যো: মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ'

এই শ্লোকটি কোন গতিকে ইয়ুরোপীয়দিগের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। তাই তাহাদের ধারণা হইল—যখন ইহারা বায়ু দ্বারা মধু বিক্ষিপ্ত হউক; সমুদ্র মধুক্ষরণ করুক; ঔষধি সকল মধুময় হউক; প্রাতঃসন্ধ্যাও মধুব্যাপ্ত থাকুক; আমাদের বৃক্ষ মধুময় হউক; পৃথিবীর ধুলাও মধুময় থাকুক। আমাদের পিতা মধু দিন; সূর্য্য মধুমান হউন; এবং গাভীরাও মধু প্রদান করুক; ইত্যাদি প্রকারে নানা লোকের কাছে মধু চাহিতেছে, তখন মধু অবশ্যই ইহাদের ঈপ্সিততম হইবে, এইরূপ ভাবিয়াই পর্ট্‌গালের রাজা মধু পাঠাইয়া থাকিবেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত উপহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জমরিন হাস্ত-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পাঠকগণও বোধ হয় পারিবেন না। ইহার একশত বৎসর বিশ পরে সার টমাস রো ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেমস প্রদত্ত কতকগুলি উপহার লইয়া জাহান-গীরের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। চলুন না, একশত বিশ বৎসরে, ইহারা কি উন্নতি করিয়াছে দেখিয়া আসি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সংস্থাপিত হয়। উক্ত কোম্পানি সুরাটে কারখানা করিয়া বাণিজ্য করিতে ছিল। দূত রোসাহেব তথায় পৌছিবামাত্র তাঁহার সম্মান-প্রদর্শনার্থ আটচল্লিশটী তোপ হয় এবং অর্ণব পোত সকল পতাকা-শোভিত থাকে। কিন্তু ইনিই জাহানগীরের দ্বিতীয় পুত্র পারবেজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে-গিয়া রাজদরবারে প্রবেশ করিবার অভি-প্রায় জানাইলে পারবেজ বলিয়াছিলেন—

নহ সাহে কারস নহ বুজুরগ সুলতানে তুর্কস্থান বরায় দর আমদনে আঁ মজলিস এজাজত রাকতে।

'Neither the Shah of Persia, nor the Grand Turk would have been permitted to enter the gallery'.

সেইজন্য আমরাও বলি 'আপনে ঘর কা হর শকস বাদশা হৈ' (pr হ্যায়) অর্থাৎ আপনার ঘরে সকলেই রাজা। রো সাহেব জাহানগীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপহারগুলি প্রদান করিলেন। উপহার যথা—একটী ছোটখাট পিয়ানো (বাদ্য-বিশেষ), একখানি তলওয়ার; একখানি কাজ করা ওড়না; কতকগুলি ছুরি ও একখানি কোচ। সম্রাট উপহারগুলির অকিঞ্চিৎ-করত্বে বিক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

গর শাহে ফেরেঙ্গ সুলতানে বুজুরগ বুদে লাঙ্গয়েব আঁ চন্দ জওআহেরাত বেশ কিম্মত ব(Pr ও) পুরহায় বেবহাঙ্গা ফিরিস্তাদে।

'If the King of England had been a great sovereign, he would at least have sent some precions stones and pearls.

অহো ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত প্রভু জহাঁপনা! তুমি স্বর্ণভূমির অধিপতি! তোমার তুল্য ঐশ্বর্য্য পৃথিবীতে কার আছে? তাহাদের আবাস-ভূমিত তোমার আবাসভূমির ন্যায় রত্ন-গর্ভা নয়! তাহারা মাণিক মুক্তা জহরত কোথায় পাইবে? তোমরা অঙ্গরক্ষিণীর উপর মণিমুক্তা দিয়া খচিত কর, তাহারা উভার কোটে লাকলাইন দড়ি আঁকা বাঁকা করিয়া বসাইয়া আপনাদের সক মিটায়। তোমাদের মুকুটে হীরা মাণিক মুক্তা ঝলমল করে, তাহাদের টুপির উপর বকের পালক মন্দপবনে দুলিয়া দুলিয়া আপন লঘুত্বের পরিচয় দেয়। চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, মরকত, পদ্মরাগাদি কত কত মহামূল্য প্রস্তরে তোমাদের প্রাসাদ কেমন উজ্জ্বল্যমান, আর বক্ষ বক্ষের কাচ-পাত্রে তাহাদের গৃহ ও টেবিল কেমন সুস-জ্জিত। তোমাদের রাজস্ব ও কোষ বাসী তাহাদের কাহিনীর বলিয়াইত, তাহারা তার-তের সকল পাট মুলা টানিয়া লইতেছে।

তোমরা জন্মতিথিতে তুলা করিয়া আপনাদের সমভারের রজত কাঞ্চন দরিদ্রসাৎ কর, তাহাদের জন্মতিথিতে নিমন্ত্রিতগণ এক এক গ্লাস মদ্য লইয়া 'I drink such and such's health' বলিয়া কার্য্যশেষ করে। তোমাদের দেবালয় বা মসজিদ সকল স্বর্ণমণ্ডিত ও বহুমূল্য-প্রস্তর-খচিত এবং উৎসবাদিতে তাহারা নবনব সজ্জায় সমুজ্জল হয়, আর তাহাদের উৎসবে উপাসনাগার গুলি দেবদারু পত্র ও গেঁদাফুলেই ভূষিত হইয়া থাকে। তোমরা সুগন্ধি, সুসংস্কৃত পলান্ন-ভোজনে আপনাদের রসনাতৃপ্তি কর; তাহারা অর্দ্ধপক্ক মাংস রাই সরিসার গুঁড়া ও লবণ দিয়া খাইতে পাইলেই চরিতার্থ হয়। তোমাদের সাচ্চা, তাদের গিলটী; তোমাদের চাঁদী, তাদের জার্ম্মণ সিলভার; তোমদের স্ফটিক, তাদের কাচ। জুলিয়স এগ্রিকোলা ব্রিটনদেশ আক্রমণ করিয়া সমুদ্রকূল হইতে কতকগুলি কড়ি লইয়াই প্রত্যগত হয়; কিন্ত সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া মামুদ গাড়ি গাড়ি সোণা, হীরা, মাণিক, মুক্তা ও প্রবাল লইয়া গিয়াছিলেন। ভাস কো ডিগামা কালিকাটের পাদশাহার সভাকুট্টিমের অনুপম-সৌন্দর্য্য-দর্শনে স্বীয় নিমেষকেও বঞ্চনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। স্যার টমাস রো পারবেজের দরবার দেখিয়া হতজ্ঞান হন; এবং জাহানগীরের দরবারে প্রবেশ করিয়া মনে করেন, আমাদের দেশের কৈ কিছুইত এরূপ সৌন্দর্য্যশালী নহে। তবে লণ্ডনের কোন কোন সমৃদ্ধ মন্ত্রালয় এইরূপ দেখায় বটে। ভারতবর্ষের এই ঐশ্বর্য্যালোকে আকৃষ্ট হইয়াই ও ইংরোপীয়েরা ভারতে আসিতে উন্মুখ হইয়াছিল; এবং এই লোভেই ইংরাজ দুই শতাব্দী ধরিয়া কত ক্লেশ, কত বিপদ, কত অবমাননা সহ্য করিয়া আজ ভারতের একচ্ছত্রী হইয়াছে। ভারতীয় সন্তানগণ! যে দিন রো সাহেব পারবেজের দরবারে প্রবেশাধিকার না পাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, সেই এক দিন; আর আজ বজোরে মণিপুরের রাজভবনে প্রবেশ করতঃ কত বিসদৃশ কাণ্ডই না করিল, এই এক দিন, একবার ভাবিয়া দেখুন। যে দিন একটু স্থানের জন্য ইংরাজ আবেদন-পত্র-হস্তে ভারতীয় সম্রাট বা রাজাদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন, তাদের সেই এক দিন; আজ আবার সেই সকল দেশীয় রাজাই ইংরাজের কাছে কৃতহস্ত, রেসিডেন্টের ক্রীড়াপুত্তল, মূকবৎ নির্ব্বাক, পঙ্গুবৎ পরাপেক্ষ, তাদের এই একদিন। যে দিন চার্ণক সাহেব সম্রাট আরেঙ্গজেবের আক্রমণে ভীত হইয়া সুতানুটী পরিত্যাগ করত সুন্দর বনের জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিলেন(১) ইংরাজ বণিকের সেই এক দিন; আর যখন কন্সেণ্ট বিলের নামেই ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় বিশ কোটি হিন্দু 'প্রভু রক্ষা কর, প্রভু রক্ষা কর' বলিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিলেও সার্থক রাজপুরুষ লান্সডাউন

(১) কোন কোন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, হুগলি হইতে সুতানুটীতে পলাইয়া আইসেন। এপর্য্যন্ত কি ইংরাজি কি বাঙ্গালা যত ইতিহাস বাহির হইয়াছে, সর্ব্বত্রেই মত প্রায় ভিন্ন ভিন্ন। আমরা ইতিহাসসমালোচন কালে সে সমস্ত বিবৃত করিব।

আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না—ইংরাজ রাজের এই এক দিন। যে দিন পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া এবং ভবিষ্যতে সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কোম্পানি পূর্ব্ববৎ বাণিজ্যের ফারমাণ প্রাপ্ত হয়, ইংরাজের সেই এক দিন, আর যে দিন বিনা বা অত্যল্প অপরাধেই ছিদ্রান্বেষী ইংরাজ আপনার ও শত্রুর বলাবল ভাবিয়া রাজনীতিবিরুদ্ধ চতুর্থ উপায়ে ব্রহ্মরাজকে বন্দী করিল, জিগীষু ইংরাজের এই এক দিন। যে দিন রাজবিদ্রোহাপরাধে জহানগীরের আদেশানুযায়ী আম্বোয়নানগরে বার জন শ্বেতচর্ম্মের ফাঁসী হয়, এবং এই নিদারুণ সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া জেমসের কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি প্রতীকারবিমুখ ছিলেন—সময়জ্ঞ ইংরাজের সেই এক দিন, আর যে দিন সেই রাজদ্রোহিতার আরোপ করিয়া যুবরাজ টিকেন্দ্র ও স্থবির টাঙ্গালকে ফাঁসী কাঠে ঝুলাইয়া দেশীয়-হত্যার প্রতিশোধ লইল নীতিমান বিদেশীয়ের এই এক দিন। শতাব্দীদ্বয় মধ্যেই আমরা এইরূপ বিরুদ্ধ দিনের যে কত শত সমাবেশ দেখিতে পাই, তাহা লিখিতে গেলে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য আমরা আরও অধিক লিখিতে অগ্রসর হইলাম না। কিন্তু পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ, যেন তাঁহারা উঁহাদের কার্য্যের উপর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। কেবলই 'ইংরাজের রাজ্যে আমাদের সুখের একশেষ হইয়াছে; ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের বুদ্ধাঙ্কুর উদগমিত; আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি' বলিয়া অর্ণ্যপাত করিবেন না।

ইংরাজেরা ভারতে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া শেষে ফাল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে বসিবার জায়গা লইয়া শেষে চৌদ্দপোয়া হইয়াছেন। আদৌ সুরাটে কারখানা খুলিয়া বসিলেন। ক্রমে মান্দ্রাজ বোম্বাই পাইয়া একটু কাত হইলেন। পরে পাটনা কাশিম বাজার পাইয়া দুইপা ছড়াইলেন। শেষে হুগলি কলিকাতা পাইয়া চিৎপাত হইয়া শুইলেন। ইহাদের কারখানার এখন বেশ লাভ হইতেছে, সুতরাং তাহারা স্থানে স্থানে বিক্রম প্রকাশেও পরাঙ্মুখ নহে। উর্দ্দুতে একটী প্রবাদ আছে—'বন্ন আই পর অহমক দানা হোতা হৈ।' অর্থাৎ, ভাগ্যপ্রসন্ন হইলে নির্ব্বোধও বুদ্ধিমান হয়। তাই ইংরাজ আজ আত্মরক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। বিলাতবাসীরা এখন এদেশে আসিতে হইলে বলে – We are going to make a fortune' বিলাতবাসী শুনিয়াছে—'There is money every where in India, on the trees, under the ground, and sometimes scattered over it.' তাই পঙ্গপালের ন্যায় ইংরাজ আজ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। যে millionaire শব্দ ইংলণ্ডের রাজার নিকটেও তিষ্ঠিতে পারে না, ভিক্ষুকের ঘরে ঘরে সেই শব্দ বিরাজমান। সাত্ত্বিক হিন্দুর শিক্ষা—

'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।'

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥

রাজসিক স্লেচ্ছের কাছে—

'Money is all, money is all,
Without money you must full.'

অর্থপিশাচ ইংরাজ এই মন্ত্রামন্ত্রই শিরোধার্য্যকবতঃ তীব্রবেগে ভারতাভিমুখে ছুটিয়াছে। ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লে ভারতের কার্য্যে স্বীয় বেতন ব্যতীত ত্রিশ লক্ষ টাকা pocket expense করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানির ধনাগার হইতেও ঋণস্বরূপ প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করেন। পলাসীর যুদ্ধে ইংরাজদিগের যে ক্ষতি হয়, উহার পূরণার্থ মীরজাফর দুই কোটী বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করে। তদ্ভিন্ন সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজের খরচার স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হয়। কলিকাতা কমিটীর প্রত্যেক সভ্য দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ক্লাইব স্বয়ং দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাবেও তিনি ষোল লক্ষ মুদ্রা হস্তগত করেন। তিনি স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহার তেইশ লক্ষের কম লভ্য হয় নাই। প্রথম কিস্তীর আশী লক্ষ টাকা নৌকা বোঝাই হইয়া মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আইসে। বক্সারযাতে মীরণের মৃত্যু হইলে তদীয় ভগিনীপতি মীরকাশিম মীরজাফরের বিনাশার্থ মিষ্টার হলওয়েলকে তিন লক্ষ এবং মিষ্টার বান্সিটার্টকে প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান করে। শুনা যায়, বাঙ্গালার মিংহাসনের জন্য মীরকাসিম ইংরাজদিগকে উৎকোচ দিয়াই বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিল। বক্সারের যুদ্ধে জয়ী হইয়া মেজর মনরো [illegible] নগদ মুদ্রায় তিন কোটি টাকা হস্তগত করে। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র নজম-উদ দৌলা পিতার উত্তরাধিকারী হইবার বাসনা জানাইয়া কলিকাতা কৌন্সিলের Senior Officer দিগকে তের লক্ষ তিরাশী হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা প্রদান করে। মিল সাহেব তদীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ইংরাজদিগের উৎকোচাদি এবং কোম্পানির ক্ষতিপূরণাদিতে মুরশিদাবাদের ধনাগার হইতে পাঁচ কোটি চুরাশই লক্ষ চারি হাজার নয় শত আশী টাকা বহির্গত হইয়াছিল। অযোধ্যার উজীর রোহিলখণ্ডের স্বত্ব পাইবার জন্য হেষ্টিংস সাহেবকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ইংরাজ সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলাকে মাসিক দুইলক্ষ ছয়ষট্টি হাজার টাকা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অমিতব্যয়ী সুজার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল। তাহার খোর্দ্দমহলের ব্যয় মাসিক বিংশতি সহস্র তঙ্কা। তৎকালে অযোধ্যার রাজস্ব বার্ষিক বিশ লক্ষের অধিক ছিল না। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যের ব্যয়ই বৎসরে ত্রিশ বত্রিশ লক্ষ। সুজা প্রতি মাসেই ঋণী হইতে লাগিল। কোম্পানির কাছে ক্রমে ক্রমে এ বৎসরের বাকী পড়িল। হেষ্টিংস টাকা আদায়ের জন বেগম দিগের স্ত্রীধন-লুণ্ঠনের পরামর্শ দিলেন। নিষ্ঠুর সুজা তাহাতেই সম্মত হইল এই কার্য্যে হেষ্টিংসের বিলক্ষণ লাভ হয়। বেনারসের রাজার নিকটেও নাকি তিনি দুশ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। তদীয়

সত্যবাদী William Cowper তদুদ্দেশে যে-কয়েকটী পঙক্তি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

'Hastings ! I knew thee young, and of a mind
While young, humane, conversable and kind,
Nor can I well believe thee gentle then,
Now grown a villain and the worst of men.

চৈৎসিংহকে আক্রমণ করিবার জন্ত বিজয়র অবরুদ্ধ হইলে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কর্ণাল পোপহামের হস্তগত হয়। এরূপ শুনা যায়, গবর্ণর জেনারেলের আদেশমতে উহার অধিকাংশই সৈন্যমধ্যে পুরস্কারস্বরূপ বিতরিত হইয়াছিল। গবর্ণর রামবলড মান্দ্রাজে থাকিয়া নানা অসদুপায়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা হস্তগত করেন। কার্ণাটিকের নবাবের নিকট পল বেনফিল্ড নামে অসদুপায়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে ... করিয়াছিলেন।

কার্ণাটিকের নবাবের নিকট পল বেনফিল্ড বলেন, যে তিনি ষষ্টি লক্ষ মুদ্রার জন্ত নবাবকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যক মুদ্রাই গ্রহণ করিতে সম্মত হন। পাঠক। একবার ধীরচিত্তে ভাবুন দেখি, ভারতের কত টাকাই শ্বেতপুরুষের উদরসাৎ হইয়াছে। বিকস্র নরের হস্তে পড়িয়া সোণার লঙ্কার যে দুর্দশা হইয়াছিল, তদংশজাত ইংরাজের হস্তে আজ সোণার ভারতের সেই দুর্দশা ঘটিয়াছে। ভারতের ধনাপহরণে শ্বেতদ্বীপ দিন দিনই স্ফীতবপু হইতেছে, আর যাহাদের ধন, তাহারা এখন পথের কাঙ্গালি। মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্ত শ্বেত পুরুষের পদানত। ভারতমাতা বৃদ্ধা হইলেও এখনও প্রচুর 'দুগ্ধ' প্রদান করে। সেই দুগ্ধ খাইয়া এখনও কোটি২ কোটি ভারতসন্তান হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু শোষক ইংরাজ সেই সব মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া দিন দিন ভারত সন্তানকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। অহো দুর্দ্দৈব ! ভারতের ভাগ্যে কি এই ছিল ? ভাবিতেও যে হৃৎকম্প হয়, তবে লিখিব কিরূপে ; ভারতে ইংরাজাধিকার লিখিতে গেলেই যেন আমাদের হস্ত অবশ হইয়া যায়, মুখ হইতে আর শব্দ বহির্গত হয়না, কি এক অভূতপূর্ব্ব অনুশোচনা আসিয়া যেন আমাদের অন্তর দগ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকবিদ্ধ করিতে থাকে। যেন মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ছটফট করিতে থাকি। কিছুতেই বাষ্প-বারি সম্বরণ করিতে পারিনা। তজ্জন্য আমরা আর অধিক ইংরাজ কাহিনী লিখিতে পারিলাম না। পাঠক মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন। যদি কখন ভারতের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া আপনাদের সেই ক্ষোভ মিটাইতে পারি, তজ্জন্য সময়ান্তরে চেষ্টা করিব।

এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা একটী বিষয়ের অবতারণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকাল দেখিতেছি, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশিষ্টতা-লাভেচ্ছায় অনেকেই বিব্রত। তজ্জন্য অনধিকারচর্চ্চারও পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে। যাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কাহারও কর্ণে উচ্চ নিক্বণ প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এখন

বেদের সংস্কর্ত্তা বা সর্ব্বময়কর্ত্তা। যাঁহাদের বংশের আদিকাল হইতে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত কেহ কখনও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলাপ করেন নাই, তাঁহারা এখন ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্মদাতা এবং পোষয়িতা। যুগযুগান্তরে যাঁহারা কখনও উপনিষদ আরণ্যকের নামও জানিতেন না, তাঁহারা এখন উহাদের নষ্ট-কোষ্ঠি উদ্ধার করতঃ কোন দিনে উহাদের জন্ম, তাহাও স্থির করিয়া দিতেছেন। এতাদৃশ অনধিকারচর্চ্চীদিগের দ্বারা দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। আমরা এইস্থলে দুই একটীর নামোল্লেখ করত, তাঁহাদের অনধিকারিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইব।

মিষ্টার আর, সি, দত্ত ইহাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইহাঁর Literature of Bengalএ ইহাঁর সাহিত্যজ্ঞতার পরিচয়; আর ইহাঁর ঋগ্বেদসংহিতা ইহাঁর বৈদিকপাণ্ডিত্যজ্ঞতার পরিচায়ক। ইনি নাটকনবেল লিখিয়া Novelist হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া Text Book Committeeর লিষ্টে বিরাজ করিতেছেন; History of India লিখিয়া ইউনিভার্সিটিতে ঢুকিয়াছেন। এই সমস্তই ইহাঁর অনধিকারচর্চ্চা। তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস। যদ্যপি আপনার অধিগত বিষয়ের পক্ষোদ্ধারে সচেষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারও মঙ্গল এবং দেশেরও মঙ্গল হইত। মৎপ্রণীত কাব্যকুসুমের ভূমিকায় তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া, তাঁহার লেখার ভাবভঙ্গির কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। তদীয় গ্রন্থনিচয়ের বিস্তৃত সমালোচনও আমাদের এই সমালোচনীর যথাযোগ্য স্থলে বিবৃত হইবে। এক্ষণে তদ্বিষয়ক অন্যান্য দুই চারিটী কথা এ স্থলে প্রকাশিত করা যাইতেছে। দত্তজ লিখিয়াছেন—'My esteemed friend Pandit Satya Vrata Sama Sramin has published an excellent edition of Samaveda'.

অহো বৈদগ্ধী! সামশ্রমিন্ কর্ত্তৃকারক! কেননা, উহা publishedএর Nominative. দত্তজ মহাশয় উপক্রমণিকার 'গুণিন' শব্দের প্রথমার এক বচনের পদ জানেন না; অথচ ঋগ্বেদের এডিসেন করিয়া ফেলিলেন। অধিকন্তু তিনি Sraminও স্বতন্ত্র পদ করিয়া উহাতে Capital Letter দিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পয়সা রাখিবার স্থান ছিলনা, তাই ইহাঁকে ঋগ্বেদের এডিটার করিয়া অনর্থক অজস্র অর্থ রাশি বরবাদ করিয়াছেন। এ দেশে কি আর লোক ছিল না!!! •

রমেশ বাবু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতানুসরণে বড়ই মজবুত। অবশ্য তাঁহার এই ব্যাধি পূর্ব্বাবধি প্রবল না থাকিলে, বোধ হয়, তিনি বেদব্যাসের আসনাধিকারে লোলুপ হইতেন না। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পল্লবগ্রাহী বিদ্যার বলে ও আপনাদের অবিমৃষ্যকারিতার দোষে প্রায়ই শঙ্করে শাখামৃগত্ব নিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকেই আজ কাল এক হুজুগ তুলিয়াছেন, যে, কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এতৎপ্রতিপাদনার্থ তাঁহারা যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব দর্শাইয়া তন্মুখেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের স্থূলদর্শিতার পরিচয় দিব।

কিছু দিবস পূর্ব্বে Royal Asiatic Societyর জার্ণেলে (Vol. X X. Pt. I) 'Kalidas in Ceylon' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিষয়টির স্থূল তাৎপর্য্য আমরা এস্থলে বিবৃত করিতেছি।

পাঁচশত বাইশ খৃষ্টাব্দে সিংহলে কুমারদাস নামে এক নৃপতি ছিলেন। একদা তিনি কালিদাসকে তদীয় সভায় আমন্ত্রণ করেন। রাজ কুমার এবং কালিদাস উভয়েই এক বরাঙ্গনাতে প্রেমাসক্ত হইলে, সিংহলেশ্বর তাহার গৃহভিত্তিতে একটী সমস্যা লিখিয়া উহার প্রত্যুত্তরদাতাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সমস্যা যথা—

বন তম্বরা মল নো তলা রোনট
বানি।
মল দেদারা পণ গলবা গিয়
সেবানি।

ইহার অর্থ এই,—বন্য মক্ষিকা পদ্মিনীর কোন হানি না করিয়া তাহার মধুপান করে, কিন্তু রাত্রিতে মুদিত পদ্মে আবদ্ধ হইলে, প্রাতঃকালে উহার বিকাশমাত্রেই প্রাণ লইয়া সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান করে।

যথাকালে কালিদাস তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্যাবলোকনে তৎপাঠান্তে জানিলেন, যে তদুদ্দেশেই উহা লিখিত। তদনুসারে তিনিও উহার নিম্নে প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিলেন। প্রত্যুত্তর যথা—

সিয়ত অম্বরা সিয় তম্বরা সিয়
লেবেনি।
সিয় স পুরা নিদি নো লবা উন
লেবেনি।

ইহার অর্থ এই—সূর্য্য (সূর্য্যবংশীয় রাজা) পদ্মিনীর (স্ত্রীর) সহবাসেচ্ছু হইয়া তাহার সহবাস লাভ করে বটে, কিন্তু, তৎপরে তাহার (পদ্মিনীর) বিশ্রাম সুখলাভ হয় না।

পূর্ব্বোক্ত রাজার কবিতার ভাবার্থ এই যে, সেই বরাঙ্গনা পদ্মিনীতে কালিদাস বন্য মক্ষিকা। তাহার উচিত যে সময়ে সময়ে পদ্মিনীর মধুপান করিয়া সর্ব্বদাই আপন জঙ্গলে থাকা, আমি সূর্য্য, আমিই সর্ব্বক্ষণ উহার ভোক্তা। কালিদাসের কবিতার ভাবার্থ এই যে, যাবৎ সূর্য্য, তাবৎ পদ্মিনীর বিশ্রাম-সুখ লাভ হয় না, (অর্থাৎ, রাজা যতক্ষণ থাকেন, তৎক্ষণ সেই কামিনীর স্থির হইবার জো থাকে না) তজ্জন্য সে বন্য মক্ষিকার (কালিদাসের) সহবাসাকাঙ্ক্ষিণী। কারণ, তৎসহবাসে তাহার বিশ্রাম আছে।

পর দিবস কুমার দাস বরাঙ্গনার গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সমস্যার প্রত্যুত্তরদর্শনে বিস্মিত হইলেন, এবং রচয়িতার নাম জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেও, সেই নারী প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে কোন ক্রমেই ব্যক্ত করিল না। পুনর্ব্বার কালিদাস তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাহাকে হত্যা করিয়া গৃহমধ্যে প্রোথিত করত, স্বয়ং উহার রচয়িত্রী এইরূপ ভাণে রাজার নিকট পুরস্কারের প্রার্থনা করিল। তদ্বাক্যে নৃপতির প্রত্যয় জন্মিল না। তিনি কোটপালদিগকে আহ্বান করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার গৃহের আয়ত্ত অনুসন্ধান করাইয়া কালি-

দাসের মৃতদেহ প্রাপ্ত হইলেন। এই বিস্ময়াবহ-ব্যাপার-দর্শনে ভূভুক্ বংশরো-নাস্তি সংক্ষুব্ধ ও সুহৃৎশোকে একান্ত অধীর হইয়া জলন্ত চিতায় আত্মত্যাগ করিলেন।

বিষয়টীর স্থূল তাৎপর্য্য এই। তৎপরে লেখক মহাশয় Rhys Davids সাহেব বলিতেছেন যে, উল্লিখিত আখ্যানটি আমি সুদুষ্প্রাপ্য Alwisএর 'সিদত সংগবব' নামক পুস্তকের ৬১পৃষ্ঠায়, এবং Knighton সাহেবের সিংহলেতিহাসের ১০৩ পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। কিন্তু, উক্ত দুই মহাত্মা যে কোথা হইতে এ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা তাঁহারা আপনাদের পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। তজ্জন্য উহার সময়-নির্দ্ধারণও হয় নাই। ফলতঃ, সিংহলের কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা, যে, কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

পাঠকবর্গ! ব্যাপারটা ত আগাগোড়া শুনিলেন। এক্ষণে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পূর্ব্বোক্ত উভয় কবিতারই রস-ভাব প্রণিধানে সহজেই আমাদের একপ উপলব্ধি হইতেছে, যে উহাদের রচয়িতার দুই জনই কালিদাস। নতুবা, এইরূপ শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তির রচনা তদিতর সম্ভব হয় না। যাহা হউক, Davids সাহেব যখন নিজেই স্বীকার করিতেছেন, যে, তদধিগত পুস্তকদ্বয়ে কুমার দাসের সময় নির্দ্ধারণ নাই, তখন তিনি কিরূপে ৫২২ খৃষ্টাব্দ কুমার-দাসের রাজত্ব-কাল বলিয়া স্থির করিলেন। ইহারই নাম 'বিজ্ঞমোল্লার বলন'। প্রত্নতত্ত্বের অনেক স্থলেই এইরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের লীলাখেলা হইয়াছে। "কাকের বাড়ীর পাশে, কি গাছের পাতা বেটে খেলে, কি ব্যামো আরাম হয়" পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় নির্ব্বোধেরা এই প্রকারে রহস্য করিত, এক্ষণে চতুর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, হউক বা নাই হউক, Et de Potasheদের বাড়ীর পাশে Asania Maria গাছের পাতা বেটে খেলে Hopchites আরাম হয় বলিয়া, লোকের নিকট সমস্ত কিত বাতুজনদের পরিচয় দিয়া থাকেন। সেই পাশ্চাত্য প্রকৃতি বশতই Davids সাহেব ৫২২ খৃষ্টাব্দ কুমার দাসের রাজ্য কাল বলিয়াছেন। লীলাময় শ্বেতাঙ্গের লীলা বুঝা ভার—

ত্বয়া বাঙ্গালীশ! পুরাতত্ত্বজ্ঞেন
যথা শ্রাবিতোঽস্মি তথা শৃণোমি!

এইবার তৎপরবর্ত্তী বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত আখ্যানটী সিংহল দেশে প্রচলিত আছে কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত ত্রিনকমলিনিবাস কলিকাতাস্থ কেস্রভদ্র নামক জনৈক প্রগাঢ় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমি তিন চারি খানি সিংহলী ভাষার পুস্তক পাঠ করিলেও উক্ত ভাষায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বা তন্মুখ-বিনির্গত সিংহলী ভাষা বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। এবং আমি অত্যল্প ইংরাজি বুঝিলেও তিনি তাহা বুঝেন না। তজ্জন্য, সংস্কৃত ভাষাতেই তৎসমীপে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে বলিলেন,—

'ন ময়ৈতৎ জ্ঞাতং, ন বা কদাপি শ্রুতম্" ॥

তদীয় বয়ঃক্রম অনুমিত পঞ্চাশৎ বৎসর

হইবে। যখন তিনি এই প্রবাদের বিন্দু বিসর্গও জানেন না বা শুনেন নাই, তখন ইহার মূল যে কতদূর দৃঢ় তাহা আমাদের অনুমানেও আইসে না। যাহা হউক, উক্ত প্রবাদ সিংহলের সর্ব্বব্যাদী সম্মত নহে। সুতরাং, কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক নহেন। এস্থলে আরও এক বিসম্বাদের সূচনা দাঁড়াইয়াছে। কালিদাস যে সিংহলী ভাষা জানিতেন, তাহা আমরা তদীয় জীবনচরিতে জ্ঞাত বা লোকপ্রবাদেও শ্রুত নহি। সিংহলী ভাষায় তাঁহার জ্ঞান থাকিলে তিনি অবশ্যই কোন না কোন গ্রন্থে, তাহার আভাস প্রদান করিতেন। অধিকন্তু, ইহা সকলেই জানেন, যে কালিদাস উজ্জয়িনী স্থিতা লক্ষহীরার গৃহে হত হইয়াছিলেন। একজন মনুষ্য কখনই দুই স্থানে মরিতে পারে না। অবশ্য এক স্থানের ঘটনা অলীক বলিতেই হইবে। তবে সিংহল-মৃত্যু অলীক, কি উজ্জয়িনী-মৃত্যু অলীক? এক্ষণে Majority লইয়াই এ বিষয়ের মীমাংসা হউক। পাঠকবর্গ! আপনারা কালিদাসের কোথায় মৃত্যু স্বীকার করিবেন, সিংহলে না উজ্জয়িনীতে? আমরা কিন্তু উজ্জয়িনী ভিন্ন অন্যত্র তাঁহার মৃত্যু স্বীকার করিতেই পারি না।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীর যদি কথামাত্রও সত্য হয়, তবে উহার মূল সিংহলে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, তাহাই আলোচ্য হইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, সিংহলে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার হইলে, কোবিদবর কালিদাসের গ্রন্থনিচয় বা তদীয় জীবনচরিত কিছু অনধীত থাকে নাই। তদ্দ্বারা কালিদাসের বারাঙ্গনাগৃহে মৃত্যু সিংহলবাসীদের বিদিত ছিল। তন্নিবন্ধন তাহারা আপনাদের জন্মভূমি কালিদাসের পদরজে পূত ও তদীয় নামে অমরত্ব পাইবে এই আশায় উক্তরূপ সদৃশ ঘটনার অবতারণা করিয়া থাকিবে। দুইটি বিষয়ই প্রকৃত প্রস্তাবে সদৃশ। উজ্জয়িনীতেও রাজা এবং কালিদাস উভয়েই এক লক্ষহীরার প্রেমাসক্ত। সিংহলেও রাজা ও কালিদাস একই যোষিদ্বরায় অনুরক্ত। সিংহলেও অসদুপায়ে তাঁহার বধ, উজ্জয়িনীতেও কুটিল চক্রে পড়িয়া তাঁহার বিনাশ ঘটে। সিংহলেও কবিরাজার কবিতা দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ-পরপক্ষ। উজ্জয়িনীতেও বিক্রমাদিত্য-কালিদাসের শ্লোকদ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তর। সিংহলেও কুমারদাস এবং অষ্টম চিরজীবির এককালে বরাঙ্গনার গৃহে সাক্ষাৎকার ঘটিত না। উজ্জয়িনীতেও বিক্রমার্ক আর সরস্বতীর বরপুত্রের একই সময়ে লক্ষহীরার গৃহে বাস হইত না। "আসমুদ্রে করগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ" এই শ্লোকার্দ্ধই তাহার প্রমাণ।

প্রতীচ্য সূরিগণের মধ্যে অনেকেই কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব শুদ্ধ রমেশ বাবুরই উপরে দোষারোপ বিধেয় নহে। আমরা তাঁহার Ancient India বা শ্বেতকায় বিদ্বদ্গুণীর মতামত পাঠ করিয়াও ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি নাই; কারণ, আভিনিবেশ চিন্তা করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, যে, তত্তদ্ সুপাঠক অনুপাতে অনেক কম; সুতরাং, উহাতে বিশিষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে নাই। সম্প্রতি রমেশ বাবুর বিশ্বাস্যপাঠ্য ইউনিবার্সিটীর ষ্টাণ্ডার্ড কোর্স

মতি বালকবৃন্দের সহচর 'গ্রিক হিষ্ট্রি, অব ইণ্ডিয়া, এন্সাণ্ট এণ্ড মডার্ণ' এতন্নামক পুস্তকেও সেই বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশ-দর্শনে আমরা অতীব ক্ষুব্ধ হইয়াই তৎ-প্রতিবাদে অগ্রসর হইতেছি। কেন না, যাহা প্রাচীন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস, তাহাতে নব্যত্ব-প্রতিপাদন দ্বারা অহম্মুখতা-প্রকাশ করা অতীব গর্হিত। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম বেদাদি শাস্ত্রনিচয় আজকাল ইংলণ্ডজ মনীষিগণের নিকট সার্দ্ধ ত্রি-সহস্রিক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অপৌরুষেয়-বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর তাহা-সর্ব্বতোভাবেই অমর্ষণীয়। রমেশবাবু হিন্দু হইলে কখনই হিন্দুর গুহ্য-প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইতেন না। তজ্জন্য তাঁহার পুস্তক পড়িতে হিন্দুমাত্রেই নারাজ। উহাতে হিন্দুমতের বিরুদ্ধ অনেক কথার সমাবেশ রহিয়াছে। তাহার দিঙ্মাত্র নিদর্শন এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। ১ম, পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে কবরপ্রথা প্রচলিত ছিল। ২য়, বিধবাবিবাহ তাহাদের আদৌ প্রতিহত ছিল না। ৩য়, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ষোলকলাই তাহাদের ভোগে আসিত। ৪র্থ, জাতিভেদের নামও তাহারা শুনে নাই। ৫ম, অনুলোমপ্রতিলোমাখ্য দ্বিবিধ অসবর্ণ-বিবাহই তাৎকালিক আচারবিরুদ্ধ বলিয়া কেহই জ্ঞান করিত না। ৬ষ্ঠ, নরনারীর প্রবৃদ্ধ দশাতেই বিবাহকার্য্য সমাহিত হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। সহৃদয় পাঠক-বর্গ! বলুন দেখি, ইহার কোন্ কথাটিতে হিন্দুর আস্থা হইতে পারে? একেই ত ইংরাজি শিক্ষার তীব্রতায় বিকৃতমস্তিষ্ক বঙ্গীয় ছাত্রমণ্ডলী বৈদেশিক আচার-ব্যবহার-দর্শনে স্বদেশীয় আচারব্যবহারের উপর নাসিকাকুঞ্চন করতঃ উহাদের মূলোৎ-পাটনে উদ্যত, তাহাতে আবার যদি তাহারা ঐ সকল আচারব্যবহার বেদাদিশাস্ত্রসম্মত বলিয়া বেদগুরু রমেশবাবুর নিকট শিক্ষা পায়, তাহা হইতেইত একেবারে সর্ব্বনাশ! হিন্দুদের ঐ সকল প্রথা পূর্ব্বে ছিল কিনা, তাহা আমাদের এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি, যদি কথামালা বা বোধোদয়ের ছাত্রদিগকে ডারউইনের মতানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া যায়, যে, 'তোমরা পূর্ব্ব জন্মে বাঁদর ছিলে; বাঁদর হইতে মনুষ্য হইয়াছ; কেন না, মনুষ্যত্বে ও বাঁদরত্বে সাম্য গুণ অনেক', তাহা হইলে যেমন শিক্ষা-দাতার বাতুলত্ব প্রকাশ পায়, পূর্ব্বোল্লি-খিত বিবরণ গুলিতেও তদ্রূপ রমেশ বাবুর সেই—ত্ব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। কারণ, ডারউইনের থিওরী শিখিবার সময় আট বা দশ বৎসর নয়। আর বেদমর্ম্মগ্রহণের কালও কিছু পনর ষোল বৎসরে হইতে পারে না। যাহারা ঐ ঐ বিষয় জানিবে, তাহারা কথাপ্রসঙ্গে উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে, তজ্জন্য নানা উপায় আছে। পাঠ্য পুস্তকে উহা-দের সমাবেশ মঙ্গলজনক নহে। এতা-দৃশ বিরুদ্ধ ও বিগর্হিত পুস্তককে পাঠ্য-মধ্যে পরিগণিত করিতে ইউনিভার্সিটী আদৌ ইতস্ততঃ করিলেন না। করিবেন কেন, 'মহতের মহতের উপরই নজর পড়ে', এ নীতি ত চিরন্তন। নবগ্রহময় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সকল গ্রহই যে কালধর্ম্মে কুগ্রহের গুণলাভ করিয়াছে, ইহাই বিস্ময় ও

আক্ষেপের বিষয়ীভূত। শ (টি) নির দৃষ্টি যার উপরে পড়ে, সে রাতারাতি রাজাও হয়; আবার কেহবা ফকির হইয়া যায়। রা (হো) হুর প্রকোপ সর্ব্বত্রই সমান। এপর্য্যন্ত কাহারও ভাল করে নাই। ঐ কৃষ্ণকায় ভোগী ক্রূর গ্রহত কেবল লোকের অনিষ্টতেই আছেন। বুধ (থ) গ্রহের নিকট সকলেরই মঙ্গলাশা থাকে বটে, কিন্তু শনি বা রাহু কেন্দ্র গত হইলে সে আশা একবারে ভস্মীভূত হয়। একমাত্র গুরুর কাছেই সর্ব্বসাধারণের ঈপ্সিতাপ্তি হইয়া থাকে; তাহাতে তাঁহার উচ্চস্থান হইলে আরও ভাল। ইউনিবার্সিটীর গুরুরও উচ্চস্থান বটে, কিন্তু অন্যান্য পাপগ্রহের প্রাবল্যহেতু তিনি স্বাভীষ্টসম্পাদনে সমর্থ হইতেছেন না।

কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের সমকালিক, তদ্বিষয়ে আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত-রচনান্তে কবিকেশরী জ্যোতির্বিদাভরণ রচনা করেন, তাহা তদীয় বাক্যেই পরবর্ত্তী শ্লোকে নিরূপিত হইতেছে। যথা;—

শঙ্ক্বাদিপণ্ডিতবরাঃ কবয়স্ত্বনেকে
জ্যোতির্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপূর্ব্বাঃ॥
শ্রীবিক্রমস্য বুধসংসদি প্রাজ্যবুদ্ধে-
স্তৈরপ্যহং নৃপসখঃ কিল কালিদাসঃ॥ (১)
কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃদ্রঘুবংশপূর্ব্বং
জাতং যতো ননু কিয়চ্ছ্রুতিকর্ম্মবাদঃ।
জ্যোতির্বিদাভরণকালবিধানশাস্ত্রং
শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব॥ (২)

ইহাতেই জানা যাইতেছে, যে, কালিদাস জ্যোতির্বিদাভরণনামক জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থের রচয়িতা। অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। না করিবার কারণত আমরা বুঝিতে পারি না। জাজ্বল্যমান কালিদাসের নামেও যদি স্বীকার না করেন; তবে রঘুবংশ কুমারসম্ভবও কালিদাসের নয় বলিলেই হয়। তাহা হইলে ভাগবত বা মহাভারতেও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায়; বা রামায়ণেও বাল্মীকির নাম না দিলেও চলিতে পারে। অনেকের অনুমান যে অন্য কেহ রচনা করিয়া উহা কালিদাসের নামাঙ্কিত করিয়াছে। আমাদের বিবেচনা, এখন যেমন এক জনের কৃতিত্বে অন্যের নাম হয়, পূর্ব্বে তদ্রূপ কার্য্য কখনই হইত না। আমরা জানি, দত্ত ধনের খাতিরে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃতিত্বে স্বীয় নামের সংস্রব রাখেন নাই। কবিরত্নের কৃতিত্বেও আর একজন সর্ব্বাধিকারী আছেন, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু ওরূপ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। অপর, জ্যোতিষশাস্ত্রে কালিদাসের খ্যাতি থাকিলেও, তাঁহার নামে গ্রন্থের আদরাতিশয্যের সম্ভাবনায় কেহ কালিদাসের নাম দিতেও পারিত, কিন্তু মোটেই কালিদাস সেবিধ লোক নহেন, সুতরাং, অন্যের গ্রন্থে তাঁহার নামের সমাবেশ কখনই সম্ভব নয়। অতএব জ্যোতির্বিদাভরণ কালিদাসেরই গ্রন্থ, তাহাতে আদৌ দ্বৈধী নাই। উল্লিখিত জ্যোতির্বিদাভরণের সময় নিরূপণ তিনি স্বয়ংই করিতেছেন—

বর্ষে সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈর্যাতে

কলেঃ সংমিতে মাসে মাধবসং-
জ্ঞিতেঽত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপ-
ক্রমঃ।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে, কলির ৩০৬৭ বৎসর গত হইলে মধু মাসে তিনি জ্যোতির্বিদাভরণ-নামক-গ্রন্থক্রিয়ার উপক্রম করিয়াছিলেন। এক্ষণে কলির ৪৯৯২ অতীতাব্দ। উহা হইতে ৩০৬৭ অন্তর করিলেই ১৯২৫ বৎসর হয়। অতএব এক্ষণকার ১৯২৫ বৎসর পূর্ব্বে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় বাচস্পত্যাভিধানে লিখিয়াছেন—

'ইতঃপূর্ব্বং সংবৎসর-নামক-শাকপ্রবর্ত্তকো ভারতবর্ষে মালব-দেশে উজ্জয়িনীনামরাজধান্যা-মসীমগুণধামবিক্রমাদিত্যনামা নৃ-পতিরাসীৎ ॥'

এক্ষণে সংবতের ১৯৪৮।৪৯ চলিতেছে। তাহাতে তিনিই যে উহার প্রবর্ত্তক, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্বে বটে; তবে কোন বৎসর তাহা নির্দ্ধারিত হয় না। কেহ বলেন, ৫৬; কেহ বলেন ৫৮; আবার কেহ বলেন ৬৮। Taylor সাহেব তদীয় Ancient History নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'He ruled with such extraordinary success, that his reign forms an important era in history, commencing in 58 B. C. according to one account, and ten years latter according to another. মার্শ মান সাহেব তদীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

Fifty six years after the accession of Vikramaditya, Jesus Christ the promised Messiah, became incarnate in the land of Judea.

Professor Dowson এবং General Cunningham (J. R. A. S. Vol. XII. P. 261.) কোনরূপ দ্বৈধীভাব না রাখিয়াই স্বীকার করেন, যে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। Mr. Thomas স্পষ্টরূপে এই-কথার অনুমোদন না করিলেও তিনি বলেন যে, উহা শকাব্দার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিঃসন্দেহ।

রাজা শিবপ্রসাদ C. S. I. স্বদীয় ইতিহাস তিমিরনাশকে লিখিয়াছেন—

ইসীপ্রসঙ্গবংশমে সন ইসবী সে সত্তাবন বরস পহিলে রাজা বিক্রম উজ্জৈন কা রাজ গদ্দি পর বৈঠা, ইস সে বীর বিক্রমাদিত্য ভি কহতে হৈং ঔর সব লোগোংকো জো তাতার কি ওর সে চড় আয়ে থে শিকস্ত দেনে কারণ শকারি ভি পুকারতে হৈং। যদ্যপি যহ ঐসা পরাক্রমী ঔর ইতনে বড়ে মুলুক কা মালিক মহারাজাধিরাজ থা কি আজ তক উসকা সম্বৎ চলা জাতা হৈ।

রাজা শিবপ্রসাদের মত যে সাতান্ন পূঃ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারোহণ।

রাজাবলী হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল নির্ণয় করিতেছি।

'এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ জন নানাজাতীয় হিন্দু দিল্লীর সম্রাট হন। ইহার বিবরণ, রাজা যুধিষ্ঠির

অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৮ জন ক্ষত্রিয় জাতি পুরুদেতে ১৮১২ বৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতীর বিরাম হইল। তাহার পর মহানন্দি নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রাগর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ জনেতে ৫০০ বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর গোতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূর বংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর শক্যাদিত্য নামে পার্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর। এইরূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ বৎসর গত হইল, এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের শকেরও নিবৃত্তি ঘটিল। তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল। এই সম্বতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যেরা পিতাপুত্রে দুই জনেতে ৯৩ বৎসর।

রাজাবলীর পূর্ব্বোক্ত অংশটুকু হইতে আমরা জানিতেছে, যে, কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য সিংহাসনাধিরোহণ করেন; এবং ঐ সময় হইতেই সম্বতের প্রবর্ত্তনা হয়। এক্ষণে কলির ৪৯৯২ অতীতাব্দ। উহা হইতে ৩০৪৪ অন্তর করিলে ১৯৪৮ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবংসরও সম্বতের ১৯৪৮।৪৯ বর্ত্তমান। অতএব ইহাই বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত সময়। আমরা স্থানান্তরে বিক্রমাদিত্যের জীবনচরিত প্রকটিত করিয়া দেখাইব, যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রাজার সঙ্গে রাজত্বকাল রাখিতে গেলে তাঁহাকে কখনই ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলা যায় না। ইংরাজেরা ৫৬ কি ৫৮ বা ৬৮ যাহাই বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ বলুন, এক সম্বং হইতেই আমরা নিশ্চয় করিতেছি, যে তাঁহার রাজ্যকাল ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ বটে। এতদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও যথাযথ প্রকটিত হইতেছে, তদ্দর্শনে পাঠকবর্গ যুক্তিযুক্তই গ্রহণ করিবেন।

বররুচি নবরত্নের অন্যতম। তৎকৃত প্রাকৃত প্রকাশ নামক গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। E. B. Cowell সাহেব তদীয় প্রাকৃত প্রকাশের সংস্করণে লিখিয়াছেন—'Vararuchi appears to have been the first grammarian, who reduced the popular dialects to a system. He flourished in 56. B. C.

মাননীয় H. H. Wilson সাহেব বিষ্ণুপুরাণের বৃহৎ ভূমিকার একদেশে ব্যক্ত করিয়াছেন—'Such were the constituent and characteristic portions of a purāna in the days of Amarasinha, 56 years before the Christain era. অমরসিংহ কালিদাসের সমসাময়িক; সুতরাং, তিনি পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তাহাই বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল।

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র আজীবন ইংরাজদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিলেও এই বিষয়ে শ্বেতকায়দিগের ভ্রান্তি তাঁহাতে সংক্রমিত হয় নাই। তদীয় Indo Arian নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায়, যে, তিনি বিক্রমাদিত্যকে পূঃ খৃষ্টাব্দেই স্থান দিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে আনেন নাই।

কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্তোপাখ্যান হইতেও কেহ কেহ কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের কথা তুলিয়া নানা ছন্দোবন্ধে বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন। ডাক্তার ভাওদাজী বলেন, ঐ মাতৃগুপ্তই কালিদাস। তিনি বলেন, মাতৃ=কালী; গুপ্ত=দাস। উভয় শব্দের একার্থ কালিদাস। আমরা রাজতরঙ্গিণীস্থ মাতৃগুপ্তোপাখ্যানের স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, ঐ মাতৃগুপ্তও কালিদাস বা তাৎকালিক বিক্রমাদিত্যও সম্বৎপ্রবর্ত্তক রাজা বিক্রমাদিত্য নহেন। এই মাতৃগুপ্তে ও আমাদের কালিদাসে বহুল অনৈক্য আছে। রাজতরঙ্গিণী দেখুন—

তত্রানেহস্যুজ্জয়িন্যাং শ্রীমান্ হর্ষাপরাভিধঃ। একচ্ছত্রশ্চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ইত্যভূৎ ॥

* * * *

ম্লেচ্ছোচ্ছেদায় বসুধাং হরেরবতরিষ্যতঃ। শকান্ বিনাশ্য যেনাদৌ কার্য্যভারো লঘূঃ কৃতঃ ॥

* * * *

নানাদিগন্তরাখ্যাতং গুণবৎ-সুলভং নৃপম্। তং কবির্মাতৃগুপ্তাখ্যঃ সভাস্থানস্থমাসদৎ ॥

* * * *

নৃপং স সেবমানস্তং উদ্যোগেন বলীয়সা। অনির্ব্বিন্নো মাতৃগুপ্তঃ ষড়ৃতূনত্যবাহয়ৎ ॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলির স্থূল তাৎপর্য্য এই, যে, তৎকালে উজ্জয়িনীতে শ্রীহর্ষ এই অপর নামধারী রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ছিলেন। তিনি ম্লেচ্ছদিগের উচ্ছেদের জন্য শকগণকে বিনাশ করত কার্য্যভার লঘু করিয়াছিলেন। সেই নৃপতির দিগন্তবিশ্রুতগুণশ্রবণে মাতৃগুপ্ত নামে কবি আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লইল, এবং ছয় ঋতু পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকারে তাঁহার সেবা করিল। পাঠক! প্রথমেই বিষম বিসম্বাদ দেখুন। কালিদাস কোথা হইতে আসিয়া এক বৎসর মাত্র বিক্রমাদিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের কেবল একবৎসরমাত্র স্থিতিতে কে সম্মত হইবে? অধিকন্তু ইনি শ্রীহর্ষনামা বিক্রমাদিত্য; আমাদের বিবাদস্থানীয় নবরত্ন-পোষক বিক্রমাদিত্য নহেন।

তৎপরবর্ত্তী বিষয় যথা—

প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যামথাস্থানস্থিতো নৃপঃ। আকার্য্যতাং মাতৃগুপ্ত ইতি ক্ষত্তারমাদিশৎ ॥ ততঃ প্রধাবিতানেকপ্রতীহারপ্রণোদিতঃ। প্রবিবেশ মহীভর্ত্তুস্ত্যক্ত্বাশ ইব সোঽন্তিকম্ ॥ তস্মৈ কৃতপ্রণামায় মুহূর্ত্তাদেব পার্থিবঃ। ভ্রূসংজ্ঞিতেন ব্যতরৎ লেখং লেখাধিকারিণা ॥

ইহার অর্থ এই—একদা রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া মাতৃগুপ্তকে আহ্বান করিতে বলিলেন। রাজাদেশে অনেক প্রতীহারী যাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করায়, তিনি রাজান্তিকে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণাম করিলে, লেখাধিকারী ভ্রূসং-

জ্ঞিতমাত্র তদীয় হস্তে একখানি লেখ প্রদান করিল।

এস্থলে দ্বিতীয় বিসম্বাদ এই যে, মাতৃগুপ্ত যাইয়া বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করিল। মাতৃগুপ্ত কালিদাস হইলে কখনই বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করিত না; কারণ, কালিদাস ব্রাহ্মণ। আমরাত কালিদাসবিক্রমাদিত্য-ব্যাপারে কোথাও কালিদাসের প্রণামাদি নীচক্রিয়ার সন্ধান পাই নাই। এতৎস্থলে Anglicized ভায়ারা বলিতে পারেন, রাজার নিকট ভক্ত প্রজার প্রণামে আপত্তি কি? আমাদের রাজা যবন হইলেও কি ব্রাহ্মণ প্রজা তাঁহাকে প্রণাম করে না? অথবা, রাজার কথা যাউক, Subordinate ব্রাহ্মণ কি Superior ধোপাকে প্রণাম করিতেছে না! ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, এবম্বিধ আচার ইদানীং প্রবর্ত্তমান হইলেও পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বকালীন রাজচক্রবর্ত্তীও ব্রাহ্মণদর্শনে সিংহাসনত্যাগ করত তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেন; এবং সর্ব্বকল্মষধ্বংসী বিপ্রপাদোদকপানে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। আজকাল উনবিংশ, দুদিন পরে বিংশ; তাহাতেই সব ধ্বংস হইবে। ফলতঃ পূর্ব্বাচারানুরোধে আমরা মাতৃগুপ্তকে কালিদাস বলিতে সম্মত নহি। অন্যান্য বিসম্বাদ অনুপদে প্রকটিত হইতেছে।

বৈরাগ্যাৎ ভুবমুৎসৃজ্য কাশ্মীরেভ্যো বিনির্গতঃ। আহূয় প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ মাতৃগুপ্ত উবাচ হ॥ পুণ্যাৎ বারাণসীং গত্বা সমমার্গসমুৎসুকঃ। ইচ্ছামি সর্ব্বসংন্যাসং কর্ত্তুং দ্বিজজনোচিতম্। অথ বারাণসীং গত্বা কৃতকাষায়সংগ্রহঃ। সর্ব্বং সংন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তোঽভবদ্‌যতিঃ॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলির কেবলমাত্র অর্থ করিলে অসংলগ্ন ও দুর্ব্বোধ হইবে, তজ্জন্য উহাদের অন্তঃস্থ বিবরণও বিবৃত হইতেছে। কাশ্মীররাজ প্রবরসেন কোন কারণবশতঃ রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে যাইলে রাজ্য অরাজক হয়। তৎকালে শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্যের সভায় মাতৃগুপ্ত ছিলেন, তিনি তাঁহাকে আহ্বান করাইয়া লেখার্পণ করিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত মাতৃগুপ্ত পত্র লইয়া গিয়া কাশ্মীরে রাজ্য পালন করিতে থাকেন। কালক্রমে রাজা প্রবরসেন প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় রাজ্যগ্রহণ করিলে মাতৃগুপ্ত প্রকৃতিমণ্ডলীকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমি বারাণসীগমনপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিব। এইরূপ বলিয়া কাষায়পরিধানপূর্ব্বক কাশ্মীরবিনির্গমনান্তে বারাণসীধামে যতিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এস্থলেও বিসম্বাদ এই যে, আমাদের কালিদাস কবে যতি হইয়াছিলেন; তিনি যে কাষায় সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এ কথাত কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই। অতএব মাতৃগুপ্ত কালিদাস নহেন। দাদাভাই (ভাওদাজী) যাহা বলিয়াছেন, তাহাত ফুৎকারেও টিকে না। আর যাঁহারা ঐ বিক্রমাদিত্যকে নবরত্ন-পোষক বিক্রমাদিত্য বলিতেছেন, তাঁহাদের কথাও খাটিতেছে না। এক্ষণে মাতৃগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্যের সময় নিরূপণ করা যাউক।

মাতৃগুপ্তের রাজ্যকাল নির্ণয় করিতে অগ্রে আমরা রাজতরঙ্গিণীর সাহায্য লইব। রমেশ বাবুও উক্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি স্বকপোল-কল্পিত

কালনির্ণয় করিয়াই যত অনর্থ বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন, কনিষ্ক হইতে মাতৃগুপ্ত পর্য্যন্ত একত্রিশ নৃপতির রাজ্যকালে চারিশত বায়াত্তর বৎসর অতীত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, কনিষ্ক সহিত দ্বাত্রিংশৎ রাজ্যের সময় তের শত এগার বৎসর। তিনি গড়ে প্রত্যেকের রাজ্যকাল পঞ্চদশ বৎসর স্থির করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, দুইজন ব্যতীত আর সকলেরই রাজ্যকাল ১৫ অপেক্ষা অনেক অধিক; তজ্জন্য আমরা রাজতরঙ্গিণী হইতে প্রত্যেক রাজার নাম ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ জানিবেন, যে দুইজন মাত্র ভূপতি পঞ্চদশ বর্ষের কম রাজত্ব করিয়াছিলেন, আর সকলেই উক্ত সংখ্যার দুই, তিন, এমন কি চারি গুণ সময় পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছেন।

	রাজাদের নাম	রাজ্যকাল
১।	হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্ক,	৬০
২।	অভিমন্যু	৩৫
৩।	গোনর্দ্দ (৩য়)	৩৫
৪।	বিভীষণ	৪৫।৬
৫।	ইন্দ্রজিৎ রাবণ (২জন)	৩০।৬
৬।	বিভীষণ (২য়)	৩৫
৭।	শ্রীকিন্নর	৩৯।৯
৮।	সিদ্ধ	৬০
৯।	উৎপলাক্ষ	৩০।৬
১০।	হিরণ্যাক্ষ	৩৭।৭
১১।	হিরণ্যকুল	৬০
১২।	বসুকুল	৬০
১৩।	মিহিরকুল	৭০
১৪।	বকাক্ষ	৩৬
১৫।	ক্ষিতিনন্দন	৩০
১৬।	বসুনন্দ	৫২
১৭।	নর	৬০
১৮।	অক্ষ	৬০
১৯।	গোপাদিত্য	৬০
২০।	গোকর্ণ	৫৩
২১।	নরেন্দ্রাদিত্য	৩৬।৩
২২।	যুধিষ্ঠির	৩৪
২৩।	প্রতাপাদিত্য	৩২
২৪।	জলৌক	৩২
২৫।	তুঞ্জীন	৩৬০
২৬।	বিজয়	৮
২৭।	জয়েন্দ্র	৩৭
২৮।	সন্ধিমান	৪৭
২৯।	মেঘবাহন	৩৪
৩০।	প্রবর সেন	৩০
৩১।	হিরণ্য	৩০।২
৩২।	মাতৃগুপ্ত	৪।৯

পূর্ব্বদত্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যাইতেছে, যে কনিষ্ক হইতে মাতৃগুপ্ত পর্য্যন্ত রাজগণের রাজ্যকাল ১৩১১. বৎসর। ৪৭২ বৎসর নয়। উহা লেখকের কপোলকল্পনামাত্র।

রমেশ বাবুর আদৌ বিচারশক্তি নাই; অথচ তিনি এবম্বিধ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কি প্রকারে সাহস করিলেন, তিনিই জানেন। তাঁহার মতেই তাঁহার ভ্রমপ্রদর্শন করা যাইতেছে। যদি কনিষ্কের রাজ্যারোহণ ৭৮ খৃষ্টাব্দে হয়, তৎপরে তদীয় রাজ্যকাল ষাটি বৎসর হইলে, তদুত্তরাধিকারী অভিমন্যুর রাজ্যারোহণ অবশ্যই ৭৮+৬০=১৩৮ খৃষ্টাব্দে হইবে। তিনি করিয়াছেন ১০০ শত খৃষ্টাব্দে। এক রাজ্যেই ৩৮ বৎসরের পার্থক্য। একত্রিশ রাজ্যে কত হইবে, যিনি গুণ করিতে জানেন, গুণ করিয়া লইবেন। আমরা পারিলাম না।

রমেশবাবু আরও লিখিয়াছেন—

We are told that 52 Kings reigned

for a period of 1266 years from the time of Kuru Panchala war to Abhimanyu, the successor of Kanishka.

দত্তজ মহাশয় এ উপদেশটী কোন গুরুর কাছে শিখিয়াছেন? Royal Asiatic Society of London, Asiatic Society of Bengal, এবং Bombay Branch Royal Asiatic Societyর জার্নেলগুলিইত তাঁহার গুরু। ইহাদের কেহইত একথা বলে না। এতদ্বিষয়ে রাজতরঙ্গিণীর মতব্যক্তি করা যাইতেছে। উহাতে লিখিত আছে—

পঞ্চত্রিংশৎ রাজানঃ মগ্না বিস্মৃতি-সাগরে। তদ্রাজ্যে গত বর্ষাণি ১২৬৬।

অর্থাৎ, ৩৫ জন রাজার নাম বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাদের রাজ্যে ১২৬৬ বৎসর গত। আদিগোনর্দ্দের রাজ্য পর্য্যন্ত কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইয়াছিল; অনন্তর, তৎপুত্র দামোদরের রাজ্যকাল ৩৫।৬। পরে তৎপত্নী যশোবতীর রাজ্যও ৩৫।৬। তৎপরে দামোদর পুত্র বাল গোনর্দ্দের রাজত্ব ৩০ ত্রিশ বৎসর। তাহার পরে পঁইত্রিশ জন বিস্মৃত রাজার রাজ্যকাল ১২৬৬ বৎসর। এই কয়েকটি রাজ্যেই কলির প্রারম্ভাবধি ১৯২০ বৎসর গত হইয়াছিল। তৎপরে

১।	লব	৩৫
২।	কুশেশয়	৩।৮
৩।	খগেন্দ্র	৬০
৪।	সুরেন্দ্র	৩০।৬
৫।	গোধারা	৩৫।৭
৬।	সুবর্ণ্যাখ্য	৬০
৭।	জনক	৬
৮।	শচীনর	৭৬
৯।	অশোক	৬২
১০।	জলৌক	৩০
১১।	দামোদর (২য়)	২৫

দামোদরের পরই হুষ্ক, জুষ্ক, ও কনিষ্কের রাজ্যকাল। দামোদরের রাজ্যপর্য্যন্ত কলির ২৪৩৮ বৎসর অতীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে কলির ৪৯৯২ অতীতাব্দ। উহা হইতে ২৪৩৮ অন্তর করিলেই ২৫৫৪ পাওয়া যায়। উহা হইতেই ইসবী সনের ১৮৯২ অন্তর করিলে জানা যায় যে, ৬৬২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্যকাল। কিন্তু রমেশ বাবু বলিয়াছেন ৭৮ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে তদুক্তির অপ্রামাণিকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

General Cunningham Arhæological Reportএ লিখিয়াছেন—'this cannot be the Saka era of A. D. 79, as we are quite certain that Kanishka flourished long before that date.

তবেই রমেশ বাবুর কনিষ্কের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ সর্ব্বথৈব কপোলকল্পনা।

তন্মতে কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ। আমাদের মতে, আমাদের কেন হিন্দুদের মতে, ন্যূনাধিক সার্দ্ধ চতুঃসহস্র বৎসর। কারণ, দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব, এ কথায় হিন্দুদের ধ্রুব বিশ্বাস। অন্যান্য পুরাণাদিতেও ইহার প্রসঙ্গ আছে।

কনিষ্কের রাজ্যারম্ভ ৬৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইলে তদবধি ১৩০৭ বৎসর পরে মাতৃগুপ্ত রাজ্যারোহণ করেন; এবং তৎপরে চারি বৎসর রাজ্য শাসন করতঃ ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে যতি হইয়া বারাণসী অধিবাস করিয়া ছিলেন। অথবা ইহার দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বেও হইতে পারে, কারণ ৬৫৩ বৎসর অতীত কলিতে কুরুপাণ্ডবদিগের আবির্ভাবে মতবাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। পুরাতন কথায় ২০।৫০ বৎসরের অনৈক্য দোষাবহ নহে।

Old Testament নামক গ্রন্থে 'কাইরূস' একটী শব্দ আছে। Rawlinson সাহেব বলেন, উহা সংস্কৃত 'কুরু' শব্দজ। উভয়েরই অর্থ সূর্য্য সম্বন্ধীয় কোন বংশ। পারসীক জাতিরা সূর্য্যকে 'কুরোস' বলিয়া থাকেন। নব্য পারসীক ভাষাতেও 'খুর'শব্দের অর্থ সূর্য্য। Old Testament গ্রন্থেও 'কুরু' শব্দের সমাবেশ জন্য স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, যে উক্ত শব্দটী অতি প্রাচীন। অতএব, কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয় নাই।

রাজাবলীর মত, যে, কলির প্রারম্ভেই কুরু-পাণ্ডবদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল। Dharwar ও Mysore প্রভৃতি স্থানে যে সকল উৎকীর্ণ বর্ণাবলী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাত্মা কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন শিব মন্দির-গাত্রে একটী রাজপ্রশস্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, উহার কাল নির্ণয় এইরূপ। শকাব্দা ৫০৬, কল্যব্দ ৩৮৫৫; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাব্দ ৩৭৩০। ইহাতেই জানা যাইতেছে, যে, কলির ১২৫ বৎসর ব্যতীত হইলে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

এইবার রমেশ বাবুর অন্যান্য আপত্তির খণ্ডন করা যাইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, Houen Tsang নামে চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে শিলাদিত্যের পূর্ব্বতন নৃপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রমেশ বাবুর অনুমিতি প্রমিতি উভয়ই প্রশংসার্হ। স্থূলদৃষ্টিতে গোগবয় এক বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উভয়নিষ্ঠ ধর্ম্মে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই স্থূলদৃষ্টি বশতই রমেশবাবু শিলাদিত্যের সমসাময়িক বিক্রমাদিত্যকে নবরত্ন-পোষয়িতা বিক্রমাদিত্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতক্ষেত্রে অনেকগুলি বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই এতদ্বিষয়ক নানা গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। Meadows Taylor সাহেব তদীয় ইতিহাসে যে কয়েকটী রাজাধিরাজের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মালবাধিপতি Vikramaditya, the great একতম। ইঁহার রাজ্যকাল ৪১০ খৃষ্টাব্দ; কিন্তু ইনিই আবার স্থানান্তরে নবরত্নপোষক বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল ৫৬পূঃ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, অধস্তনকালীন বিক্রমাদিত্যকে প্রমারবংশজ উজ্জয়িনীপতি বীর বিক্রমাদিত্য বলা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত নহে, তাহা নিঃসন্দেহ। অধিকন্তু, আমরা দেখিতেছি, বিবুধসংশ্রুতান্বিত পরন্তপ বিক্রমাদিত্যের পর তৎপুত্র বিক্রমসেন রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন; রমেশ বাবু বলেন—শিলাদিত্য। আরও, বিক্রমচরিত বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের যেরূপ জীবনবৃত্ত পাওয়া যায়, তাহাতে পরবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। অতএব, ইনি কালিদাসপ্রিয় বিক্রমাদিত্য নহেন।

অমরসিংহ বিক্রমভায়ের সমকালবর্ত্তী। এইরূপ প্রসিদ্ধি, যে তিনি বুদ্ধ গয়ার একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। General Cunningham অনুমান করেন, উহার নির্ম্মাণকাল ৪০০ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ *। মৃত মহাত্মা

* পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর বাক্যের প্রামাণিকতা দেখিয়া আমরা হতজ্ঞান হইয়াছি। যে Cunningham সাহেব বিক্রমাদিত্যকে খ্রীষ্টীয় শকের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মতব্যক্তি করিয়াছেন, তিনিই আবার তৎসভাসদ অমরসিংহের বুদ্ধগয়ার মন্দিরনির্ম্মাণকাল ৪০০ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দ বলিতে আদৌ ইতস্তত করিলেন না। ইঁহাদের বাক্যে মনুষ্যের আস্থা থাকিবে কেন!

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অজস্ত নামকস্থানের উৎকীর্ণ বর্ণমালা সন্দর্শনে বিশিষ্ট নৈপুণ্য সহকারে সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে তত্তৎস্থানের স্থাপত্যকর্ম্ম সকল খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহার এই বাক্য শ্বেতকায় সুরিগণের গাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দুঃসহ হওয়াতে James Fergusson সাহেব বিবিধ ব্যঙ্গোক্তিতে স্বীয়গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। যাঁহাদের কাছে জগতের সৃষ্টি পাঁচ হাজার বৎসর বৈ নয়, তাঁহাদের নিকট বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, তন্ত্র, সভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে অবশ্যই তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টীয় শকের পরে না আসিলে চলিবে কেন? তাঁহাদের এই বাহাদুরী যে উক্ত সময়ের ভিতর এতগুলি প্রবেশ করাইয়াছেন—'হাঁদুর মেয়েরা কি কারিগর! যাতে চুল চলে না, তাইতে বাইগুণ পুরলে কি করে।' শ্বেতাঙ্গ বিবুধগণও কম কারিগর নহেন!

স্থানান্তরে রমেশ বাবু লিখিয়াছেন—

'In the Satrunjaya Mahatmya it is stated that Vikramaditya ascended the throne in 469 of the Saka era or 544 A. D.

প্রকরণ-জ্ঞান-হীন ভিষক্ পুত্র যেমন 'নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা কটিং দহেৎ' এই বচনার্দ্ধ দেখিয়া নেত্ররোগীর তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিল, আমাদের অনুমান হয়, এস্থলে সিভিলিয়ান বাবুও হয়ত তদ্রূপ প্রকরণ নির্ণয় না করিয়াই উক্তরূপ বাগ্বিন্যাস করিয়াছেন। যেহেতু, তিনি স্বচক্ষে শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য দেখেন নাই। এসিয়াটিক রিসার্চস নামক গ্রন্থ হইতে Wilford সাহেবের অভিপ্রায়, যাহা ডাক্তার Kern সাহেব স্বীয় বৃহৎ-সংহিতার সংস্করণে প্রকটিত করিয়াছেন; তদ্দৃষ্টে রমেশ বাবুর এই অভিনব ভাবাবতারণ। এইরূপ অপ্রকরণীয় সমাবেশে জিগীষুতা ব্যক্তিবিশেষের অভ্যস্ত বটে, কিন্তু তাহাতে মাদৃশ জনের নিরস্তিই বিধেয়।

একবিধ বাক্যের পুনঃ পুনঃ সমাবিষ্টিতে অনবীকৃততা সংঘটন ভয়ে আমরা উত্তরে আর ইহার প্রলম্বন করিব না। তবে রমেশ বাবুর ন্যায় আর এক মহাত্মার আর একটী কথার আর একটু আলোচনা করিয়া আমরা আর একবার পাঠকবর্গকে উত্যক্ত করিব। এই মহাত্মার নাম ডাক্তার ভাওদাজী। ইনিও হিন্দুসন্তান বটে, কিন্তু সমুদ্রযাত্রাপরাধে সমাজচ্যুত হইয়া ঘোরতর হিন্দুদ্বেষী হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের আচারব্যবহারে রমেশ বাবুর ন্যায় তাঁহারও তীব্র কটাক্ষ আছে। তিনি Royal Asiatic Societyর মুম্বয়ীশাখার একখানি জার্ণেলে কর্ণাটদেশের ৬৩৭ খৃষ্টীয় সনের কোন প্রস্তরলিপির অনুকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন; উহার স্থলবিশেষে কালিদাস ও, ভারবির নামোল্লেখ থাকায়, ভাওদাজী অনুমান করেন, যে উহাই কালিদাস ও ভারবির সময়।

ভাওদাজীর এই বাক্চাতুরীতে বিস্মিত হইয়া আমরা অনুকৃতি পাঠ করিতে অভিলাষী হই। উহা প্রাচীন কার্ণাটিক ভাষায় লিখিত। নব্যকার্ণাটিক ভাষায় আমাদের অত্যল্প জ্ঞান থাকিলেও বর্ণমালার পার্থক্য ও ভাষার বৈভিন্ন্যপ্রযুক্ত আমরা প্রাচীন কার্ণাটিক ভাষায় লিখিত সেই লিপিখানির সম্পূর্ণরূপ মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া এক সুবিজ্ঞ কার্ণাটিক অধ্যাপকের সাহায্যে লিপিখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ডাক্তার সাহেবের চাতুর্য্য হইতে রক্ষা পাইলাম। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণকেও ব্যাপারটা অবগত করাইয়া রাখি।

লিপিস্থ শ্লোকগুলি রবিকীর্ত্তিনামা কোন কবির রচিত। ইনি যে ভাবে কালিদাস ও ভারবির নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, স্বীয় কৃতিত্বে সুখ্যাতির আশাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এস্থলে সমগ্র লিপির বিষয় আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তবে যে স্থলে রবিকীর্ত্তি কালিদাসাদির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তৎপাঠে কাহারও মনে এরূপ ধারণা হইবে না, যে কালিদাস ও ভারবি তৎসম সাময়িক।

ডাক্তার সাহেবগুত উহার ইংরাজি অনুবাদে লিখিয়াছেন—'Kalidas and Bharabi whose fame is compared with that of Robikirti'! তবে তিনিই আবার কালিদাসাদির জীবনকাল ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ বলেন কিরূপে! শূন্যগর্ভ দ্রব্যের ন্যায় তদ্বিধ বাক্যেরও কোনকালে আদর হইতে পারে না।

আর একটী গাজুরির কথা শুনুন—R. A. Societyর মুম্বয়ী শাখার একখানি জার্ণেলে Ball Gangadhar Shastri নামক কোন মহাত্মা একখানি দানপত্র পাঠান্তে লিখিয়াছেন—

'On comparing the names of kings, mentioned in this grant, * * * I am disposed to think that the Prince Vardhan, referred to in this grant, must be the grandson of Vikrama or Vikramaditya, the beginning of whose reign is placed in the Saka year 653 or 733 A. D.

উল্লিখিত তাম্রলিপিখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আমরা উহা হইতে আবশ্যকীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া সাধারণ সমক্ষে অর্পণ করিতেছি; তৎপাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে বিক্রমকে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য বলায় তাঁহার যোল আনাই গাজুরি হইয়াছে। লিপির অংশ বিশেষ যথা—

'স্বস্তি স্বামিমহাসেনপাদানুধ্যাতানাং মানব্যসগোত্রাণাং হারীতীপুত্রাণাং মাতৃগণপ্রসাদপরিলক্ষিতভুজার্গলানাং ক্ষীরোদধিশয়নসুপ্তোত্থিতপ্রসাদপরিলব্ধবরাহলাঞ্ছনানাং চালুক্যানাং বংশে সম্ভূতঃ শক্তিত্রয়সম্পন্নঃ॥ জয়তি রণবিক্রমনৃপো নিরস্তরিপুনৃপতিশৌর্য্যমদরাগঃ॥ কলিযুগখলনির্ম্মথনে সত্যাশ্রয়ভাবিতশ্চরিতৈঃ। অভবত্তস্য সকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিবর্ম্মা স্থিরস্থিতিঃ। সুতঃ সুচরিতাধারঃ কৃতকৃত্যঃ পতিঃ ক্ষিতেঃ। তস্য পুত্রো মহাতেজা কন্দর্প ইব মূর্ত্তিমান্'॥ ইত্যাদি।

লিপিস্থ শ্লোকগুলিদ্বারা জানা যাইতেছে, যে, রণবিক্রমের পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা, তৎপুত্র বর্দ্ধন। যাহা হউক, এখানকার রণবিক্রমের সহিত বিক্রমাদিত্যের কি সাম্য আছে, যদ্দ্বারা শাস্ত্রীমহাশয় ইহাকে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ফলতঃ, এসব ইঁদুর মুখো ঘুঘু ওলাদের (১) কথায় আর

(১) কতকগুলি লোক আপনাদের জিদবজায়ে এত মজবুত যে যাহা বলিবে কিছুতেই তাহার অন্যথা স্বীকার করিতে চায় না। যদি তাহারা একটা ইঁদুরকে ঘুঘু বলিয়া ফেলে, শেষে উহাকে ইঁদুর জানিয়াও আপনাদের কোট বাজায়ের জন্য উহাকে ইঁদুর মুখো ঘুঘু বলিবে, তথাপি পরাজয় স্বীকার করিবে না। আমাদের প্রবন্ধকথিত মহাত্মাগণও তদ্রূপ। তাঁহারা বিক্রমাদিত্যকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। তিনি তাহা না হইলেও ইঁহারা

আমাদের কাজ নাই। সাধারণের নিকট সবিনয় অনুরোধ, যেন, তাঁহারা ইহঁদের কথায় কর্ণপাত না করেন। কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম এক্ষণে দুই সহস্র বৎসর বটে।

প্রাগুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রীমহাশয়ের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়ও আমরা এস্থলে দিয়া রাখি। তিনি ধারমহীশূর প্রভৃতি স্থানের অনেকগুলি ক্ষোদিতলিপি পাঠ করিয়াছেন; তন্মধ্যে তত্রত্য কোন শিবমন্দিরগাত্রস্থলিপি বিষয়ে তিনি বলেন, যে, উহা ৫০৬ শকাব্দ, ৩৮৫৫ কল্যব্দ ও ৩৭১০ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাব্দে লিখিত।

৩৮৫৫ কল্যব্দে ৫০৬ শকাব্দ কিরূপে হইতে পারে? ৩১৭৯ কল্যব্দে শকাব্দের প্রবর্ত্তন হয়। তদনুসারে ৫০৬ শকাব্দে অবশ্যই ৩৬৮৫ কল্যব্দ হইবে। লিপিমধ্যে এবম্বিধ ভ্রমসমাবেশ একবারেই অসম্ভব। নিশ্চয়ই শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠে কোনরূপে এই ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। অত্যল্প অনুধাবনেই তিনি উক্ত ভ্রমের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইতে পারিতেন; তদভাবনিবন্ধন শুদ্ধ তিনি নহেন, সমস্ত জগৎকেই ভ্রমচক্রে নিপাতিত করিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। কারণ, ৩৮৫৫ কল্যব্দে ৫০৬ শক বৎসর হইলে ৪৯৯২ কল্যব্দে অবশ্যই ১৬৪৩ শকাব্দ হইবে। সুতরাং, বর্ত্তমানবর্ষে শকাব্দের ১৬৪৩ বৎসর, ১৮১৩ বৎসর নয়, অনেকেই এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইতে পারেন; এবং ঐ মূল হইতে হয়ত কালক্রমে রমেশ সদৃশ কোন মহাপুরুষ শকাব্দার বয়ঃক্রম দুই শত বৎসর কমাইয়া দিতেও পারেন। পঞ্চভূতের মিলনে চিরকালই অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্ঘটন হইয়াছে। এগুলি সর্ব্বপ্রথম নয়।

পরবর্ত্তীকালীন যে বিক্রমকে দেখিতেছেন, তাহাকেই বীর বিক্রমাদিত্য বলিয়া আপনাদের কোট রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য আমরা ইহাদিগকে ইদুর মুখো ঘুঘু ওলাদের দল ভুক্ত করিলাম।

বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশের লোক যে ভাষায় কথোপকথন ও লিখিতগ্রন্থাদি প্রকাশ করে, তাহারই নাম বাঙ্গালাভাষা। বর্ত্তমান কালে কোন্ কোন্ স্থানের অধিবাসীরা বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করে, আমরা তাহার স্থূল বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। পশ্চিমে মেদনীপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, রাণীগঞ্জ, সিউড়ী, নয়াদুমকা, রাজমহল, পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত। ইহার পশ্চিমেই হিন্দী বাঙ্গালা মিশ্রিত একরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরে ভুটানের নিম্নপ্রদেশ, অর্থাৎ, দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়িকুচবেহার, তেজপুর, লক্ষীপুর পর্য্যন্ত। ইহার উত্তরেই ভুটানীভাষা প্রচলিত। পূর্ব্বে আসামের পশ্চিমসীমা, অর্থাৎ, শিবসাগর, গোলাঘাট, সিলচর, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত। ইহার পূর্ব্বে আসামী ও অন্যান্য ভাষা ব্যবহৃত। দক্ষিণে ডায়মণ্ড হারবার, পটুয়াখালি, সাহারাজপুর পর্য্যন্ত। ইহার দক্ষিণেই বিশাল জলধি। এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের লোক বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত স্থানের বাঙ্গালা বিশুদ্ধ নহে। ঢাকাপ্রভৃতি পূর্ব্বদেশ ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালা অতি কদর্য্য। চব্বিশ পরগণা, হুগলী এবং নদীয়া ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশের অধিবাসীর বাঙ্গালাই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। প্রায় চারি পাঁচ ক্রোটি লোক বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

কোন্ সময়ে এবং কোন্ প্রকৃতি হইতে

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা লইয়া নানা লোকে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন যে, সংস্কৃত হইতেই উহার জন্ম, সংস্কৃতই উহার জননী। আবার কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত উহার জননী নহে, মাতামহী। প্রাকৃতই উহার জননী, প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালার উৎপত্তি। কেহ বা বলেন, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে হিন্দি; হিন্দি হইতে বাঙ্গালা। আমরা কিন্তু যাহা বলিব, তাহা প্রকাশ করিবার পুর্ব্বেই বলি, যে মনুষ্যাদির জন্মের ন্যায় ভাষা কিছু এক দিনে বা একজন হইতে জন্মাইতে পারে না। সুতরাং, অমুক দিনে বা অমুক হইতে অমুক ভাষার উৎপত্তি বলা একরূপ বাতুলের কথা। আমাদের বিবেচনায় পুচ্ছাবলম্বন রোগ বড়ই সাংঘাতিক। কাহারও পুচ্ছাবলম্বন করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলাও জল উঁচুনীচু বলার ন্যায় নরকভোগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি কোন নূতন বিষয় বলিতে পারি, বলিব, না পারি, চুপ করিয়া থাকিব। নতুবা, একজনের উদ্গীর্ণ আপনার মুখ হইতে বাহির করা নিঘৃণের কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই পরিবৃত্তিশীল; সুতরাং, ভাষাও যে তদ্বৎ হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি। এজন্য আমরা দেখিতেছি, বৈদিক কালের সংস্কৃতও নানা পরিবৃত্তির মধ্য দিয়া পৌরাণিক কালে ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তৎপরে আবার কাব্যনাটকাদির কালে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করত প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ, যাহাকে আমরা প্রাকৃত বলি, উহা অপভ্রষ্ট সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেকের ধারণা যে, প্রাকৃত একটী স্বতন্ত্র ভাষা। প্রাচীন পণ্ডিত হেমচন্দ্র প্রাকৃতশব্দের এইরূপ অর্থ করেন,—

প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্ সংস্কৃতমূলকমিত্যর্থঃ।

বাচস্পতি মহাশয়ও উক্ত অর্থানুসারে প্রাকৃত শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—

‘প্রকৃতেঃ সংস্কৃতাৎ আগত ইত্যন্’।

অর্থাৎ, যাহা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, তাহাই প্রাকৃত। আমরা এই অর্থ অপেক্ষা—

‘প্রকৃত্যা স্বভাবেন নিবৃত্তঃ ইতি প্রাকৃতঃ’।

এইরূপ অর্থে অধিকতর সঙ্গতি দেখিতেছি, অর্থাৎ, যাহা স্বভাবত সম্পন্ন হয়, তাহাই প্রাকৃত। যে শব্দ যেরূপে উচ্চারিত হয়, সঙ্কোচাদির দ্বারা তাহাকে সহজে ও স্বল্পসময়ে উচ্চারণ করার ইচ্ছা, মনুষ্য মাত্রেরই স্বাভাবিক। এই ইচ্ছা বশতই সংস্কৃতের দুরুচ্চার্য্য ও কর্কশ শব্দগুলির সুখোচ্চারণের নিমিত্তই যেরূপ ভাষা তৎকালে ব্যবহৃত হইত, তাহাকেই এক্ষণে প্রাকৃতনামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। এরূপ হইলে প্রাকৃতকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা বিধেয় নহে; কেননা, সকল ভাষারই তথাবিধ প্রাকৃত আছে। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা ‘যাইতেছি’ স্থলে ‘যাচ্চি,’ ‘করিতেছি’ স্থলে ‘কাচ্চি’; ‘গিয়াছিলাম’ স্থলে গেছলাম,’ ‘করিলাম’ স্থলে ‘কল্লাম’ ইত্যাদি সহজে বলিয়া থাকি, তাহা বলিয়া কি উহারা স্বতন্ত্র ভাষা? ইংরাজেরাও ‘I will’ স্থলের ‘I'll;’ ‘He should not’ স্থলে ‘He sh'd n't;’ ‘you would not’ স্থলে ‘you won't’ ইত্যাদি বলেন, তাহা বলিয়া উহারা স্বতন্ত্র ভাষা হইতে পারে না। উড়ীয়ারা ‘যাউঅচি’ স্থলে ‘যাউচি’ ‘করিঅচি’ স্থলে ‘কউচি,’ ‘গেয়েথিলুঁ’ স্থলে ‘গৈথিলুঁ’; ‘কৌনসি’ স্থলে ‘কৌটি’ বলে। উর্দ্দুতেও ‘করতা হুঁ,’ ‘জাতা হুঁ,’

'দেখতা হুঁ' স্থলে 'করেঁ,' জায়েঁ,'দেখেঁ' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, এগুলি কিছু স্বতন্ত্র ভাষা নহে। প্রাকৃত ভাষাও তদ্রূপ স্বতন্ত্র ভাষা মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। উহা কেবল সাধারণ লোকের সহজে ও অল্প সময়ে উচ্চারণ করিবার জন্য একরূপ অপভ্রষ্ট সংস্কৃত মাত্র। নিম্ন প্রদর্শিত কয়েকটি উদাহরণ দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, যে, কেবল দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত শব্দের সুখোচ্চারণ ও সহজ প্রয়োগ জন্যই যেরূপ ভাষা পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত, তাহাই প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়াছে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত
জানাতু	জানাদু
আর্য্যপুত্র	অজ্জউত্ত
কিন্তু	কিন্দু
অপি	অবি
সকল	সঅল
অতএব	অদোএব
রাঘব	রাহব
চরিতং	চরিদং
এতে	এদে
উপরি	উবরি
অনুগৃহীত	অনুগহীদ
নীলোৎপল	নীলুপ্পল
মসৃণ	মসিণ
আলিখিত	আলিহিদ
বিবাহ	বিআহ
ভ্রাতরঃ	ভাদর
প্রদেশ	পদেস
কৃত	কিদ
বৎস	বচ্ছ
মাহাত্ম	মাহাপ্প
শোভসে	সোহসি
তালবৃন্ত	তালবেণ্ট
আত্মনঃ	অত্তণো
প্রবেশ	পবেস
দক্ষিণ	দক্‌খিণ
দর্শনম্	দংসণং
অশুভং	অসুহং
দুর্জ্জন	দুজ্জণ
বিপ্রযোগ	বিপ্পওঅ
প্রিয়সখী	পিঅসহী
ব্যাহরতি	ব্যাহরদি
ভগবতি	ভঅবদি
প্রভাত	পহাদ
মূর্চ্ছিত	মুচ্ছিদ
মন্দভাগিনী	মন্দভাইণী
ত্রিলোকনাথ	তেল্লোহণাহ
অধিক	অহিঅ
এবম্বিধেন	এবংবিহেণ
হৃদয়	হিঅঅ
শূন্যং	সুন্নং
সত্যং	সচ্চং
দীর্ঘায়ু	দীহাউ
প্রমুক্ত	পমুক্ক
আয়াস	আআস

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি সবিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিলে, সহজেই উপলব্ধি হইবে, যে, সুখোচ্চারণের জন্যই ঐ সকল শব্দগুলি ব্যবহৃত হইত। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের জন্য সংস্কৃতই যে প্রাকৃত হইয়াছিল, তাহার আরও একটি কারণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। সংস্কৃতের কোন্ ধাতু পরস্মৈপদী, কোন্ ধাতু আত্মনেপদী, তাহা জানিতে হইলে বিশিষ্ট জ্ঞানের আবশ্যক, তজ্জন্য প্রাকৃতে সকল ধাতুই পরস্মৈপদী। যথা—প্রেক্ষতে-পেক্‌খদি; শোভসে-সোহসি; বর্ত্তে-বত্তামি; অবগাহিষ্যে-

অবগাহিস্‌সং; অপক্রিয়ে-ওহরিজ্জামি; শম্বিয়ে-সইস্‌সং; পরিত্রায়স্ব-পরিত্তাহি। কর্ম্মবাচ্যেও আত্মনেপদ হয় না; যথা—শ্রূয়ন্তে-সুণিঅন্তি। কোথায় কোথায় লোট মধ্যম পুরুষের এক বচনে হি বিভক্তির লোপ হয়, তাহা জানাও কিঞ্চিৎ জ্ঞানসাপেক্ষ, এজন্য প্রাকৃতে প্রায়ই হি বিভক্তির লোপ হয় না; যথা—ধারেহি-ধারয়; জীআবেহি-জীবয়। সুণোহি-শৃণু; করেহি-কুরু। পসাদেহি-প্রসাদয়; কহেহি-কথয়। সংস্কৃতের বত্বণত্বজ্ঞানও সহজ নহে, এজন্য প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই দন্ত্য স এবং সর্ব্বত্রই মূর্দ্ধণ্য ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব প্রাকৃত যে প্রাকৃত লোকেরই সংস্কৃত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

এক্ষণে যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন যে, প্রাকৃত স্বতন্ত্র ভাষা না হইলে, উহার প্রত্যেক কথাই পরিবর্ত্তিত হইবে কেন, অন্ততঃ দুই চারিটী কথাও অবিকল সংস্কৃত থাকিত।

এতদুত্তরে আমরা বলি, সমস্ত সংস্কৃত শব্দই যে প্রাকৃতে বিকৃত হইয়া থাকে, তাহা নয়; অনেক শব্দ অবিকল সংস্কৃতের ন্যায় প্রযুক্ত হয়; যথা, বন্ধু-বন্ধু; গুরু-গুরু; কিং কিং; মে-মে; তব-তব; কুসলং-কুসলং (দন্ত্যসযুক্ত কুসল শব্দও সংস্কৃতে আছে) ধুরন্ধর-ধুরন্ধর; কা-কা; অহং-অহং; মম-মম। এখন যদি কেহ আবার আপত্তি করেন, যদি প্রাকৃত স্বতন্ত্র ভাষাই নহে, তবে উহার ব্যাকরণের কি আবশ্যকতা ছিল? অন্যান্য ভাষারও যাহাকে প্রাকৃত বলা গেল, তাহার জন্যত আর স্বতন্ত্র ব্যাকরণের আবশ্যক হয় নাই?

ইহার উত্তরে আমরা বলি, যে, যৎকালে সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতের প্রচলন ছিল, তৎকালে উহার ব্যাকরণ প্রণীত হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃত নাটকাদিতে প্রাকৃতের বহুল প্রয়োগ থাকায়, পাছে অধস্তন লোকেরা উহার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারে, এইজন্য সংস্কৃতের লোপ ও অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি-কালেই প্রাকৃত ব্যাকরণ বিরচিত হইয়া থাকিবে। এই প্রাকৃত স্থানভেদে ও লোক-বিশেষে বিশেষ বিশেষ নামে আখ্যাত হইত। সাহিত্যদর্পণকার শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, প্রাচ্যা, অবন্তিকা, দাক্ষিণাত্যা, শাকরী, বাহ্লীকী, দ্রাবিড়ী, আভীরী, চাণ্ডালী, শাবরী, পৈশাচী, প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ করিয়া—

'শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা
তাদৃশানাঞ্চ যোষিতাম্।
আসামেব তু গাথাসু
মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা
রাজান্তঃপুরচারিণাম্।
চেটানাং রাজপুত্রাণাং
শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং
ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা।
যোধনাগরিকাদীনাং
দাক্ষিণাত্যা হি দীব্যতাম্।

ইত্যাদি প্রকারে এক এক রকম লোকের এক একরূপ ভাষার নিয়ম করিলেও আমাদের ধারণা যে, উহারা তত্তৎ-স্থান-প্রচলিত প্রাকৃত ভেদমাত্র। তভিন্ন শাকরী, আভীরী, চাণ্ডালী, পৈশাচী এগুলি ব্যক্তিগত প্রাকৃত। কোলব্রুক Colebrooke সাহেব প্রাকৃতের দশটী বিভাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রাকৃত স্বতন্ত্র ভাষা নহে, সংস্কৃতেরই রূপান্তর মাত্র। তবে আমরা যে যে স্থলে প্রাকৃতের উল্লেখ করিব, পাঠকগণ তত্তৎ স্থলে সংস্কৃতেরই রূপান্তর বুঝিয়া লই-

বেন। প্রাকৃতের মধ্য দিয়া অনেকগুলি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। Colebrooke সাহেব বলেন, যে, সারস্বত,কান্যকুব্জ, বাঙ্গালা, মৈথিল, উৎকল, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, ও গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ভূরি ভূরি প্রাকৃত অর্থাৎ অপভ্রষ্ট সংস্কৃত শব্দ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যাদির উৎপত্তির ন্যায় ভাষায় উৎপত্তি কিছু একজন হইতে হইতে পারে না। সুতরাং, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তিও কিছু কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভাষা হইতে হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দী, (মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী ভোজপুরী, মৈথিল) ও উৎকল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি ক্রমে যেমন পরস্তন ভূতে শব্দাদি গুণের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়; অর্থাৎ আকাশের কেবল শব্দগুণ; আকাশ হইতে বায়ু, সুতরাং, বায়ুর শব্দ স্পর্শ দুইগুণ; বায়ু হইতে অগ্নি, তজ্জন্য অগ্নির শব্দস্পর্শরূপ তিন গুণ; অগ্নি হইতে জল, সেইজন্য জলের শব্দস্পর্শরূপরস এই চারি গুণ; জল হইতে পৃথিবী, এই নিমিত্ত পৃথিবীর শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই পাঁচ গুণ; তদ্রূপ উৎপত্তিক্রমে অধস্তন ভাষা সকলেও প্রাক্তন ভাষার শব্দ সকল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং, সংস্কৃতে কেবল সংস্কৃত; প্রাকৃতে সংস্কৃত, প্রাকৃত; পালিতে, সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি; হিন্দিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দী; উৎকলে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, হিন্দী, উৎকল; এবং বাঙ্গালায় সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দি, উৎকল ও বাঙ্গালা শব্দ পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে যে শব্দ যে যে ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহারা তাৎকালিক কোন না কোন বিজাতীয় ভাষার সংমিশ্রণে মিলিত হইয়াছে। সেইগুলি ভাষার উৎপত্তির সহায়তা করে নাই; বরং পুষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

সংস্কৃত কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াই প্রাকৃত হইয়াছে; আবার উহারই বিকৃতিতে পালি ভাষার উৎপত্তি। পাঠকবর্গের মধ্যে বোধ হয়, অনেকে পালি ভাষার নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। উহা বিকৃত প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাকেও স্বতন্ত্র ভাষার মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। সাহেবগণ ইহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া থাকেন * আমাদের মতে প্রাকৃত, পালী ও সংস্কৃতের বর্ণমালা এক। অপাততঃ যে টুকু বৈষম্য, প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা নানা লোকের নানাবিধ হস্তলিখিত অক্ষর প্রযুক্তই সংঘটিত হইয়াছে। সাহেবগণ কিন্তু, পালি ভাষার স্বতন্ত্র অক্ষরের কথা বলেন। আমরা বর্ণমালা বিচার স্থলে ইহার সম্পূর্ণ মীমাংসা করিব।

এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা প্রচত্তদ্রূপ ছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। ঐ সংস্কৃতই বিকৃতভাবে স্থানবিশেষে মাগধী, দ্রাবিড়ী, অবন্তিকা, দাক্ষিণাত্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। তজ্জন্য, কেহ কেহ অনুমান করেন, মাগধী প্রাকৃতই পালী; আমাদেরও তাহাই অভিপ্রেত। সিংহলদেশীয়

* মৃত মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, যে, পল্লী মধ্যে ঐ ভাষা ব্যবহৃত হইত বলিয়া, উহাকে পল্লী ভাষা বলিত; তাহা হইতেই পালি ভাষা নাম হইয়াছে। কিন্তু চাইলডারস (Childers) সাহেব তদীয় পালী ভাষার ডিক্সনারীতে লিখিয়াছেন, যে পালি শব্দের অর্থ শ্রেণী। বুদ্ধদেবের জাতক শ্রেণী উহাতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই উহার নাম পালি হইয়াছে। নাসিক নামক স্থানের গুঁহাভ্যন্তরস্থ লিপিমধ্যে উহা 'গাওবাচ' অর্থাৎ রাখালদের কথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধগণও উহাকে মাগধী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—

সা মাগধী মূলভাসা নরা চেয়াদিকপ্পিকা।
বহ্মাণো চস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥

অর্থ। সেই মাগধীই মূল ভাষা, যাহা আদি কল্পের লোকেরা ব্রহ্মার উজ্জ্বল মুখ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদেবের সময় হইতেই আমরা পালি ভাষার নাম শুনিয়া আসিতেছে। সিংহলবাসীরা বলে উহা পূর্ব্বে মৌখিক ভাষা ছিল; কালক্রমে পুস্তকাদিতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

পিতকত্তয় পালিঞ্চ তসসা অট্‌ঠকথঞ্চ তং।
মুখপাঠেন আনেস্ছং পুব্বে ভিক্‌খু মহামতি॥
হানিং দিথান সত্তানং তদা ভিক্‌খু সমাগতা।
চিরট্টিতথং ধম্মস্য পোথকেস্থু লিখাপয়ুং॥

অর্থ। পূর্ব্বকালীন মহামতি ভিক্ষুকগণ তিনটী পিতক, জাতক শ্রেণী এবং বৌদ্ধদেবের অন্যান্য আজ্ঞা মুখে মুখে পাঠ করিয়া অভ্যস্ত রাখিতেন। কিন্তু, তাহাতে উহাদের সত্তার হানি দেখিয়া এবং ধর্ম্মকে চিরকাল রাখিবার জন্য অবশেষে পুস্তকে লিখাইয়া ছিলেন।

মগধরাজ্যই পালী ভাষার জন্ম স্থান, অনেকে একথা স্বীকার করেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, পালী যে মাগধী প্রাকৃত, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সংশয় থাকে না। তবে মাগধী প্রাকৃত ও পালীতে যে টুকু বৈলক্ষণ্য প্রত্যক্ষ করা যায়, সেগুলিকে উহার প্রচলনকালীন কোনরূপ বিকৃতি সম্ভব বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এক্ষণেও বলিতেছি, যে, প্রাকৃত ও পালিতে অত্যল্পমাত্রই বিভিন্নতা আছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অর্থাৎ ৩০০ পূর্ব্বঃ খৃষ্টাব্দে পালী ভাষার ভূয়িষ্ঠ প্রচলন হইয়াছিল। চাইলডারস্ সাহেব বলেন, যে, ৬০০ শত পূঃ খ্রীষ্টাব্দেও পালি প্রচলিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। অশোক ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে পালিভাষায় বিজয়বার্ত্তা খোদিত করাইয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি সুদূর কচ্ছ প্রদেশস্থ গিরনার পর্ব্বত গাত্রেও স্বীয় বিজয় লিপি উৎকীর্ণ করিতে ছাড়েন নাই। বৌদ্ধগ্রন্থের অধিকাংশই পালিভাষায় লিখিত।

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে পারসাধিপতি দারা ও গ্রীসাধিপতি সিকন্দর (Alexander) ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষার দুই চারিটী শব্দ পালি ভাষার মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে কি না বলা যায় না। পারসী ভাষা যে সংস্কৃতের অনুকরণেই গঠিত, তাহা আমরা শীঘ্রই পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় বিশেষরূপে প্রদর্শন করিতেছি। কিন্তু পালি ভাষায় যদি কোন পারসীক শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সেইগুলি নব্য পারসীক নহে; প্রাচীন পারসীক। তজ্জন্য উহাকেও বিকৃত সংস্কৃত বলিয়া ধারণা জন্মে। সংস্কৃতেরও যেমন প্রাচীন ও নব্য দুই বিভাগ আছে; পারসী ভাষাও তদ্রূপ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন পারসীক বৈদিক সংস্কৃতের ছায়া মাত্র। ঐ প্রাচীন ভাগ এক্ষণে জেন্দ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পারসী জাতির অবেস্থা গ্রন্থ উক্ত ভাষায় লিখিত, এজন্য উহাকে জেন্দ অবেস্তা বলে। কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ মৌলভীর সহিত কথোপকথনে অবগত হইয়াছি, যে অবেস্তার ঋয়েশ, যেজো, হেস্সাম, অথুঅরন, এই চারিটী বিভাগ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব শব্দেরই নামান্তর। তাঁহারা বলেন, যে, চতুর্ব্বেদের মন্ত্রগুলিই অবিকল প্রাচীন পারসী অর্থাৎ জেন্দ বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল। তবে লিখিবার সময় অ, আ, ক, খ, গ ইত্যাদি দ্বারা লিখিত হইলেও বিজাতীয়

ব্যক্তিগত বলিয়া যে উচ্চারণ বৈষম্য ঘটিয়াছে, ঐ বৈষম্য নিবন্ধনই এখন উহারা স্বতন্ত্র শব্দ ও উহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বোধ হয়।

Sir William Jones বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সমিতির সমক্ষে পারসীক জাতির যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে বলিয়াছেন—

'The Zand consisting of Six or Seven Sanskrit words in every ten.

মাননীয় Erksine সাহেব পারসীকজাতির ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'I conclude it (Zend) to have been a dialect of Sanskrit current in some parts of India'.

আমরা যেমন সংস্কৃতকে দেবভাষা বলি, পারসীকেরাও তদ্রূপ জেন্দকে 'অসামান বাণী' বলিয়া থাকে। আমরা বৈদিক সংস্কৃত বা পালী ভাষাসম্বন্ধে এখানে আরও অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করিলাম না।

পালি ভাষার সঙ্গে দুই চারিটী পারসীক শব্দ মিশ্রিত হউক, বা নাই হউক, হিন্দী ভাষাতে ভূরি ভূরি যাবনিক শব্দ মিশ্রিত আছে। অধিক, কি, হিন্দীর বিভক্তিগুলি সমস্তই পারসীক বিভক্তিজাত। অনেকের ধারণা, যে হিন্দী একেবারে সংস্কৃত হইতে জন্মিয়াছে। আমাদের ধারণা সেরূপ নয়, কেন না, তাহা হইলে বিভক্তির আকৃতি এত পরিবর্ত্তিত হইত না। সংস্কৃতে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'অম্' স্থানে হিন্দিতে 'কো' কোথা হইতে আসিল। পঞ্চমী 'ঙস্' স্থানে, 'সে,' ষষ্ঠীর 'ঙস্' স্থানে 'কা', সপ্তমীর 'ঙি' স্থানে 'মে' হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এজন্য আমরা বলি, হিন্দি ভাষা একেবারে সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। উহার শব্দগুলি সংস্কৃতমূলক বটে, কিন্তু বচন বা কারকাদি বিভক্তির আকার সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পারস্য ভাষার অনুরূপ, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্কৃতেরই রূপান্তর বলিলেও চলে। হিন্দী ভাষার বহুবচনে 'ওঁ' হয়। পারস্য ভাষায় 'আঁ' হইয়া থাকে, উদাহরণ যথা, কারক এই শব্দের বহুবচনে হিন্দী ভাষায় কারকোং; মাস-মাসোং; রাজা-রাজাওঁ, মতি-মতিওঁ; পারস্য ভাষায় বুজুরগ-বুজুরগাঁ, জায়েল-জায়েলাং। যে সকল পারসীক শব্দ হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়, উহারা হিন্দিতে হিন্দীর বহুবচন ও পারসীতে পার্সীর বহুবচনের চিহ্ন পায়; যথা, লড়কা, হিন্দি লড়কোঁ, পার্সী লড়কাঁ; ঔরত-ঔরতোঁ-ঔরতাঁ; বাদশাহ্-বাদশাহোঁ-বাদশাহাঁ।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে পারস্য ভাষার বহু বচনের চিহ্ন আন্ (পারসীক ভাষার নুন অনেক স্থলেই চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমরা পুর্ব্বেই 'আন্' কে 'আঁ' বলিয়াছি) হইতেই প্রথম প্রথম হিন্দিতেও কোন কোন স্থলে ঐরূপ নকারান্ত বহুবচনের পদ দেখা যাইত। যথা,—

নিবল সবল কে পচ্ছ তেং
সবলন সোং অনাথত।
দেত হিমায়ত কী গধী
এরাকী কো লাত॥
ফির লাগ্যো পচ্ছতান
বুদ্ধি অপনী কোং রোয়ৌ।
নিরগুনিয়ন কে পাস
বৈঠি গুন অপনী খোয়ৌ।

এস্থলে পারসীক 'সবলান' ও 'নিরগুনিয়ান্' হইতে হিন্দীতে 'সবলন্', ও 'নিরগুনিয়ন' হইয়া অন্তস্থিত নুনের চন্দ্রবিন্দুবৎ উচ্চারণ বিধায় 'সবলঁ', নিরগুনিয়ঁ ইত্যাদি হইয়া কালক্রমে 'সবলোঁ' 'নিরগুনিওঁ' হইয়াছে।

সংখ্যা বাচকেও পূর্ব্ববৎ 'ওঁ' হইয়া থাকে; যথা—দোনোঁ, চারোঁ, পাঁচোঁ, হাজারোঁ লাখোঁ ইত্যাদি। এস্থলে ইহাও বলা যায়, যে পারসী ভাষার ঐ 'আন্,' সংস্কৃত হইতেই আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অকারান্ত শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে যেমন 'আন্'হয়, ঐ পদ্ধতি অবলম্বনেই পারস্য ভাষায় প্রথমা দ্বিতীয়াদি সকল বিভক্তিতেই 'আন্'(অাঁ) হইয়া থাকে। যথা, প্রথমার বহুবচনে বাদশাহাঁ, দ্বিতীয়ার বহুবচনে বাদশাহাঁরা ইত্যাদি। এতদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, হিন্দীর বহুবচনের চিহ্ন পারস্য ভাষা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভিন্ন ভারতীয় আর কোন ভাষাতেই কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন থাকে না। প্রাকৃত পালীতেও কর্ত্তৃকারকচিহ্ন নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালা হিন্দী উৎকল প্রভৃতি ভাষাতেও কর্ত্তৃকারকের কোন চিহ্ন থাকে না। তত্তৎস্থলে উহাদিগকে লুপ্ত বিভক্তিক পদ বলিয়া গণ্য করা যায়।

সংস্কৃত প্রাকৃত পালী প্রভৃতি ভাষাতে ক্লীবলিঙ্গ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। বোধ হয়, এই নিয়মেই প্রথম প্রথম হিন্দি ভাষায়ও দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া থাকিবে। প্রাচীন হিন্দিতে কর্ম্মকারকের বিভক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। যথা—

নিপট অবুধ সমঝৈ কহাং বুধজন বচনবিলাস।
কবহুং ভেক ন জানহি অমল কমল কী বাস॥

অর্থ—নির্ব্বোধ লোক জ্ঞানিলোকের বাক্যবিন্যাস বুঝিতে পারে না। ভেক কি কখন নির্ম্মল পদ্মের গন্ধ জানে?

সাংচ ঝুঠ নিরনয় করৈ নীতি নিপুণ জো হোয়।
রাজহংস বিনকো করৈ ছীর নীর কো দোয়॥

অর্থ—যে ব্যক্তি নীতিজ্ঞ, সেই সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিতে পারে। রাজহংস ব্যতীত দুগ্ধ ও জলকে কে বিভিন্ন করে?

দোষহিং কোং উমহৈং গহৈং
গুন ন গহৈং খললোক।
পিয়ৈ রুধির পয় ন পিয়ৈ
লগী পয়োধর জোক॥

অর্থ—খল লোক দোষই গায়, কখনও গুণ গায় না। স্তনে জোঁক লাগাইলে সে রক্তই পান করে, দুগ্ধ পান করে না।

এস্থলে বচনবিলাস, বাস, সাংচ, ঝুঠ, গুন, রুধির, পয় প্রভৃতি স্থলে কর্ম্মকারকের বিভক্তি হয় নাই। প্রাচীন হিন্দিতে, বিশেষতঃ পদ্যে কর্ম্মকারকের বিভক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। পার্সীতেও অনেক স্থলে কর্ম্মকারকের চিহ্ন থাকে না। যথা—'ছখাবত কুনদ নেকবখত এখতিয়ার'।' খতা দরগুজারো ছওআবম নমা'॥ ইত্যাদি স্থলে ছখাবত ও খতা দুই পদে কর্ম্মকারকের চিহ্ন নাই। পার্সী ভাষায় অন্যান্য স্থলে কর্ম্মকারকে 'রা' হয়। যথা 'নিগাহদার মারা জে রাহে খতা' এস্থলে মারা অর্থাৎ আমাকে।

ঐ 'রা' হইতেই হিন্দী ভাষায়ও কোন কোন স্থলে কর্ম্মকারকে 'রে' দেখা যায়। ঐ 'র' হইতেই বাঙ্গালায় কর্ম্মকারকে 'রে' হইয়াছে। যথা, 'কাংত ন বিদেস হি বহুর ভুলে'॥ এখানে 'বহুর' র অর্থ বহুকো। অর্থাৎ বধূকে॥

হিন্দি ও পার্সীতে করণ সম্প্রদানের কোন বিশিষ্টতা নাই। হিন্দির পঞ্চমীতে 'সে' কি প্রকারে আসিল, তাহা স্থির করিতে একটী সুন্দর রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পারস্য ভাষায় অপাদানে 'আজ' ব্যবহৃত হয়; ঐ 'আজ' অপাদানবোধক শব্দের পূর্ব্বে বৈসে। যথা, 'আজ তু,' ইহার অর্থ 'তুঝ সে' অর্থাৎ তোমা হইতে; 'আজ বাজিয়ে' ইহার অর্থ 'বাজী সে' অর্থাৎ খ্যাল হইতে; এক্ষণে যদি

কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সংস্কৃত বা হিন্দিতে বিভক্তি শব্দের উত্তরে প্রযুক্ত হয়, এখানে শব্দের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইল কেন; ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে ঐটীইত রহস্য!

হিন্দুমুসলমান সর্ব্ব বিষয়েই বিপরীত ভাবাপন্ন। হিন্দুরা যাহা করে, মুসলমানেরা প্রায়ই তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। তাহার কয়েকটী নিদর্শনও প্রদর্শন করা যাউক। হিন্দুরা বস্ত্রের চারিখুট একত্রিত করিয়া পরিধান করে, উহারা চারিখুট আলগা রাখে; হিন্দুরা পূর্ব্ব মুখে স্নান করে, উহারা পশ্চিম মুখে গোসল দেয়; হিন্দুর একাঘাতে বলিদান, উহাদের দশ পনর আঘাতে জবাই; হিন্দুরা কদলী ও পদ্মপত্রের ব্যস্ত ও উত্তান-দিকে অন্নাদি ভোজন করে, উহারা ঐ ঐ পত্রের উত্তান ও ব্যস্তদিকে আহার করিয়া থাকে। হিন্দুরা শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোম রাখে না, উহারা রাখে; হিন্দুরা মস্তক মুণ্ডন করিলেও মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে অত্যল্প শিখা রাখে, উহারা মস্তকের সর্ব্বত্রই কেশ রাখিলেও সেই ঊর্দ্ধ ভাগটী কামাইয়া ফেলে। হিন্দুরা দাহ করে, উহারা কবর দেয়; ইহাদের একটী ধর্ম্মপত্নী, উহাদের চারিটী ধর্ম্মপত্নী; হিন্দুর বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, উহাদের বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ; গোমাংস হিন্দুর অখাদ্য, উহাদের খাদ্য; হিন্দুর কর্ণবেধ, উহাদের ত্বক্‌চ্ছেদ; হিন্দুরা আসনে বৈসে, ভোজনপাত্র মাটীতে রাখে, উহারা মাটীতে বসে, ভোজনপাত্রের নিম্নে খানচায় বিছায়; আমরা বাম দিক হইতে দক্ষিণে পড়িয়া যাই, উহারা দক্ষিণ হইতে বামে পড়িয়া আইসে; আমাদের পুস্তকে যে দিক প্রথম, উহাদের কেতাবে সেইখানে খতম। আমরা বলি মন দিয়া শুন, উহারা বলে, 'জেরা কাণ ধর করু শুনো'; সর্ব্ববিষয়ে এবম্বিধ বৈপরীত্য নিবন্ধনই উহাদের গ্রন্থাদিতেও বৈপরীত্য ঘটিয়াছে; তজ্জন্যই উহাদের অপাদান চিহ্ন তদ্বোধক শব্দের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। শুদ্ধ অপাদান নহে; ষষ্ঠী সপ্তমীও ঐরূপ পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পারস্য ভাষায় উক্ত অপাদান-বোধক 'আজ' কোন কোন স্থলে আলেক রহিত হইয়া কেবল 'জ' ব্যবহৃত হয়; ঐ 'জ' জে হইতে জাত বলিয়া, উহাকে 'জে' উচ্চারণ করিতে হয়, ঐ 'জে' হইতেই হিন্দিতে 'সে' হইয়াছে। যথা 'জে রাহে,' ইহার অর্থ রাহাসে অর্থাৎ রাহা হইতে। 'জে বেদাদ,' ইহার অর্থ বেদাদ সে অর্থাৎ জুলুম হইতে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে হিন্দিতে কোন কোন স্থলে অপাদানার্থে 'তে' হয়; উক্ত 'তে' সংস্কৃত পঞ্চম্যাস্তসিল্ হইতে গৃহীত; যথা, গ্রামতঃ=গ্রামাৎ; ইহারই হিন্দী গ্রামতে; গৃহতঃ, হিন্দি গৃহতে; উদাহরণ যথা—

হোয় ভলে কো সুত বুরো
ভলো বুরে কো হোয়।
দীপক সোং কাজল প্রগট
কমল কীচতেং জোয়॥

অর্থ—সতের অসৎ পুত্র, কিম্বা অসতের সংপুত্র হইতে পারে। প্রদীপ হইতে কজ্জল উৎপন্ন হয়, এবং কর্দ্দম হইতে পদ্ম জন্মে।

নৃপ প্রতাপতেং দেসমেং
রহৈ দুষ্ট নহি কোয়।
প্রগটৈ তেজ দিনেস কো
তহাং তিমির নহি হোয়॥

অর্থ—রাজার প্রতাপে দেশমধ্যে কেহ দুষ্ট থাকিতে পারে না, সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিলে তথায় অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না। এস্থলে 'কীচ তেঁ' ও 'প্রতাপতেং' উভয়ত্র অপাদানে 'তে' হইয়াছে, ঐ 'তে' হইতেও কালক্রমে 'সে' হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ।

শুদ্ধ এই প্রাচীন প্রয়োগের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এবম্ভূত প্রয়োগের বর্ত্তমান কালেও সমধিক প্রচলন দেখা যায়। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই অদ্যাপিও অপাদানার্থে 'সে' অপেক্ষা 'তে'ই অধিকতর ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাতিয়ালার মহারাজার অন্যতম সভাপণ্ডিত মদীয় অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দিগ্বিজয়ী মহাশয় ত'তে' ভিন্ন ভ্রমেও কখন 'সে' ব্যবহার করেন না। তাঁহার মত, 'তে'র অপভ্রংশেই 'সে' হইয়াছে। যথাসাধ্য অপভ্রষ্ট শব্দের ব্যবহার পরিহার করাই কর্ত্তব্য। ঈদৃশ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথায় আস্থাবান্ হইতে হইলে অবশ্যই 'তে' হইতেই 'সে' হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ, এ যুক্তিও কিছু অপ্রামাণিক নহে। যাহা হউক, 'আজ' হইতে 'জে' তৎপরে 'সে', অথবা 'তঃ' হইতে 'তে' তৎপরে 'সে', উভয়ই তুল্যসত্ত্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে, পাঠকবর্গ যদি পারস্যভাষার ঐ আপাদানীয় 'আজ' কোথা হইতে আসিল, একথা জিজ্ঞাসা করেন, তজ্জন্য তাহার উত্তরও এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি। সংস্কৃতের পঞ্চমীর বিভক্তি 'ঙস্'। 'ঙসে'র 'ঙ' ইৎ, থাকে 'অস্'। ঐ 'অস্'ই পারস্য ভাষায় আলেফ দ্বারা লিখিত হওয়ায় 'আস্' হইয়া কালক্রমে 'আজ' হইয়াছে। সুতরাং, উহারও মূল সংস্কৃত মধ্যে জানিয়া রাখিবেন। পৃথিবীতেত সংস্কৃতই আদিম ভাষা। যাবতীয় ভাষার মূলেই যে সংস্কৃত আছে, তাহা আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি।

পারসীক ভাষা অতি প্রাচীন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন এবং নব্য। প্রাচীন পারসিক ভাষা এক্ষণে জেন্দ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। উহা বৈদিক ও নব্য সংস্কৃত হইতে সমুৎপন্ন। নব্য পারসীক সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে সংগঠিত। বোধ হয়, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নব্য পারসীক ভাষার জন্ম হইয়া থাকিবে। তৎকালে উহা পারসীক নামে আখ্যাত হইত কি না বলিতে পারি না। উক্ত ভাষার তাৎকালিক কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তজ্জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তৎকালে উহা কেবল মৌখিক ভাষাই ছিল। গ্রন্থাদি হওয়া দূরে থাকুক, লিপিকার্য্যের নিমিত্ত পারস্যভাষার বর্ণমালাও তৎকালে প্রচলিত হয় নাই। কারণ পারসীর আলেফ, বে, পে, তে, ছে, আরবীর আলেফ, বে, তে, ছে হইতে সংগৃহীত, এবং আরবীর আলেফ, বে, তে, ছে, ইরাণী বা হিব্রু ভাষার আলেফ, বেত, ভেত, গিমেল, ড্যালেথ হইতে সমানীত, তাহা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। হিব্রুর বর্ণমালা হইতে আরবীর বর্ণমালা সমুৎপন্ন হইলে, তাহাতেই দুই চারিটী অধিক বর্ণ সংযুক্ত করিয়া * পারসীর

* পারসিক ভাষায় پ (পে), چ (চে), ও ژ (জে), এই তিনটি বর্ণ অধিক আছে। আরবিক ভাষায় নাই। পারসী সংস্কৃতজাত বলিয়া তত্তদুচ্চারণ বিশিষ্ট বহুল শব্দের সমাবেশ প্রযুক্ত উহাতে ঐ তিনটি বর্ণের অবতারণা ঘটিয়াছিল। হিব্রু ভাষায় פ (পে) আছে। কিন্তু উহা হইতে আরবীতে না আসার কারণ কিছু বুঝা যায় না। চে বা জে এইরূপ উচ্চারণের বর্ণ হিব্রুতেও নাই। সুতরাং আরবীতেও আইসে নাই। হিব্রুর আলেফ, বেত, ভেথ, গিমেল হইতে গ্রীক ভাষার আলফা, বিটা, গম্মা, ডেল্টা গৃহীত, কি গ্রীক হইতে হিব্রু গৃহীত, তাহার এখনও স্থির নিশ্চয় হয় নাই; তবে অনেকের অনুমান যে হিব্রুই প্রাচীন।

বর্ণমালা হইল। তদবধি উক্ত ভাষা ঐ বর্ণমালায় লিখিত হইয়া স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। কিন্তু এই সময় কখন, তাহার নিশ্চয় করাই সুকঠিন। অনেকে আরবিক ভাষার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দীর অধিক স্বীকার করেন না। আবার, কেহ কেহ বলেন, উহার বয়ঃক্রমও পারসীর ন্যায় দুই সহস্র বৎসর হইতে পারে। তবে মহম্মদের সময় হইতেই উহার বহুল প্রচার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে সুসৌষ্ঠব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা একথা স্বীকার করিলেও করিতে পারি, তবে আপত্তি এই যে, আরবী ভাষা সকদি,সকজি, ফারসী, পহেলভী. জাবলী, দরি, আরবী ও তকি প্রভৃতি আটটি ভাষার সংমিশ্রণে সংগঠিত, ইহা সুবিজ্ঞ মৌলভীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই কথার উপর নির্ভর করিলে ঐ সকল ভাষার বয়ঃক্রম আরও অধিক, এমন কি আড়াই হাজার বৎসরও হইতে পারে। ঐ সকল ভাষা অত পুরাতন নহে; আমরা কোন ক্রমেই আরবীকেও তত পুরাতন বলিতে সাহস করি না। পনর কি ষোল শত বৎসর হইলেই যথেষ্ট। ইহার দুই চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পারসিক জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল লোকের মুখে মুখেই থাকিত; না হয় ত জেন্দ বর্ণমালায় সুশোভিত হইয়া গ্রন্থাদিতে বিরাজ করিত, ইহাই আমাদের ধারণা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত হইতে পারসিক ভাষার উৎপত্তি। আমাদের এতাদৃশ বাক্যে হয় ত অনেকে বিস্মিত হইয়া বলিবেন, যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তবে পারসীতে সংস্কৃতেতর উচ্চারণ কোথা হইতে আসিল? خ খে, ض জাদ, ذ জাল, ع আয়েন, غ গায়েন, ق কাফ, ইত্যাদির উচ্চারণ ত সংস্কৃত ভাষায় নাই। এতৎ-প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যে, যদিও তদ্রূপ উচ্চারণ সংস্কৃত মধ্যে নাই সত্য, কিন্তু আরবী বর্ণমালায় উক্তরূপ উচ্চারণ বিশিষ্ট কোন কোন বর্ণ থাকায়, সংস্কৃত শব্দগুলি সেই সেই বর্ণে লিখিত হইয়া কালক্রমে সেই আরবীয় বর্ণেরই উচ্চারণ পাইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটী শব্দ প্রদর্শন করা গেল, তদ্দর্শনে আমাদের বাক্য কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। পারসিক জাদ (Zad) শব্দ সংস্কৃত জাত হইতে গৃহীত*। সংস্কৃত বর্গীয় জকার ও পারসিক জিম উভয়ের উচ্চারণ একরূপ। এক্ষণে উক্ত জাদ শব্দটী ج জিম দ্বারা লিখিত হইলেই সংস্কৃতের ন্যায় উচ্চারণ হইত বটে, কিন্তু, তাহাতে ض (জাদ), ذ(জাল), ظ (জো) প্রভৃতি বর্ণের কোন স্বার্থকতা থাকে না; এজন্য কতকগুলি বর্গীয় জকারাদি সংস্কৃত শব্দও পারসীতে ض (জাদ) প্রভৃতি দ্বারা লিখিত হইয়া, কালক্রমে তত্তৎ বর্ণেরই উচ্চারণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাকৃতপ্রকাশাদি গ্রন্থে 'ক্রী' ধাতুর 'খরিদন' আদেশ দেখা যায়। ঐ 'খরিদন' পারসীতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক খরিদনের উচ্চারণ পারসীর ک (কাফ) ও ه (হের) ন্যায়। কিন্তু এইস্থলেও উক্ত দুই বর্ণ দ্বারা লিখিত না হইয়া পূর্ব্ব-কারণ-বশতই خ (খের) দ্বারা লিখিত হইয়াছে। পারসীতে সংস্কৃতেতর উচ্চারণ হইবার এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই।

আমরা, ইতিপূর্ব্বেই পারসিক বিভক্তিগুলি

---

* সংস্কৃত 'জাত' হইতে প্রাকৃত 'জাদ'। উক্ত 'জাদ' পারসীতে কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তিত না হইয়া অবিকল ব্যবহৃত হয়। অতএব, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে পারসিক ভাষার উৎপত্তি, এই 'জাদ' শব্দটীও তাহার অন্যতম উদাহরণ।

সংস্কৃত বিভক্তি জাত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি। এক্ষণে নিম্নে কতকগুলি শব্দ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন, উহারা কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত			পারসী
যুবন	...	...	জুআন
নর	...	...	নর
ঘর্ম্ম	...	...	গরম
অশ্ব	...	...	অস্প
আপ	...	...	আব
নাম	...	...	নাম
পাদ	...	...	পদ
শুষ্ক	...	...	খুষ্ক
জাত	...	...	জাদ
বাত	...	...	বাদ
বাহু	...	...	বাজু
নৌ	...	...	নাও
এক	...	...	এক
দ্বি	...	...	দো
পঞ্চ	...	...	পঞ্জ
ষষ্	...	...	ষষ্
সপ্ত	...	...	হপ্ত
দূর	...	...	দুর
অষ্ট	...	...	হষ্ট
দশন্	...	...	দহ
বিংশৎ	...	..	বিসট্
জার	...	..	য়ার
দ্বব	..	...	ডব
পক্বান্ন	...	..	পাক্বান
বিদায়	...	...	ওদা
শকুন	...	...	শকুন
শোক	...	...	সোগ
হার	...	...	হার

সংস্কৃত			পারসী
ত্রাস	...	...	তরস্

এইবার আমরা পারস্যভাষার কতকগুলি ধাতু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে উহাদের কতদূর ঘনিষ্ঠতা তাহা পার্শ্বস্থ সংস্কৃত ধাতু দর্শন করিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে।

পারসী			সংস্কৃত
স্তাদন	...	...	স্থান
পুকতন	...	...	পচন
মরদন	...	...	মর্দ্দন
দাদন	...	...	দান
চরিদন	...	...	চরণ
দবিদন	...	....	দবন
দরিদন	...	...	দরণ
শনুদন	...	...	শ্রবণ
গ্রফতন	...	...	গ্রহণ
ভুদন	...	...	ভবন
করদন	...	...	করণ
কুদিদন	...	...	কুর্দ্দন
ঘসিদন	...	...	ঘর্ষণ
পুরছিদন	...	...	প্রচ্ছন
তপিদন	...	...	তপন
রুহিদন	...	...	রোহণ
খরিদন	...	...	*
খনিদন	...	...	খনন
কসিদন	...	...	কর্ষণ
য়াপতন	...	...	আপন
বরশতন	...	..	বর্ত্তণ
পারিদন	..	...	পারণ
পরস্তিদন	...	...	পরার্চ্চন
তরসিদন	...	...	ত্রসন
গ্রথিদন	...	...	গ্রন্থন
চেত্তিদন	...	...	চেতন

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ধাতু আছে, যাহার সংস্কৃত বা প্রাকৃতের সহিত ঐক্য হয়, বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকলের নির্দ্দেশে নিরস্ত হইলাম; এক্ষণে প্রত্যয় বা সমাসাদিতেও ইহার সহিত সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কত দূর নৈকট্য আছে, তাহাও প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১। সংস্কৃত অস্ত্যর্থক মৎ প্রাকৃতে মন্ত হয়; উহা হইতে পারসীতে মন্দ হইয়াছে। যথা, আকলমন্দ,দৌলতমন্দ,হোশমন্দ,ইত্যাদি।

২। সংস্কৃত ঈয় প্রত্যয় পারসীতে ঈ হইয়া থাকে। যথা, দেশীয়=দেশী, বেলাতীয়=বেলাতী, বনারসীয়=বনারসী, দানাপুরীয়=দানাপুরী।

৩। সংস্কৃত বৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে 'বৎ' স্থানে 'বান্' হয়। পারসীতে ঐ 'বান্' দ্বারা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা—কোচবান্, দরবান্, গাড়ীবান্ ইত্যাদি।

৪। সংস্কৃত সূত্র রজ আদেবলঃ।

অর্থাৎ, রজস্ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর বল প্রত্যয় হয়। ঐ 'বল' পারসীতে 'বালা' হইয়া থাকে। যথা, কেতববালা, মলাইবালা ইত্যাদি। ইহার প্রয়োগ আজ কাল উর্দ্দুতেই বেশী বেশী দেখা যায়।

৫। সংস্কৃতে কর্ত্তৃবাচ্যে কৃ ধাতুর উত্তর ষণ্ করিয়া 'কার' নিষ্পন্ন হয়। যথা, কুম্ভকার। উক্ত 'কার' ঠিক ঐ অর্থে পারসীতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, পেশকার, বদকার, পায়কার। ঐ 'কার'ই আবার স্থানবিশেষে 'গার' বা 'গর' হয়। যথা, খেদমতগার, গোনহগার, কারিগর ইত্যাদি।

৬। সংস্কৃত ন ও বি পারসীতে না ও বে হয়। যথা, না-তমাম, না-রাজ, না-দোরস্ত, বে-হদ,বে-আন্দাজ,বে-হোশ। ঐ 'না' কোথাও কোথাও 'লা' হয়। যথা, লা-চার; লা-জবাব, লা-পরোআ।

এইবার সমাসপ্রকরণের বিষয় উল্লেখ করা যাউক।

১। সংস্কৃতে যেরূপে দ্বন্দ্বসমাস হইয়া থাকে, পারসীতেও ঠিক তদ্রূপে হয়; যথা,রাত-দেন; সোবেহ-শাম; খায়ের-খয়রাত; আশক-মাশুক ইত্যাদি।

২। কর্ম্মধারয় সমাসও ঠিক সংস্কৃতবৎ; যথা,খোশ-খত; সোফেদ-গাও; শেকেস্ত-হাল; বদ-নসীব ইত্যাদি।

৩। বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ সংস্কৃতে বিশেষণ; পারসীতেও তাহাই। যথা, হুর-শকল; গুল-বদন; খর-গোস; নেক-বখত ইত্যাদি।

৪। সংস্কৃতের ন্যায় পারসীতেও তৎপুরুষ সমাসের দ্বিতীয়া-তৃতীয়াদি বিভাগ আছে; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ না করিয়া আমরা কেবলমাত্র কয়েকটী তৎপুরুষের উদাহরণ দিতেছি। যথা, খোদা-পরস্ত, দুর-বীন, নেশা-খোর; জর-বফত; হারাম-জাদ, শাহ-জহান; গাও-খানা; খানা-জাদ ইত্যাদি।

৫। সংস্কৃতের বীপ্সার্থক অব্যয়ীভাবও পারসীতে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়; যথা, দস্ত-ব-দস্ত, কেসত-ব-কেসত, তরহ-ব-তরহ; রঙ্গ-ব-রঙ্গ ইত্যাদি।

পারসী কায়দা বিষয়ে আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। সম্প্রতি অনুরূপ দুই চারিটী সমতা প্রদর্শন করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব। পারসী ভাষার নিম্নলিখিত ব্যাক্যাংশের সহিত সংস্কৃতের সমতা প্রদর্শিত হইতেছে।

পারসী	সংস্কৃত	উর্দ্দু অর্থ
অজিজত	অজিজ-তে	অজিজ্ তেরা
নগশৎ	নাগচ্ছৎ	ন গিয়া

পারসী	সংস্কৃত	উর্দ্দূ অর্থ
মকুন	মা কুন (প্রা)	ন কর
মবাশ	মা ভূস,	মাত হো
আয়মন	অয়ি মনঃ	রে মন
কুনদ	কুণদ (প্রা)	করে
নিস্ত	নাস্তি	নাহি
অস্ত	অস্তি	হৈ
নামশ	নাম-অস্য	নাম উসকা
রোজগারশ	রোজগারোস্য	রোজগার উসকা
আয় বছর	অয়ি বচ্ছর (প্রা)	অয় লড়কা
নয়াইদ	নায়াতি	ন আতা
করদ	(অ)করোৎ	কিয়া
য়াবদ	আপৎ	পাবে

সংস্কৃত হইতে যে পারসিক ভাষার উৎপত্তি তাহাত এক রকমে প্রতিপন্ন হইল। পারসিক বিভক্তি হইতে হিন্দির বিভক্তি গৃহীত,তাহারও কয়েকটী প্রদর্শন করা গিয়াছে; এক্ষণে অবশিষ্ট গুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

হিন্দিতে ষষ্ঠীর 'কে' পারসিক 'এ' হইতে হইয়াছে। সম্বন্ধ অর্থ বুঝাইলে পারস্য ভাষায় তদ্বোধক শব্দের পূর্ব্বে 'এ' বৈসে। উহা কোন অক্ষর দ্বারা লিখিত নয়; একটী চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত; উহাকে এজাফত বলে। যথা, 'কমন্দে হবা' ইহার অর্থ, হাওয়া কা ফাঁদ। 'রাহে খতা' ইহার অর্থ,খতা কে রাহ; 'বাজিয়ে রোজগার,' ইহার অর্থ, রোজগার কা বাজী।

এই 'এ' কেবল চিহ্নমাত্র বলিয়া অনেক সময় পাঠাদিতে ব্যতিক্রম ঘটিত,এজন্য প্রথমে হিন্দিতে উহার সহিত বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'ক' যোজনা করিয়া 'কে' হইল। যেমন, আপ কে লিয়ে। তদবধি উহা হিন্দির সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং উহার 'কা' 'কী' ভেদও উহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রমশঃ উহা হইতেই নানা ভাষার নানারূপ সম্বন্ধ-চিহ্ন হইয়াছে, তাহা আমরা উত্তরে প্রকাশিত করিব।

পারসিক ভাষার এই 'এ' প্রাকৃত ভাষার ষষ্ঠীস্থানীয় 'এ' হইতে গৃহীত। যথা, অজ্জাএ সন্দাএ; দেবদাএ; গিহীদাএ ইত্যাদি। অতএব হিন্দির সম্বন্ধার্থক 'কে'র মূল প্রাকৃত বা পারসিক যে কোন ভাষাকে বলা যাইতে পারে।

পারস্য ভাষার সপ্তমীতে কোন কোন স্থানে 'দর' ও কোন কোন স্থানে 'বর' এবং কোথাও বা 'পর' হয়। যথা, 'বর উমর' ইহার অর্থ, উমর পর; 'দর জহান' ইহার অর্থ,জহান মে; 'দর করম' ইহার অর্থ,করম মে: 'পরতো' ইহার অর্থ, তুপর। উক্ত 'দর' ও 'বর' হইতেই হিন্দির 'পর' বলিলেও বলা যায়। তদ্ব্যতীত 'পর'ও ত পারস্য ভাষায় আছে। উহাই হিন্দিতে সাক্ষাৎরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার, হিন্দিতে কোন কোন স্থানে সপ্তমী স্থলে 'মে' হইয়া থাকে। উক্ত 'মে'ও পারস্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। 'দর' ও 'বর' ভিন্ন পারস্য ভাষায় সপ্তমীতে কোন কোন স্থানে 'ব' হয়; যথা, 'ব নামে' ইহার অর্থ, নাম মে; 'ব দরগা' ইহার অর্থ দরগা মে; 'ব খাক' ইহার অর্থ খাক মে। উক্ত 'ব' 'বে' হইতে জাত বলিয়া ঐ 'বে' হইতেই 'মে' হইয়াছে। অথবা, প্রাকৃত সূত্র 'ঙের্ম্মি' দ্বারা প্রাকৃতে সপ্তমী স্থানে 'মি' হয়; উহা হইতেও হিন্দির 'মে' হইতে পারে। এবম্মাদিক বহুবিধ কারণ দৃষ্টে জানা যায়, যে, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পারসিক ভাষা মিলিয়া হিন্দি ভাষা হইয়াছে।

আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে অধস্তন ভাষায় প্রাক্তন ভাষার শব্দাদির নানারূপ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন ক্রমেই এই নিয়মের অন্যথা হইবার জো নাই। এই অপার-

হার্য্য নিয়মানুরোধেই পারসী ভাষায় সংস্কৃত, প্রাকৃত, ও হিন্দিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পারসী তিনেরই বহুতর লক্ষণ সমাবেশ পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব, হিন্দী উক্ত ভাষা ত্রয়জাত বটে, তাহাতে সংশয় নাই।

প্রথম প্রথম হিন্দি ভাষায় দুই চারিটী সংস্কৃতধাতুঘটিত সংস্কৃত পদও দৃষ্টিগোচর হইত, কিন্তু কালক্রমে সেগুলি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা, কবি তুলসীদাসকৃত রামায়ণে দেখিতে পাই।

সহিত বিদেহ বিলোকহি রাণী।
সিন্ধু সম প্রীতি ন জাতি বখানি॥
রামহিং চিতব ভাব জেহি সীয়া।
সো সনেহ সুখ নহি কথনীয়া॥
উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ।
কবন প্রকার কহৈ কবি কোউ॥

ইত্যাদি স্থলে জাতি (যাতি), কথনীয়া, অনুভবতি সংস্কৃতধাতুঘটিত সংস্কৃত পদ। হিন্দিতে,উপমাবাচক সংস্কৃত ইব শব্দও কোথাও কোথাও দেখা যায়; যথা,

'কংদুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাউং'॥ সকোং মেরু মূলক ইব তোরী॥ ইত্যাদি। আবার,

জীতহু সমর সহিত দ্বৌ 'ভাই'॥ 'পদ সরোজ মেলে দ্বৌ ভাউ'॥ ইত্যাদি স্থলে দুটি 'দ্বৌ' পদ অবিকল সংস্কৃত।

'তু ছল বিনয় করসি কর জোরে'।

এ স্থলে 'করসি'কে সংস্কৃত 'করোষি' বলিলেও চলে। এগুলি হিন্দির সংস্কৃত জাতত্বের পরিচয়স্থানীয়।

প্রাচীন হিন্দিতে কেবলমাত্র পারসিক বিভক্তিগুলি যাইত, উহার শব্দগুলি অধিকাংশই সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাকৃত। কিন্তু নব্য হিন্দিতে ভুরি ভুরি পারসী ও আরবী শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আজকালকার হিন্দিতে আবার বহুসংখ্যক ইংরাজি শব্দও প্রবেশ লাভ করিতেছে। প্রাচীন হিন্দি গ্রন্থের মধ্যে তুলসীকৃত রামায়ণ, লল্লুজী-প্রণীত প্রেমসাগর, ব্রজবাসীদাস রচিত ব্রজবিলাস, প্রিয়দাস বিরচিত ভক্তমাল, বেতাল পঞ্চবিংশতি,তুলসী সতসই প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা বিভক্তি শূন্য সংস্কৃত বলিলেও চলে। আমরা প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

তুলসী কৃত রামায়ণ—

দেব দনুজ ভূপতি ভট নানা।
সমবল অধিক হউ বলবানা॥
জয় রঘুবংশ বনজবন ভানু।
গহন দনুজকুল দহন কৃসানু॥
জয় সুর বিপ্র ধেনু হিতকারী।
জয় মদমোহ কোহ ভ্রমহারী॥

* * *

অতি গহগহে বাজনে বাজে!
সবহি মনোহর মঙ্গল সাজে॥
যূথ যূথ মিল সুমুখি সুনয়নী।
করহি গান কলকোকিল বয়নী॥
সুখ বিদেহ কর বরনি ন জাই।
জন্ম দরিদ্র মনহুং নিধি পাই॥

* * * *

সরদ চংদ নিংদক মুখনীকে।
নীরজ নয়ন ভাবতে জীকে॥
চিতবন চারু মার মদ হরনী।
ভাবতি হৃদয় জায় নহিং বরনী॥
কল কপোল শ্রুতি কুণ্ডল লোলা।
চিবুক অধর সুন্দর মৃদুবোলী॥
কুমুদ বন্ধুকর নিন্দক হাসা।
ভ্রুকুটী বিকট মনোহর নাসা॥

প্রেমসাগর—

ইতনী কথা কহ শ্রীশুকদেবজী বোলে, কি মহারাজ! জিতনে রথ হাথী, ঘোড়ে ঔ রাক্ষস উস খেত মে রহে থে, তিহ্নে পবন নে তো সমেদ ইকট্টা কিয়া, ঔর অগ্নিনে পলভর মে সবকো জলায় ভস্ম কর দিয়া; পাংচ তত্ত্ব পাংচ তত্ত্ব মে মিল গয়ে; উহ্নেং আতে তো সবনে দেখা. পর জাতে কিসীনে ন দেখা কি কিধর গয়ে; ঐসে অসুরোং কো মার, ভূমি কা ভার উতার, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ভক্তহিতকারী, উগ্রসেন কে পাস আয় দংডবত কর হাথ জোড় বোলে কি মহারাজ! আপকে পূর্ণ প্রতাপ সে অসুরদল মার ভগায়া, অব নির্ভয় রাজ কীজে, ঔ প্রজা কে সুখ দীজে। ইতনা বচন ইনকে মুখ সে নিকলতে হি রাজা উগ্রসেন নে অতি আনন্দ মান রাজ করনে লগে। ইস মে কিতনে একদিন পীছে ফির জরাসন্ধ উতনী হি সেনা লে চঢ়ি আয়া; ঔ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব জীনে পুনি ত্যোং হি মার ভগায়া। ঐসে তেইস তেইস অক্ষৌহিণী লে জরাসংধ সত্রহ বার বের চঢ়ি আয়া; ঔ প্রভু নে মার মার হটায়া॥

ব্রজবিলাস—

বিঘনবিনাশন শুভকরন হরনতাপত্রয়শূল।
চরিত ললিত নন্দনন্দনকে সকল সুখনকে মূল॥
সম্বত শুভ পুরাণ শত জানৌ।
তাপর ঔরন নক্ষত্র আনৌ॥
মাঘ সুমাস পক্ষ উজিআরা।
তিথি পঞ্চমী সুভগ শশীবারা॥
শ্রীবসন্ত উৎসব দিন জানী।
সকল বিশ্বমন আনন্দদানী॥
মন মে করি আনন্দ হুলাসা।
ব্রজবিলাস কো করৌ প্রকাশা॥

ভক্তমাল—

শ্রীরামানুজ উদ্ধার সুধানিধি অবনি কল্পতরু।
বিষ্ণুস্বামী রোহিত সিন্ধু সংসার পার করু॥
মধ্বাচারজ মেঘ ভক্তি শস্য সর ভরিয়া।
নিম্বাদিত্য আদিত্য কুহর অজ্ঞান জুহরিয়া॥

* * *

ভক্তিভক্ত ভগবংত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদরজ বংদন করত নাসৈ বিঘ্ন অনেক॥

বেতালপঞ্চবিংশতি—

মহারাজ! ধর্ম্ম কী বিচার শুনিয়ে; জো জো কোই কিসীকা জী লেতা বহ ঔর জন্ম মে উসকা ভী জী লেতা হৈ; ইস পাপ সে সংসার মে অনেক মনুষ্য জন্ম লেতা হৈ, ঔর মরতা হৈ; ইসসে জগত মে জন্ম পাকে ধর্ম্ম বটোরনা মনুষ্যকো উচিত হৈ; দেখিয়ে কাম ক্রোধ লোভ মোহ বশ হো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব কিসু ন কিসু তৌর সে সংসার মে অবতার লে লে আতা হৈ। কিন্তু উনসে গায় আচ্ছি হৈ, জো রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ সে রহিত হৈ।

বেতালপঞ্চবিংশতির রচনার অন্যান্য স্থলে অনেক পারসী শব্দও মিশ্রিত আছে।

তুলসী সতসই—

নমো নমো শ্রীরাম প্রভু পরমাতম পরধাম।
জেহি সুমিরত সিধি হোতহৈ তুলসী জনমকাম॥
রাম বামদিশি জানকী লক্ষ্মণ দাহিজে ঔর।
ধ্যান সকল মঙ্গল করন সুরতরু তুলসী তৌর॥
পরম পুরুষ পরধাম পর জাপর ন আন।
তুলসী জো সমুঝত সুনত রাম সোই নির্ব্বান।
সকল সুখদ গুন জাসু সো রামকামনাহীন॥
সকল কামপ্রদ সর্ব্বহিত তুলসী কহহি প্রবীন।
জাকে রোম রোমপ্রতি অমিত অমিত ব্রহ্মাণ্ড।
সো দেখত তুলসী প্রগট অমল সু অচল প্রচণ্ড॥

জগত জননী শ্রীজানকী জনক রাম শুভরূপ।
আসুকৃপা অতি অঘহরন করন বিবেক অনূপ॥
* * *
আদিচন্দ্র চঞ্চল সহিত ভজু তুলসী ত্যজি কাম।
অঘগঞ্জন রঞ্জন সুজন ভবভঞ্জন সুখ ধাম॥

হিন্দি ও সংস্কৃতের সম্বন্ধ একরূপ দেখান গেল। এইবার আমরা প্রাকৃত ও হিন্দির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিব। প্রাকৃতে একমাত্র দন্ত্যসকার ব্যবহৃত হয়, হিন্দিতেও কেবল দন্ত্যসকার প্রচলিত। তবে আজ কাল, কেহ কেহ শকারাদির যথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তুলসীদাসপ্রমুখ প্রাচীন কবিগণ সর্ব্বত্রই দন্ত্যসকার প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কতিপয়গ্রন্থের কতিপয় পঙ্ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জিনকে জস প্রতাপকে আগে।
সসী মলিন রবি সীতল লাগে॥
কুংজরমনি কণ্ঠা কলিত উর তুলসী কী মাল।
বৃষভকংধ কে হরি ঠবনি বলনিধি বাহু বিসাল॥
* * * * *
শুন সাগর নাগর বর বীরা।
সুংদর স্যামল গৌর সরীরা॥
* * * *
যহ সুনি অপর ভূপ মুসুকানে।
ধর্ম্মসীল হরি ভক্ত সয়ানে।
* * * *
রাবন বান মহাভট ভারে।
দেখি সরাসন গবহি সিধারে॥
* * * *
বিশ্বামিত্র সময় সুভ জানী।
বোলে অতি সনেহ মৃদু বাণী॥
রামায়ণ, বালকাণ্ড।

প্রেমসাগরপ্রণেতা লুল্লূজী কবি কোথাও কোথাও তালব্য শকার স্থানে দন্ত্য সকার লিখিয়াছেন; আবার কোথাও বা তালব্য শকারই রাখিয়াছেন। যথা, 'ইতনী বাত সুনতেহি সুরসেন জীনে পুরোহিত বুলায়'। 'অতি আনন্দ রহে জগদীস'। 'নিরখি হরখি সব দেহিং অসীস।' ইত্যাদি স্থলে শকার বিচার করেন নাই; আবার, শুভ, দেশ, বিদেশ, শোভা ইত্যাদি স্থলে শকার বিচার করিয়াছেন।

অন্যান্য গ্রন্থেরও শকার বিচার নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

পানীমে নিসদিন রহে জাকে হাড় ন মাস।
কাম করৈ তলবার কো ফির পানীমে বাস॥
স্যামবরণ পর হরি নহীং জটা ধরে নহীং ঈস।
না জানুং পিয়া কৌন হৈ পংক লগাএ সীস॥
সভাবিলাস।

লগত সুগত সীতল কিরণ
নিস দিন সুখ অংগাহি।
মাংহ সসী ভ্রম সুরত্যোং
রহত চকোর চাহি॥
কো কহি সকৈ বড়েন সোং
বড়ে বংস কী খানি।
ভলো ভলো সবহী কহৈ
ধুআং অগর কো জানি॥
সিরস কুসুম মড়রাত
অলি ঝুপি ঝপট লপটাত।
দরসত অতি সুকুমারতা
পরসত মন ন পত্যাত॥
বিহারী কী সত সই।
সুখ দুখ এক সমান হৈ
হরখ সোক নাহি ব্যাপ।
পর উপকার নিহকামতা
উপজে ছোহ ন তাপ॥
ঐসী বানী বোলিয়ে
মন কা আপা খোয়।
ঔরন কো সীতল করে
আপো সীতল হোয়॥
কবীর কী সাখী

রবিসসী যাদব বংস
ককুস্থ পরমার সদাবর্ত।
চাহুবান চালুক্য ছংদক
সীলার আভীয়র॥
বান্যপালক নিকুংভবর
রাজপাল কবনীস।
কানচুরকৈ আদি দে
বরনে বংস ছতীস॥

রাজপুত বংস বর্ণন।

কাত্তিক সরদ চংদ উজিয়ারা।
জগ সীতল মোহি বিরহিন্ জারা॥
পরবত মেধ দিনেস সসী।
সহি ন সকহিঁ বহ অগি॥

পদমাবত।

সুকর স্বান কে জন্ম ধরঈ।
জো গুরুকেরী নিন্দা করঈ॥

কবীর রেখতা।

সুর প্রভু অংগ অংগ ছবি
কহাং পায়ো কেহি কেরে।

সুরসাগর।

পূর্ব্বোক্ত অংশগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই তালব্য শকারস্থানে দন্ত্য সকার প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা স্পষ্ট করিয়া নিম্নে সেই সকল স্থল নির্দ্দেশ করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত অংশ গুলিতে নিস, স্যাম, ঈস, সীতল, সসী, বংস, সিরস, দরসত, পরসত, সোক, ছতিস, সরদ, দিনেস, সকহি সুকর, স্বান, সুর প্রভৃতিতে শকারবিচার দেখা যায় না। এগুলি যে প্রাকৃত-সম্ভব, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এইত গেল এক প্রমাণ, দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, প্রাকৃতে যেমন অন্তঃস্থ যকার স্থলে সর্ব্বত্রই বর্গীয় জ ব্যবহৃত হয়, প্রাচীন হিন্দিতেও তেমনি সর্ব্বত্রই বর্গীয় জকার ব্যবহৃত হইত। এখনও পদমধ্যে বা পদাদিতে অন্তঃস্থ যকার পরিদৃষ্ট হইলেও পদাদৌ উহার প্রয়োগ অতীব অল্প। নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

নিপটহিং দ্বিজকবি জানতং মোহি।
মৈং জস বিপ্র সুনাউং তোহি॥
ক্যোং কীজৈ ঐসো জতন
জাতেং কাজ ন হোয॥
পরবতপৈ খোদৈ কুআ
কৈসে নিকসৈ তোয়॥
সীস জটা পোথী গহৈ
সেত বসন গল মাহিং।
জোগী জঙ্গম হৈ নহীং
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাহিং॥
সোহত সংগ সমান সোং
যহৈ কহৈ সব লোগ।
পান পীক ওংঠ ন বনৈ
কাজর নৈন ন জোগ॥
জদ্যপি হম কায়র কুটিল
খরে চাকরী চোর।
তদ্যপি কৃপা ন ছাড়িয়ো
চিতৈ আপনী ওর॥

পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত স্থল গুলিতে জস, জতন, কাজ, জোগী, জোগ, জদ্যপি প্রভৃতিতে অন্তঃস্থ যকার স্থানে বর্গীয় জকার ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলিও যে প্রাকৃতসম্ভব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন স্থলে ঐ শব্দ গুলি অন্তঃস্থ যকারেও পরিলক্ষিত হয়, তখন উহাদিগকে সংস্কৃত জাত বলিলেই চলিতে পারে; কারণ, হিন্দিতে সংস্কৃতও আছে। তৃতীয় প্রমাণ এই যে—

প্রাকৃতে যেমন দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য দ্বিবিধ নকারের একতর অর্থাৎ কেবলই মূর্দ্ধণ্য ণকার ব্যবহৃত হয়, হিন্দিতেও তদ্রূপ উহাদের একতর

অর্থাৎ, সর্ব্বত্রই দন্ত্য নকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথন, গুন, পানি, গন, ভুবন, প্রান, পুন, পুরান, রাবন, বান, বানী, প্রবীন, কৃপন, প্রনাম, করন, কারন ইত্যাদি এবং আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত অনেকানেক স্থলেই পাঠকবর্গ মূর্দ্ধন্য ণকার স্থলে কেবলই দন্ত্য নকার দেখিতে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃত অনেক শব্দই হিন্দিতে দেখা যায়। নিম্নে তাহার একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রাকৃত	হিন্দি
জঠেরা	জঠেরা
কহেহি	কহেহি
সনেহ	সনেহ
খল	খল
সুমরণ	সুমরন
সুণণ	সুনন
পুছণ	পুছন
দহি	দহি
মুরদি	মুরতি
লহ	লহ
সোহা	সোহা
তজন	তজন
জব	জদ (জব)
ধাবই	ধাবই
সীয়	সিয়, সীয়
দোউ	দোউ
আয়াদি	আয়াই (আয়ে)
খি	ভী
ভোদি	ভয় (হোয়)
অহুবালা	অহুবালা
আক	আক
বহু	বহু
কবহু	কবহু
অগলো	অগলা

প্রাকৃত	হিন্দি
আন (অন্য)	আন
কেহিং	কেহিং
তুমং	তুম
কো	কো
বি (অপ্যর্থক)	বি
জং	জো
সব্বং	সব
কড়ুঅ	কড়ুআ
সোহণ	সোহন
চন্দ	চন্দ
পিঅ	পিঅ
হিঅঅ	হিঅঅ
তুহ	তুহ
সচ্চং	সাংচ
সেজ্জা	সেজ
নেউর	নেপুর
চোত্থী	চৌথী
পত্থর	পত্থর
তুহা	তুহা
বিচ্ছুঅ	বিচ্ছু
কিসণ	কিসন
চইত্ত	চইত
বারহ	বারহ
তেরহ	তেরহ
সংঝা	সাংঝ
তলাও	তলাও
মেহ	মেহ
লট্ঠী	লাট্ঠী
লচ্ছমী	লছমী
জুবাণ	জুবান

এতদতিরিক্ত আরও বহুসংখ্যক প্রাকৃত শব্দ হিন্দিতে প্রচলিত আছে, সে সকলের নির্দ্দেশ প্রয়োজন নাই।

হিন্দী ভাষার প্রাকৃত-সম্ভবত্ব প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। হিন্দি ভাষার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে সাহেবদের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ বিসদৃশ। তাঁহারা বলেন, উহার প্রচলন সহস্র বৎসরের অধিক হয় নাই। আমাদেরত অনুমান উহা ১৫। ১৬ শত বৎসরের হইবে। এতৎ-পোষণার্থ আমরা ইবন বটুআর ভারণা ভ্রমণ বিষয়ক কথা গুলি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

"'আমি আলা-উল মুলকের সহিত ভারণা নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটী প্রশস্ত, রমণীয় এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। এই সুপ্রশস্ত চত্বর মধ্যে মনুষ্যাদি জীব-জন্তুর পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে এক সুবৃহৎ সৌধ মধ্যে শিলাময় কোন মহাপুরুষ মঞ্চোপরি সমাসীন। আলা-উল মুলক বলিলেন, এক সময়ে এই স্থানটী সুসমৃদ্ধ নগরী ছিল। কর্ম্মদোষে অধিবাসীরা সকলেই এককালে পাষাণময় হইয়াছে। ঐ ইহারধ্বংসকাহিনী হিন্দি ভাষায় অট্টালিকাগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, দেখ। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাপারের সংঘটন হইয়াছিল।'

ইবন বটুআ ৫৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ভ্রমণব্যপদেশে উক্ত ভারণা নামক স্থানে গিয়াছিলেন। তাহারও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দি ভাষার প্রচলন থাকিলে, উহার বয়ঃক্রম ১৫।১৬ শত বৎসর বলা নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই। আমাদের মতে ঐরূপই উহার প্রচলন কাল।

প্রাকৃত ও হিন্দীর সম্বন্ধপ্রদর্শন সমাপ্ত হইল। কিন্তু পালীর সহিত হিন্দীর সংস্রবকথা আদৌ উল্লিখিত হইল না। ইহার কারণ এই, প্রাকৃত ও পালীতে প্রভেদ অতি অল্প; সুতরাং প্রাকৃতের সহিত হিন্দীর যে সম্বন্ধ পালীর সহিতও প্রায় সেই সেই সম্বন্ধ। তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য মধ্যেই গণ্য নহে।

হিন্দি ভাষার প্রচলন হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে মারহাটী ও গুজরাটী ভাষা প্রচলিত হয়। উহারা হিন্দিরই একবিধ শাখামাত্র; শব্দ সকল প্রায়ই এক। কেবল কারকাদি বিভক্তি এবং ক্রিয়া প্রকরণে বর্ত্তমানাদিকাল প্রয়োগে অত্যল্প বিশেষ দেখা যায়। মারহাটী ভাষার 'মী উঠেং', 'আম্হী উঠুং', 'তুং উঠস্', 'তুম্হী উঠ,' 'মী করি', 'আম্হী করুং', ইত্যাদি বাক্য হইতে যে বাঙ্গালায় 'আমি,' 'তুমি' হইয়াছে, ইহা প্রায়ই একরূপ স্থির নিশ্চয়। তবে উৎকল ভাষাতেও 'আম্বে দেখুঁ', 'তুম্বে দেখ' ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। উহাদের কোন্‌টী হইতে বাঙ্গালা ভাষাব 'আমি' 'তুমি' হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। সংস্কৃত 'অহং' হইতে বাঙ্গালায় একেবারে 'আমি' হইতে পারে না। অস্মদ ও যুষ্মদ শব্দের রূপ নানা ভাষায় নিম্নে দেওয়া গেল।

অস্মদ।

	একবচন	বহুবচন
সংস্কৃত	অহম্	বয়ম্
প্রাকৃত	অহম্	অহ্ম
হিন্দি	হাম	হামে
গুজরাটী	হুং	হমে
মৈথিলী	হম্	হমনী, হমরা
মারহাটী	মী	আম্হী
ভোজপুরী	হম	হমনী
উৎকল	আম্বে	আম্বেমানে
ব্রজভাষা	হাম	হমরা

যুষ্মদ।

	একবচন	বহুবচন
সংস্কৃত	ত্বম্	যূয়ম্

	একবচন	বহুবচন
প্রাকৃত	তুম	তুম্মে
হিন্দী	তোম	তোমে
গুজরাটী	তুং	তুহনী
মৈথিলী	তুংহ	তুহনী, তোহর
মারহাটী	তু,	তুম্হী
ভোজপুরী	তুংহ	তোহনী
উৎকল	তুম্বে	তুম্বমানে
ব্রজভাষা	তুহঁ	তুহরা

পূর্ব্বোক্ত সকল উদাহরণ গুলিতে বাঙ্গালার 'আমি' 'তুমি' হইতে কিছু না কিছু বিশেষ প্রায়ই আছে। সুতরাং, কোনটী হইতে বাঙ্গালার 'আমি 'তুমি' জাত; তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করি, যে উৎকল ভাষার ক্রিয়ার অনেক পদই বাঙ্গালায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, তজ্জন্য উৎকলীয় 'আম্বে' 'তুম্বে' হইতেই বঙ্গীয় 'আমি' 'তুমি' সমুৎপন্ন, এইরূপ বলাই যুক্তি-সঙ্গত। অধিকন্তু মাহারাষ্ট্রীয় 'আম্হী' 'তুম্হী' বহুবচনের পদ, একবচনে মী আর তু হইয়া থাকে। উৎকল ভাষায়ও অসম্ভ্রম স্থলে 'মু' ও 'তু' ব্যবহৃত হয়। তাহা হইতেই বোধ হয় বাঙ্গালায় 'মুই' 'তুই' হইয়া থাকিবে।

মারহাটী ভাষার করণকারকে এ, করুন ও নে হয়। করুন শব্দের অর্থ 'করিয়া', যথা, 'হস্ত করুন', ইহার অর্থ -হাতে করিয়া। আমাদের দেশেও করণকারকে 'করিয়া' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, হাতে করিয়া জল আন। লাঠি করিয়া মার। এই 'করিয়া' কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা অতঃপরই প্রকাশ করিব। কিন্তু, কাহারও কাহারও ধারণা যে 'কর্ত্তৃক' হইতে অস্মদ্দেশীয় করণের চিহ্ন 'করিয়া' হইয়াছে। এটী তাঁহাদের নিতান্তই অসঙ্গত ধারণা। কেন না, প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষায় 'কর্ত্তৃক' কোন পদ বা শব্দই হইতে পারে না। সমস্ত পদ স্থলে যেখানে যেখানে 'কর্ত্তৃক' দেখা যায়, তথায় তাহার কর্ত্তৃত্ব আছে; কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কোথাওই 'কর্ত্তৃক' পদ প্রযুক্ত হয় না। 'বিষ্ণু শর্ম্ম কর্ত্তৃক বিরচিত'; 'হরির কর্ত্তৃক সম্পাদিত'; 'রামেশ্বর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত' ইত্যাদি স্থলে সকল গুলিরই কর্ত্তৃত্ব আছে; সুতরাং, এতৎস্থলে 'কর্ত্তৃক' ব্যবহৃত হইতে পারে; নতুবা 'হস্তে করিয়া জল আনিলাম', 'যষ্টি করিয়া প্রহার করিল' ইত্যাদি স্থলে 'হস্ত কর্ত্তৃক' বা 'যষ্টি কর্ত্তৃক' এবম্বিধ প্রয়োগ একেবারেই হইতে পারে না, কারণ, তত্তৎস্থলে হস্ত বা যষ্টির কর্ত্তৃত্ব নাই। 'লোক করিয়া আনাইলাম' বা 'লোক কর্ত্তৃক আনাইলাম' এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে; কারণ, 'আনান' ণিজন্ত ক্রিয়াপদ হওয়াতে 'লোক' এই প্রযোজ্য কর্ত্তায় তৃতীয়া হইলে কর্ত্তৃত্ব হেতু 'লোক কর্ত্তৃক' হইতে পারে। তা বলিয়া যেখানে করণকারকে করিয়া হয়, সেই খানেই যে 'কর্ত্তৃক' প্রযুক্ত হইবে, এরূপ ধারণাই অতীব গর্হিত। যাহা হউক, বাঙ্গালার করণকারকের 'করিয়া' পূর্ব্বকথিত মাহারাষ্ট্রী ভাষার 'করুন' হইতেই আসিয়াছে, কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গতও নহে।

আমরা কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সুন্দর নিদর্শন পাইয়াছি, সংস্কৃত 'কৃত্বা' প্রাকৃতে 'করিঅ' হইয়া বাঙ্গালায় 'করিয়া' হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইহার সাম্য পরিদৃষ্ট হইতেছে; উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাউক, যথা, সংস্কৃত 'হস্তে কৃত্বা' প্রাকৃত 'হত্থে করিঅ' বাঙ্গালা 'হাতে করিয়া'। বোধ করি, উক্ত প্রাকৃতিক 'করিঅ' অত্যন্ত বিকৃত হইয়া প্রাচীন মারহাটীতে 'করুন' হইয়া অধুনা 'করুন' হইয়া থাকিবে। অতএব মারহাটী 'করুন'-এর সহিত বাঙ্গালার 'করিয়া'র বিশিষ্ট মিলটাও

না থাকিলেও প্রাচীন মারহাটী 'করুন' বা প্রাকৃত 'করিয়' ইহাদের সহিতই উহার ঘনিষ্ঠতা অধিক, সকলেই একথায় অনুমোদন করিবেন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে,প্রাচীন বাঙ্গালীর উক্ত'করুন'ভোজপুরীতে 'করুআ'হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্ববৎ অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে ভোজপুরি ভূরি ভূরি শব্দই 'উআ' উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা,বেটা বেটুআ,ঘর—ঘরুআ; বকস—বকসুআ; খেত—খেতুআ; আম আমুআ। জলপ্রবাহের ন্যায় ভাষাপ্রবাহ প্রতিহত না হইলে চারিদিকেই গমন করিতে পারে। কোথায় প্রতিহত হইল না হইল তাহা স্থির করাই দুঃসাধ্য।

মারহাটী ভাষার করণকারকের 'এ' বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত হয়। সম্বন্ধপদের চা, চী, চে হিন্দির 'কা, কী, কে' হইতে গৃহীত। অধিকরণে ই, অন্ত ও মধ্য ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার অধিকরণেও ঐগুলির ব্যবহার দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন মারহাটী ভাষায় করণ কারকে 'নে'ও প্রচলিত আছে। সংস্কৃত নীত্বা, প্রাকৃত নীঅ হইতে মারহাটীর 'নে'র সংঘটন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালায় করণ স্থলে 'নিয়া' বা 'লইয়া'র সমধিক প্রয়োগ না থাকিলেও 'হস্তে করিয়া' বা 'হস্তে লইয়া' এতদুভয়ের পার্থক্য বেশী বলিয়া বোধই হয় না। যথা, 'হাতে করে' 'ঢাল' বা 'হাতে নিয়া ঢাল'।

গুজরাটী ভাষার অপাদানে থী ও থকী হইয়া থাকে, বোধ হয়, উহা হইতেই আমাদের থাকিয়া বা থেকে হইয়াছে। আমাদিগের 'থাকিয়া' ও গুজরাটীর 'থকী' উভয়েই একার্থবাচক। উঁহাদিগের'ঘর থকী'এবং আমাদিগের 'ঘর থেকে'র অর্থ একই। অধিকন্ত, গুজরাটী ভাষার'মাহারো''তুহারো' ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক পদ আছে, উহা হইতেই বাঙ্গালার 'আমার' 'তোমার'উৎপন্ন,এইরূপ বলিতেও কোন আপত্তি দেখা যায় না। অথবা পুরী বোলী 'তিহার' হইতে ব্রজভাষায় 'তুহার' হইয়া কালক্রমে 'তুমার'এবং তাহা হইতেই'তোমার' হইয়াছে।

তৈলিঙ্গী বা তেলেগু ভাষার উপকরণেই উড়িয়া ভাষা সংগঠিত। তেলেগু হইতে তামিল ভাষাও উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তেলেগু ও তামিলকে আর্য্যভাষার মধ্যে (Aryan language) পরিগণিত করেন না। যদি বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দি, মারহাটী ও গুজরাটী প্রভৃতি ভাষা আর্য্য ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে উহাদেরই বা দোষ কি? তাঁহারা অনুমান করেন, যে সংস্কৃতের বহুকাল পূর্ব্বে তেলেগু ভাষার প্রচলন ছিল, উহা অতি প্রাচীন ভাষা। উহার বর্ণমালা দেব নাগর হইতে উৎপন্ন নহে। তেলেগুর অ, আ, ক, খ ও দেবনাগরের অ, আ, ক, খ প্রভৃতিতে ভূয়িষ্ঠ আকৃতিক বৈষম্য বিদ্যমান আছে। আর তেলেগু ভাষায় ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হইলেও সেগুলি অধস্তনকালে কোনরূপে উক্ত ভাষার সহিত সংমিশ্রিত*। নতুবা সংস্কৃতের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই।

আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এইরূপ সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই অনুমোদন করিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে বাঙ্গালা, হিন্দি, মারহাটী, গুজরাটী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরি, নেপালী, ভুটানী, আসামী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, কার্ণাটী এবং ভারতবর্ষের বহির্ভাগে, ফার্সী, বার্মিজ, টিবেটী, সিংহলী প্রভৃতি সকল ভাষাই সংস্কৃত হইতে জাত। কি বর্ণমালা, কি

* See preface Telegu Grammar, by A. D. Campbell.

শব্দ নিচয়, কি সমাস-পদ্ধতি, কি সন্ধি-প্রকরণ, কি প্রকৃতি-প্রত্যয়, কি কারক-বিভক্তি সকল বিষয়েই অল্পাধিক সাম্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়। বোধ হয়, প্রাকৃতের প্রচলন কালে তেলেগু ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যৎকালে অন্ধ্র বংশীয় ভূপালগণ গোদাবরীর দক্ষিণস্থ ভূভাগসমূহের অধিনায়ক ছিলেন, তৎকাল হইতেই উহার সূচনা দেখা যায়। অন্ধ্র বংশীয়গণ শৈব ছিলেন। ইষ্টদেবের উপাসনার জন্য তাঁহারা স্বীয় রাজ্য মধ্যে ত্রিলিঙ্গ নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করত সমগ্র রাজ্যকে ত্রিলিঙ্গম্ বলিয়া আখ্যাত করিয়া ছিলেন। তদ্দেশজাত বলিয়া উক্ত ভাষার 'ত্রৈলিঙ্গী' বা 'তৈলিঙ্গী' নাম হয়। এক্ষণকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহার 'তেলেগু' নাম দিয়াছেন।

প্রাকৃতের পর অন্য কোন ভাষার মধ্য দিয়া তেলেগু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ভাষার ও বর্ণমালার বৈষম্য দেখিয়া আপাততঃ এইরূপ মনে হয়, উহাদের মধ্যে অন্য কোন ভাষা ছিল, এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। আরও এইরূপ প্রবাদ আছে, যে অন্ধ্রীয়গণ আপনাদের ভাষাকে প্রাকৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য দেবনাগরে ও তেলেগু বর্ণমালায় আদৌ সাম্য পরিলক্ষিত হয় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে তেলেগু ভাষাকে অনার্য্য ভাষা বলিয়াছেন, তাহারত এই মাত্র কারণ আমাদের বোধগম্য হয় যে, উক্ত ভাষায় ౘ pr(ts) ও ౙ pr (dz) দুই বর্ণ অধিক আছে। বাস্তবিক ভারতীয় কোন ভাষাতেই পারসিক বা আরবিক ذ (dzal), ز (za), ض (zad) ظ (zo), প্রভৃতির সদোচ্চারণের কোন অক্ষরই নাই। তেলেগু ভাষায় এই নূতনত্ব কোথা হইতে আসিল, আমাদিগের অনুমান, এই সন্দেহ বশতঃই সাহেবগণ উহাকে অনার্য্য ভাষা বলিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ধব, গব, প্রভৃতি অনার্য্য ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ বিশিষ্ট অনেক শব্দ আছে।

আমাদের বোধ হয়, অন্ধ্রীয়গণ আপনাদের ভাষাকে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রকরণেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন; ঐ দুইটী অক্ষরও তাহার অন্যতম প্রমাণ। দেবনাগরের তদ্রূপ বর্ণনা থাকায়, তাঁহারা হয় ত পারসীক বা অন্য কোন ভাষা হইতে উহাদিগকে আনয়ন করিয়া থাকিবেন। তেলেগু বর্ণমালার সর্ব্বশেষে আর একটী অক্ষর আছে। তাহার নাম ౚ (loo) লু। ইহার উচ্চারণ ঠিক ৯কারের মত। একবিধ উচ্চারণ বিশিষ্ট দুইটি অক্ষরেরই বা কি আবশ্যক ছিল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। তদ্ব্যতীত ইহার দুইটী রকার। তন্মধ্যে ఱ রেফের কার্য্য করে। আর ర রকারের মত প্রযুক্ত হয়। বোধ হয়, ইহাও স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তেলুগু ভাষার আরও এক স্বাতন্ত্র এই, যে উহার স্বরবর্ণ মধ্যে দুইটি একার ও দুইটি ওকার আছে। একটি হ্রস্ব ও অপরটি দীর্ঘ। সংস্কৃত ব্যাকরণে ত 'ন এজ্ন্যাস্ত' অর্থাৎ এ, ঐ, ও, ঔ ইহাদের হ্রস্ব নাই, এইরূপ লিখিত আছে। অন্ধ্রীয়গণ হ্রস্ব একার ও হ্রস্ব ওকার প্রবর্ত্তিত করিয়া শুদ্ধ বর্ণমালায় নয়, ব্যাকরণেও স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণে ঋকার ও ৯কার এই দুটি হ্রস্ব রি, দীর্ঘ রী, হ্রস্ব লি ও দীর্ঘ লী এইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। তেলেগু ভাষায় উহারা রু, রূ, লু, লূ এইরূপে উচ্চারিত হয়। এস্থলেও উচ্চারণের অন্যথা স্বতন্ত্রতা প্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্ত, তেলুগু ভাষায় স্বরবর্ণ সকল পঠিত হইবার সময় উহাদের প্রত্যেকের নামের পর 'কারমু' উচ্চারণ করিতে

হয়; যথা, 'অকারম্'; 'আকারম্'; ইত্যাদি। কারম্ কি, তাহা অবশ্য পাঠকবর্গের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। তজ্জন্য এস্থলে তাহার বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। সংস্কৃত সকল বর্ণের পর, 'কার' বলিবার রীতি আছে; যথা, অকার, আকার, ইকার, ককার, বকার ইত্যাদি। দ্রৈলিঙ্গীগণ সংস্কৃত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সকল ক্লীবলিঙ্গ করিয়া উচ্চারণ করেন। তাহা হইলেই সংস্কৃত 'অকার' তাঁহাদের নিকট 'অকারম্'এইরূপে উচ্চারিত হইবে। ঐ 'অকারম্' 'আকারম্' ইত্যাদি হইতেই 'অকারমু' 'আকারমু' হইয়াছে। হঠাৎ শুনিলেই বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু [illegible] সংস্কৃতজাতই বটে। আর ব্যঞ্জনবর্ণ [illegible] ঘু ইত্যাদিরূপে গঠিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ নানাকারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তেলুগু ভাষাকে অনার্য্য ভাষা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা বলি, এ সব স্বাতন্ত্র কৃত্রিম; লৌকিক এবিতার পরিচয়; যখন মূল বিষয় অভিন্ন, তখন উহাকে সংস্কৃত জাত বলা ও অনার্য্য ভাষা মধ্যে গণ্য না করাই বিধেয়।

'তেলুগুর বর্ণমালার সঙ্গে ঔৎকলীয় বর্ণমালার অনেক সাদৃশ্য আছে। অক্ষরের ছাঁদ উভয়েরই সমান। উভয়েরই গোল গোল। উৎকলের ○ ঠ ও তেলুগুর ర র প্রায়ই একরূপ। এক বর্ণমালা হইতে অন্ত বর্ণমালা উৎপাদনসময়ে প্রয়োজনীয় বৈষম্যের অভাব হইলেই তদ্বর্ণকে অন্য নামে আখ্যাত করিতে হয়। সে জন্যই একের র অন্যের ঠ হইয়াছে। উৎকলের ଡ (ড)টি ও তেলুগুর(ড)ও একাকার সন্নিবেশে অত্যল্প বিভিন্নতা মাত্র। তেলেগু ভাষায় রু, রূ, লু, লূ বলে; উৎকল ভাষায়ও রু, রূ, লু, লূ বলিবার রীতি আছে। তেলেগু কর্ম্মকারকের ও অপাদানের 'কু' উৎকলেও ব্যবহৃত হয়। উহার অপাদানের 'ড়ু'হইতে উৎকলের রু হইয়াছে।

তেলেগুর অত্যল্প বিভিন্নতাতেই যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাকে অনার্য্য ভাষা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন; তখন তাঁহারা তামিল ভাষাকেও যে অনার্য্যভাষা বলিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? সাহেবদের মতে তামিলও অনার্য্য ভাষা। উহা সংস্কৃতের বহুকাল পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। যেহেতু উহার অসংস্কৃতভব উপাদানই অধিক। এতদ্বিষয়ে আমরা, সাহেবদের বড় দোষ দিতে পারি না। কারণ, [illegible] স্বরবর্ণ মোটে বারটি। ব্যঞ্জনবর্ণ [illegible] স্বরের নাম যথা, অনা, আওনা, ইনা, ঈওনা, উনা, ঊওনা, এনা, এওনা, ঐওনা, ওনা, ওওনা, ঔওনা। ইহাতেও তেলেগুর ন্যায় হ্রস্ব একার, দীর্ঘ একার ও হ্রস্ব ওকার, দীর্ঘ ওকার আছে। ব্যঞ্জনের নাম যথা—কনা, ঙনা, চনা, ঞনা ডনা, ণনা, পনা, মনা, য়না রনা, লনা, বনা, অড়ানা, ইড়ানা, অরানা, অনানা। সংস্কৃতের চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশটী ব্যঞ্জন স্থলে মোটে আঠারটি, প্রায় অর্দ্ধেক। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণ আদৌ নাই। ইহাতেও যদি সাহেবগণ উহাকে অনার্য্য ভাষা না বলিবেন ত বলিবেন কাকে? যাহা হুউক, আমরা ত আর ভারতবাসী হইয়া দ্রাবিড়ীভাষাকে অনার্য্যভাষা বলিতে সাহস করি না; উহা ত প্রাকৃতের অন্যতম শাখা, তাহা কাহার অবিদিত? তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপভ্রংশ কাণ্ড উহাতে যেমন ঘটিয়াছে, এমন আর কুত্রাপি ঘটে নাই। এমন কি সংস্কৃত বর্ণমালার প্রায় অর্দ্ধেক বর্ণের

উচ্চারণ উক্ত ভাষা হইতে কোথায় পলাইয়াছে; ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের কথা আর কি হইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, লবণাম্বুধির জলদোষে তত্তীরবাসী লোকদিগের বাক্যের অধিকাংশ বর্ণই উকারে পরিণত হইয়াছিল; তাই তাঁমিল ভাষায় তিনটি উকার। উনা, অড়ানা ও ইড়ানা। ইহাদের কোনওটির উকারবৎ, কোনওটির ড়কারবৎ উচ্চারণ হয়। অড়ি, পড়ি, বড়ি, ইড়ি, তেড়ি ইত্যাদি শব্দে সংস্কৃতের অন্তস্থ বর্ণ আছে, তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি, তজ্জন্য আমরা উহাদের অনার্য্যভাষা বলিতে সাহস করিলাম না।

মৈথিলী হিন্দি উৎপন্ন হইলে উৎকল ভাষা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। সংস্কৃত তদ্, যদ্ কিম্, অদস্, প্রভৃতি শব্দ মৈথিলীতে যেরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছে, উৎকলেও প্রায় তদ্রূপ দেখা যায়। উহা হইতেই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। যে, কে, কিএ, আপন, কেহি এগুলির মৈথিলের সহিত অধিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। উৎকলের যেতে, তেতে, কেতেবেলে সোহিলে এ গুলিও মৈথিলী-জাত। মৈথিলীর 'দেখিবাক ইচ্ছা অছি' ও উৎকলের 'দেখিবাকু ইচ্ছা অছি" এদুইটীর প্রভেদ নাই বলিলেও বলা যায়। তবে এস্থলে পার্থক্য নাই বলিয়া উভয় ভাষাই যে এক, তাহা নহে, অন্যত্র বহুল পার্থক্য থাকিলেও নৈকট্যও অনেক। তজ্জন্য মৈথিলীর পরে উৎকলের জন্ম বলা গিয়াছে। ক্রিয়া প্রকরণের সাম্য, আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব।

পরবর্তী ভাষাতে পূর্ব্বতন ভাষার বিভক্তি, কারক ও শব্দাদিতে অনেক সাম্য থাকে, এই নিয়মানুসারেই আমরা যে যে ভাষা হইতে যে যে ভাষার উৎপত্তি, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন করিলাম। এক্ষণে ঐ সকল ভাষা হইতে কিরূপে বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অগ্রে আমরা উক্ত ভাষার বয়োনির্দ্ধারণ করিতেছি।

বাঙ্গালা ভাষার বয়ঃক্রম বিচার।

আমরা বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি-প্রসঙ্গে কথঞ্চিৎ আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে উহার বয়োনির্দ্ধারণেরও আবশ্যক দেখা যাইতেছে। যেমন কোনও এক নির্দ্দিষ্ট ভাষা-হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি নহে,তেমনি কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিনেও উহার জন্ম ঘটে নাই। তবে কোন্ শতাব্দী হইতে কোন্ শতাব্দী মধ্যে উহার জন্ম,কোন প্রকারে তাহার অনুমান করা নিতান্ত অসম্ভব নয়। অনেকের ধারণা, যে, মান্ধাতার কালাবধি উহার প্রচলন হইয়া আসিতেছে। এতৎ প্রতিপাদনার্থ তাঁহারা যে যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমরা একে একে সে সকলের অপ্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব। তাঁহারা বলেন, এককালে 'হইতেছে', 'হউক' ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে 'হচ্ছে' 'হোগ' ব্যবহৃত হয়, উহা বহুকালসাপেক্ষ।

আমরা বলি, যৎকালে 'হইতেছে', 'হউক' ব্যবহৃত হইত, তৎকালেই প্রাকৃতভাবে 'হচ্ছে', 'হোগ' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে কালসাপেক্ষতা কিছুই নাই। এখনও 'হইতেছে', 'হউক' বা 'হচ্ছে', 'হোগ' সবই স্থলবিশেষে প্রযোজিত হয়, তাহা সকলেই জানেন।

তাঁহারা আরও বলেন, 'মাঘের জাড়ে, মইষের শিঙ্ নড়ে' ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্যেও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব অনুমিত হইতেছে; কারণ, পূর্ব্বকালীন মাঘের যেরূপ শীত দেখিয়া ঐ প্রবাদ রচিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ শীত কোথায়? তবেই, ঐ প্রবাদটীও যেমন প্রাচীন, বাঙ্গালা ভাষাও ততোধিক প্রাচীন।

আমরা বলি, ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত না হইয়া বরং নব্যত্বই প্রমাণিত হইতেছে। কারণ, ঋতু-পরিবর্ত্তন আজকাল এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হইতেছে যে, তাহা ভাবিতে গেলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরাই বাল্যকালে যে বর্ষা,যে শীত দেখিয়াছি, এই বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই তাহার এক চতুর্থাংশও আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং, আমাদের বাল্যকালে যেরূপ শীত ছিল, যদি তাহার আটগুণ বেশী শীতের সময়েও ঐ প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহার বয়ঃক্রম দুই শতাব্দীর উর্দ্ধ হয় না। তাহা হইলে ত বাঙ্গালা ভাষা দুইতিন শত বৎসরের হইয়া পড়ে। সুতরাং, ঐ যুক্তি আদৌ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

অধিকন্তু, তাঁহারা আরও বলেন যে, খৃষ্টীয় শকারম্ভকালে রোমকেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আসিত, তাঁহাদের পুস্তকে বাণিজ্য-দ্রব্য এবং বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যেরূপ নাম দেখা যায়, সেগুলি না সংস্কৃত না প্রাকৃত।

এতদুত্তরে আমরা বলি, তবে কি সে গুলি 'বাওয়া ডিমে'। কারণ, যাহা কোন পদার্থ হইতে জাত নহে, তাহাকেই 'বাওয়া ডিমে' বলিবার রীতি আছে। লেখক মহাশয় যদি তদ্রূপ দুই চারিটী শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেন, তাহা হইলে কোন গতিকে আমরা উহাদের মূলানুসন্ধানের চেষ্টা করিতাম। এস্থলে আমাদেরও জিজ্ঞাস্য এই, যদি সেগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃত নহে, তবে কি সেগুলি বাঙ্গালা শব্দ? তাহা স্বীকার না করিলেত আর বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না। যদিই তাহাদিগকে বাঙ্গালা শব্দ বলেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালা কিছু স্বতঃসিদ্ধ ভাষা নহে, তবে উহারা কোথা হইতে আসিল? ইহারও উত্তরে যদি বলেন, যে সেগুলি বিজাতীয় লোকের সংমিশ্রণ ঘটিত, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, তৎকালে বাঙ্গালা ভাষা না থাকিলেও প্রাকৃতাদি যে কোন ভাষাই থাকুক, তাহাতেও তদ্রূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। অতএব, ইহাতেও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল না। বিশেষতঃ, আমরা দেখিতেছি যে, খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিআন নামক চৈনিক পরিব্রাজক, তৎকালে বাঙ্গালায় মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, তৎকালে যে বাঙ্গালা ভাষা হয় নাই, ইহাই আমাদের স্থির ধারণা।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব-প্রতিপাদনকারিদিগের অন্যতম প্রমাণ এই যে, আজ পর্য্যন্ত

এতদ্দেশে সাঁজপূজনী, যমপুকুর, ইতুব কথা, খনার বচনাদি যাহা প্রচলিত আছে, সে সকল অতি প্রাচীন। সুতরাং,বাঙ্গালা ভাষাও প্রাচীন।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির মধ্যে কেবল খনার বচনকেই প্রাচীন বলিতে হইবে। কেননা, ঐ গুলি যদি খনার স্বরচিত হয়, তবে কোন সময়ে খনা জীবিত ছিলেন, তাহার নির্দ্ধারণ হইলেই অবশ্য ঐ গুলিরও বয়োনির্দ্ধারণ হইতে পারে। খনা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন বরাহমিহিরের পত্নী। এ কারণ, বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক হইলে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে মালবান্তর্গত উজ্জয়িনীতে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল, ইহাত কাহারও ধারণাতেই আইসে না। অতএব, খনা যে বাঙ্গালা ভাষায় জ্যোতিষের বচন সকল রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ-প্রদর্শন প্রগল্‌ভতা-পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেকের ধারণা যে, তিনি জ্যোতিষ-সংক্রান্ত বচন সকল সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করিয়া-ছিলেন, কালক্রমে উহারা বাঙ্গালা, হিন্দী, উৎকলাদি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কেহবা বলেন যে, তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না; জন্মাবধি রাক্ষসগৃহে প্রতিপালিত হইয়া রাক্ষসী ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। বচনগুলিও সেই রাক্ষসী ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে ভাষান্তরিত হইয়াছে। খনা রাক্ষসী-ভাষাভিজ্ঞ অথবা সংস্কৃতজ্ঞ যাহাই হউন, তদীয় বচন গুলিও যে এককালে বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হয় নাই, তাহা পাঠকগন নিম্নলিখিত বচন গুলির তারতম্য অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন॥

১। খালি ছাগলা, বৃষে চাঁদা, মিথুনে পূরিয়া বেদা। সিংহে বসু, কর কি বসে, আর সব পূরিবে দশে॥

২। মাস নখতা, তিথিযুতা, ভা দিয়ে হররে পুতা। আঁধারে দশ আলোতে এগার, ইহা দিয়া নক্ষত্র সার॥

৩। দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি, সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি। রবি কুড়ি, সোমে ষোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল। বুধ বৃহস্পতি এগার বার, শুক্র শনি চৌদ্দ তের। হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে॥

৪। আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর লেখা জোখা। যদি বর্ষে রুণা, ত পর্ব্বতে হয় কালহাবনা। যদি বর্ষে ঠায়, ত মেল মন্দার ভেসে যায়॥ যদি হেসে সুয্যি বসে পাটে, ত চাষার গরু বিকোয় হাটে।

এই বচনটী অন্য রকমে শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর লেখা জোখা। যদি বর্ষে মুষলধারে, মাঝ সমুদ্দুরে বগা চরে। যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা, পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা। যদি বর্ষে নিমি ঝিমি, শস্যের ভার না সহে মেদিনী। যদি হেসে সুয্যি বসে পাটে, চাষার গোরু বিকোয় হাটে॥

৫। নগনচাঁদা বেদ বেথানে, না পড়িয়ে আঁকের চেনে॥

৬। মানুষ মরে যাতে, গাছলা সারে তাতে। পচা সরায় গাছলা মারে, গোঁধলা দিয়ে মানুষ মারে॥

এই বচনগুলির রচনা যেন প্রাচীন প্রাচীন বোধ হয়। আবার—

১। সভার মধ্যে যে জন ভণে, তার মুখে জয় জন শুনে। তিথি বার করিয়ে এক, সাতে হরে আয়ু দেখ। দুই চারি কিম্বা ছয়, এ রোগী জীবার নয়। এক তিন কিম্বা বাণ, যমঘরে হাত টেনে আন। অঙ্ক শূন্য পায় যবে, নিশ্চয় রোগী মরিবে তবে॥

২। তিথি বার নক্ষত্র মাসের যতদিন। একত্র করিয়া সবে সাতে কর হীন॥ একে শুভ দুয়ে লাভ তিনে শুক্র ক্ষয়। চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়॥ ষষ্ঠেতে মরণ হয় শূন্যে হয় সুখ। এ দিনে করিলে যাত্রা কভু নহে দুখ॥

৩। বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ, পেটের ছেলে গুণে আন। নামে মাসে করে এক, সাতে হরে সন্তান দেখ। এক তিন থাকে বাণ, তবে নারীর পুত্র জান। দুই চারি

থাকে ছয়, অবশ্য তার কন্যা হয়। যদি থাকে শূন্য সাত, তবে নারীর গর্ভপাত।

৪ ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতির পিতা। ভাদ্রমাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥ রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অগাধ বাণ। হাতে কাঠা গৃহী ফিরে কিনতে না পায় ধান।

৫। অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা, নামে নামে কর সমতা। তিন দিয়ে হরে আন, তাতে মরা বাঁচা জান। একে শূন্যে মরে পতি, দুই থাকিলে স্বয়ম্বতী।

এগুলির রচনা খুব আধুনিক বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

আবার যদুগোপালের পুদ্যপাঠের মত ভাষাও খনার বচনে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। যথা—

১। খনা বলে শুন কৃষকগণ, হাল লয়ে মাঠে যাইবে যখন। শুভক্ষণ দেখে করিবে যাত্রা. পথে যেন না হয় অশুভবার্ত্তা। মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপণ, পূর্ব্বদিক্ হতে কর হলের চালন। তা হলে তোর সমস্ত আশয়, হইবে সকল নাহিক সংশয়।

এইবার মধ্যম গোছের খনার বচনেরও দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক.

১। শুনরে বাপু চাসার বেটা।
মাটীর মধ্যে বেলে যেটা॥
তাতে যদি বুনিস পটল।
তাতেই তোর আশার সফল॥

২। বলে গেছে বরাহের পো,
দশটি মাস বেগুণ রো।
চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ,
ইথে নাই কোন বিবাদ।
পোকা ধল্লে দিবি ছাই,
এ হতে ভাল উপায় নাই।
ধরা ছুঁয়ে ভরবি জল,
সকল মাসে পাবি ফল।

৩। খনা বলে শুন শুন,
শরতের শেষে মূলা বুন।
ফাঁগুনে না রুইলে ওল,
শেষে হয় গণ্ডগোল।

এই সকল বচনদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, খনার বচনগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই; তবে অন্য কোন ভাষা হইতে অনূদিত, তাহাও আবার এক সময়ে নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। আমরা শুনিয়াছি হিন্দী ও উৎকল ভাষায়ও ভূরি ভূরি খনার বচন আছে। সম্প্রতি সেগুলির যে কয়েকটী হস্তগত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে প্রকাশিত করা গেল।

হিন্দী যথা—

১। আষাঢ়ে কাড়ান নাম কে,
শাওনে কাড়ান ধান কে।
ভাদরে কাড়ান শীষ কে
আশিনে কাড়ান কীস্ কে।

২। করকট ছরকট সিংহে শুকা,কন্যা কাণে কাণ।
বিনি বাতে বরসে তুলা কহঁা রাখবি ধান।

উৎকল যথা—

১। হাত্তো বিশো কোরি ফাঁক।
অম্ব কদল পুতি রাখ॥
গছ গছলি ঘন হেব না।
গছ হেব ত ফল হেব না॥

২। বৈঁউ মাসর বৈঁউ রাশি,
তার সপুরে থাএ শশী।
যদি পাএ পুন্নমাসী,
অবশ্য রাহু চাঁদকু গ্রাসি।

অধিক আশ্চর্য্যের কথা আর কি বলিব, সংস্কৃত ও পারসী মিশ্রিত খনার বচনও পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে দুইটি দেওয়া গেল।

১। ধনস্থে কুমুদবন্ধৌ ভবেৎ খুব চেহারা;
হাজিরে হুজুরে যুকারে লখিবা॥
ইহযোগজাতো যদি পাজি আনা।
তদা রোজ বরুরোজ মিলে খুব খানা॥

২। সর্ব্বে গ্রহাশ্চতুঃ কেন্দ্রে ভবেৎ খুব নসিবা।
• স্বক্ষেত্রীয়ৈ সর্ব্বগ্রহৈর্ভবেৎ সাহনপতিসা।

পারসী শব্দ মিশ্রিত বাঙ্গালা খনার বচনও অনেক পাওয়া যায়, নিম্নে দুই একটী প্রদর্শিত হইতেছে।

১। দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ, কমে না বাড়ে বার মাস।

২। পৌষ গরমি, বৈশাখে জাড়া, প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া। খনা বলে শুন হে স্বামি, শাওন ভাদরে না হবে পানি।

এইরূপ কত রকমের যে খনার বচন আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, সুতরাং, খনার বচন দ্বারাও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল না।

খনার বচনের ন্যায় ডাকের কথাও নানা কালের দেখা যায়। নিম্নে সব রকমেরই গুটি-কতক দেখান যাইতেছে।

১। অতি দিঘলী হয় রাঁড়ি, নিধুনী হয় নেড়ামুড়ী। পিঙ্গলা আঁখি চপলমতি, ওষ্ঠ ডাগর অলক্ষণ অতি।

২। ঘরে আখা বাহিরে রাঁধে, অল্প কেশ ফুলিয়ে বাঁধে। ঘন ঘন চায় উলটে ঘাড়, ডাক বলে এ নারী ঘর উজাড়।

৩। সজ্জন পীড়ে, গোরু মারে, পরের নারী স্বাপ্য হরে। বার বৎসর ভিক্ষা মাঙ্গে, শেষ ভ্রমিয়া নাহে গাঙ্গে। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যায়, যাহারি পাপ তাহারি গায়।

একটী উৎকল ভাষার ডাকের বচনও আমরা পাইয়াছি, নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

নিয়ড পোখরি দূরে যাএ।
পথিক দেখি আউড়ে চাএ॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বোলে এ নারী ঘরবে ন টিকে॥

ডাকের বচনগুলিও নানাকালীন বলিয়া, তদ্দ্বারাও বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইল না।

এবার ইতুর কথার বিষয় আলোচনা করা যাউক। পাঠকগণ যদি ইতুর কথা না শুনিয়া থাকেন; অথবা শুনিলেও যদি স্মরণ না থাকে, তবে আর একবার কোন গতিকে শুনিয়া পরীক্ষা করিবেন। আমরাত উহাকে দুই চারি হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিতেই পারি না। তবে দুই চারি শত বৎসরের প্রাচীন বলিতে পারি। সমস্ত কথার মধ্যেত কেবল 'উমনো', 'ঝুমনে', 'দারিদ্রি বেরুস্তন', 'সোনার চেঙড়া' 'মচর মচর পান খাওয়া' ইত্যাদি দুই চারিটী কথাই কিছু বিসদৃশ পারে, নতুবা সকলই ত সদৃশ। পূর্ব্বকালীন রচনার সকল শব্দই যে সার্থক, এরূপ বোধ হয় না। এজন্য প্রাচীন রচনার অনেক স্থানই দুর্ব্বোধ! সেগুলি প্রকৃত পক্ষে নিরর্থক হইলেও তদ্রূপ বলিতে আমাদের সাহস হয় না। কাজেই তত্তৎস্থলে আপনাদের অজ্ঞতা স্বীকার করি; অথবা যিনি বিদ্যাভিমানী, তিনি কূট কল্পনা বা উদ্ভাবনী শক্তিতে অর্থান্তর ঘটাইয়া থাকেন। আমার স্মরণ আছে, বাল্যকালে আমাদের দেশস্থ কোন লোক একটী ঘেঁটুর গান তৈয়ারী করে। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

তিন তাক্ তোলাক্ তোলাক্
ভাজনা খোলা ভাঙ্গা কিবা ফুটো।
হলদে কানি গোবর ঠুলি
তায় ঘোংগা কড়ি দুটো।
ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখে কুত্তি ছোটে,
সঙ্গে যত খশো।
বেরুলেন ঘেঁটুরায়, বসন্ত রায়ের মেসো॥

পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন দেখি, পূর্ব্বোক্ত স্থলে তিনতাক্, তোলাক্, তোলাক্, ঘোংগা, কুত্তি, প্রভৃতি শব্দ গুলির কি কিছু অর্থ আছে? উহাত বিশবৎসরের ঊর্দ্ধে রচিত হয় নাই। চাক্ষুষ না হইলে হয়ত আমরা উহাকে দুই তিন শত বৎসরের রচনা বলিয়া মনে করিতাম। তদ্রূপ সাঁজ পূজনী, যম পুকুর, ইতুর কথাতেও যদি দুই চারিটা নিরর্থক গোছের শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যে, উহারা খুব প্রাচীন এরূপ কল্পনা করিবার কোনও কারণ দেখি না।

এবার সাঁজ পূজনীর কথারও একটু আভাস পাঠকবর্গের নিকট প্রদান করা যাউক।

সাঁজ পূজন সেঁজুতী, ষোল ঘরের ষোল বত্তি,
তার ঘরে আমি বত্তি, বত্তি রেখে মানলুম বর,
ধন পুত্তুর মা বাপ নগেশ্বর।
দোলায় আসি দোলায় যাই,
সোণার দপ্পন মুখ চাই,
দপ্পন পুজ জুবড় হয়ে, সাত ভায়ের বোন হয়ে,
সাবিত্তির সমান হয়ে॥
খাট পালঙ্গ নেপ নেহারী, গিন্দে আসে পাশে,
রূপ যৈবন সদাই সুখী, সুয়ামী ভাল বাসে॥
সব সর সব, আমার ভাই গাঁয়ের বর,
বর বর ডাক পড়ে, গুও গাছে গুও ফলে।
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে,
অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়॥

• অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণ যে প্রকারে এই সকল আবৃত্তি করেন, আমরা সংশোধন না করিয়া, যথাযথ সেইগুলি উদ্ধৃত করিলাম। •

পাঠকগণ বলুন দেখি, পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে কি এমন কথা আছে, যাহাতে বাঙ্গালা ভাষাকে দুই চারি হাজার বৎসরের বলা যাইতে পারে।

যম পুকুরের কথাও একটু এই স্থলে বলি, শুনিয়া লউন।

শুষুনী কলমী ন ন করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পাখী সুখের বিল;
সোণার কৌটো রূপোর খিল।
খিল খুলতে হাতে ছড়।
আমার ভাই বাপ নক্ষেশ্বর।

দেখুন, ইহাতেও পুরাতনত্ব-পরিচায়ক শব্দ কোথায়?

মঙ্গলচণ্ডীর কথাটীও পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া উহারও কয়েক পঙ্‌ক্তি এই খানে উদ্ধৃত করিলাম।

সোণার মঙ্গলচণ্ডী রূপোর ভারা
কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা।
হাসতে খেলতে, সোণার দোল্লায় দুলতে
সিঁদুর কাজল পরতে, নির্ধনের ধন দিতে
অপুত্তুরের পুত্তুর দিতে,
বন্দীখানা খালাস করতে
এত বেলা।

পুন্নি পুকুরের কথাও এই সময়েরই বলিয়া বোধহয়, তাহারও কয়েক পঙক্তিমাত্র এস্থলে দেখান যাউক।

পুন্নিপুকুর পুষ্পুলালা
কে ভজেরে দুপর বেলা।
আমি সতী নীলবতী
ভাই বোন পুত্রবতী।
হবে পুত্তুর মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না।
বাজবে শঙ্খের ধ্বনি
তবে হবো রাজরাণী।

মহাদেবের ব্রতের কথাও এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করত পাঠকবর্গের ক্ষোভ মিটাই।

শিল শিলেটন শিলে বাটন, শিলে আছে ঘরে;
স্বর্গে থেকে মহাদেব বলে, গৌরী কি বত্ত করে
আস নাড়ন পাশ নাড়ন, তোলা গঙ্গাজল;
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর।*
ভোলা গেছে কলা ফুল তুলতে
কেষ্ট নতার পাতা।
শিব চরণে দেখা হলো
সন্নিসির গলায় পাটা।

ইহাতে শিল শিলেটন প্রভৃতি শব্দ সার্থক না হইলেও, আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, পূর্ব্বকালের সকল রচনাতেই সার্থক শব্দ ব্যবহৃত হইত না। অনেক নিরর্থক শব্দও থাকিত। তদ্ব্যতীত ঐ সকল শব্দ অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের মুখে মুখে অভ্যস্ত বলিয়া, হয়ত, কালক্রমে এমনই বিকৃত হইয়াছে, যে উহাদিগকে আর বাঙ্গালা শব্দ বলিতেই সাহস হয় না। দেখুন না, এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণ ব্রতকে 'বত্ত' বা 'বেত্ত' বলেন, যদি ঐ 'বত্ত' বা 'বেত্ত' কালক্রমে 'বোত্তো' হইয়া শেষে 'বুত্তা' কি 'ভুত্তা' হয়, তখন আর কেমন করিয়া উহার দ্বারা 'ব্রত' শব্দের বোধ জন্মাইতে পারে। এইরূপ নানা কারণে প্রচলিত শব্দগুলি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের কথা গুলি অত্যন্ত বিকৃত দেখা যায় বলিয়া উহাদিগকে প্রাচীন প্রাচীন বোধ হয়; বস্তুতঃ, উহারা যে দুই চারি শত বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত, কোন ক্রমেই এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না।

ইহারপর বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব প্রমাণকারীরা কোনও কোনও অক্ষরের সাম্যপ্রদর্শনদ্বারা যেরূপে উক্ত ভাষার প্রত্নত্ব প্রতিপাদন করেন,

আমরা একে একে সে সমুদায়ের খণ্ডন করিতেছি।

তাঁহারা বলেন, যে, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্রের সমক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, দ্রাবিড়, প্রভৃতি দেশের নানা জাতীয় অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তৎকালে বঙ্গাক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে।

আমরা বলি, যে, বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গদেশে কোনরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল না, ইহা কখনই হইতে পারে না। সুতরাং, তৎকালে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল, তিনি তাহাই লিখিয়াছিলেন; উহাই বঙ্গদেশীয় অক্ষর বা বঙ্গাক্ষর শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তিনি যে বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষর লিখিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত হইতে পারে?

তাঁহারা আরও বলেন, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এতৎ সময়ের যে সকল মুদ্রা ও তাম্রফলকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের 'ক' বঙ্গীয় ককারের সদৃশ।

আমরা এই সময়ের মধ্যে বঙ্গভাষার উৎপত্তি স্বীকার করিতে পারি। সুতরাং, তদ্বিধ সাদৃশ্য কিছু অসম্ভব নহে। তবে সে সকলের ভাষা যদি বাঙ্গালা না হয়, তাহা হইলে অন্য ভাষায় বাঙ্গালার ককার গৃহীত হইয়াছে, ইত্যাদি প্রদর্শন করা নিতাই অসঙ্গত। বঙ্গীয় ভাষা এবং বঙ্গীয় বর্ণমালা যে যে রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব। অন্যান্য ভাষার ককারের সহিত বঙ্গীয় ককারের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, তাহা বলিয়া যে বঙ্গীয় ককার হইতে তত্তৎ ভাষার ককার গৃহীত, ইহা কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি স্বীকার করিবে।

অতঃপর, তাঁহারা বলেন, যে, ইণ্ডো সাসানিয়ান শ্রেণীস্থ মুদ্রা সমূহের 'শ্রী' বাঙ্গালার শ্রীর সদৃশ। পালী 'ঝ' ও বাঙ্গালা ঝকারে একতা দৃষ্ট হয়, এবং মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার শকার, বর্গীয় জকার ও একার সংযোগও বাঙ্গালা শকার, বর্গীয় জকার ও একার সংযোগের ন্যায়।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিষয়ের উত্তর আমরা তিন বারে দিতেছি। প্রথমতঃ, পঞ্চগৌড়ান্তর্গত যাবতীয় বর্ণমালারই শ্রী প্রায় একরূপ। শুদ্ধ শ্রী কেন, যাবতীয় বর্ণেই কোনও না কোনও প্রকারে অল্পাধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটী, মারহাটী, ভোট, বর্ম্মা, উৎকল, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষার বর্ণমালা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের কুতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলেই ভাল হইত, কিন্তু অসাধ্য সাধনে প্রয়াস অপেক্ষা তাহাতে নিরস্ত থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় অথবা কথঞ্চিৎ সাধ্যায়ত্ত হইলেও সর্ব্ববিধ বর্ণমালা সংগ্রহে অযথা বিলম্ব ভয়ে আমরা তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম। তবে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রী যে প্রায়ই অভিন্ন, তাহা একবার অবলোকন করুন।

বাঙ্গালা	শ্রী
দেবনাগর	श्री
কৈথী	[illegible]
তিব্বতী	[illegible]
মারহাটী	श्री
গুজরাটী	શ્રી
উৎকল	ଶ୍ରୀ

যখন এতগুলি শ্রীতে আকৃতিগত বৈষম্য অতি অল্প, তখন কোনও কোনও মুদ্রার শ্রী যে বাঙ্গালার শ্রীর ন্যায় হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি

দ্বিতীয়তঃ। পালী ঝকার ও বাঙ্গালা ঝকারের একতা দৃষ্ট হয় বলিয়া ...

যে বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি; কারণ যে সকল বর্ণমালা পালী নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, উহারা এক সময়ের বা একরূপ আকৃতি-রও নহে। কোন্ সময়ের পালীর ঝকারের সহিত বঙ্গীয় ঝকারের সমতা দেখা যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিলেই ভাল হইত। আমরা কিন্তু পঞ্চম পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্চম পর খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরের নানা প্রকারের পালী বর্ণমালা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, উহাদের ঝকার বঙ্গীয় ঝকারের মত নহে। তবে পূর্ব্ব-পক্ষকারিগণ এই আজব কথা কোথা হইতে আনিলেন! সত্যপ্রকাশের অনুরোধেই আমরা একথা বলিতে বাধ্য হইলাম। কারণ, প্রকৃত ব্যাপার গুপ্ত রাখিয়া লোককে ভ্রমে পাতিত করা অপেক্ষা মহাপাপ আর নাই। অধিকন্ত, পালী ঝকার ও বাঙ্গালা ঝকারে একতা দৃষ্ট হইলেও প্রতিপক্ষদিগের মনোরথ পূর্ণ হইত না। কেন না আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বাঙ্গালা ভাষাতে পালির অংশ আছে। পালী বর্ণমালার কোন্ কোন্ বর্ণের আকারে বাঙ্গালার কোন্ কোন্ বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; তাহা আমরা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব। যাহা হউক, প্রতিপক্ষদিগের পালী ও বাঙ্গালা ঝকারের সাম্য প্রদর্শনও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রাস্থ শকার ও জকার যে বাঙ্গালার মত, ইহাতেও কিছু আশ্চর্য্যের কথা নাই। কারণ, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পালী ভাষার প্রচলন হইয়াছিল। উক্ত শকার ও জকার যদি পালী ভাষার হয়, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বোত্তরেই ইহারও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। তজ্জন্য এস্থলে আর নূতন

সংস্কৃত, হিন্দী, মারহাটী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার একার সংযোগ হইতে বাঙ্গালার একার সংযোগ কিছু বিভিন্ন বটে। উহাদিগের একার বর্ণের দক্ষিণোর্দ্ধভাগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ দক্ষিণোর্দ্ধভাগ হইতেই ত্রৈলিঙ্গী ভাষার একার বর্ণের উপরিভাগে আইসে। যথা ర్ఎ= কে। ঐ উপরিভাগ হইতে তামিল ভাষার একার বামদিকে ব্যবহৃত হয়। যথা கெ= কে। এই তামিলীয় একারের আকার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকল ভাষার একার হয়। যথা କେ=কে। ক্রমে ঔৎকলীয় একার হইতেই বাঙ্গালার একার হইয়াছে; যথা কে। ইহাতে আকৃতিক বৈষম্য অতি অল্প। ঔৎকলীয় একা-রের নিম্নস্থ বিন্দুটী শূন্য-গর্ভ, বাঙ্গালার সেরূপ নয়। যথা େ ে। বাঙ্গালা ও উৎকলের একারে যে বৈষম্য আপাতত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, হয়ত উহা পূর্ব্বে ছিল না। এক্ষণে মুদ্রা যন্ত্র হওয়াতে বর্ণ সকলের আকৃতির যেরূপ একীভাব আছে, হস্তাক্ষরে তদ্রূপ থাকিত না। সুতরাং, হস্তা-ক্ষরের বাঙ্গালা একারের ঔৎকলীয় একারের ন্যায় মধ্যে ছিদ্র থাকাও অসম্ভব নহে। তবেই তামিল, উৎকল, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার একার সংযোগ প্রায়ই একরূপ। পালীর একারও ঐ প্রকার। উহাই মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় ব্যবহৃত হইত।* অতএব, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্য কোন ভাষার শব্দ কি অক্ষর, বঙ্গভাষার শব্দ কি অক্ষরের অনুরূপ হইলেও, তাহাতে উহার অবরত্বই স্বীকার

* বর্ণ সম্বন্ধে আমরা যে যে মতের খণ্ডন করিলাম, মুদ্রাদির সে সকল বর্ণ প্রকৃত পক্ষে তদ্রূপ কিনা তাহা আমরা জানিনা। এক্ষণে সে সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবারও অব-কাশ নাই। সুতরাং প্রমাণকারীদিগের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছি।

করিতে হইবে ; নতুবা,পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যে বিবিধ বিসংবাদ ঘটিতে পারে।

ইহার পর পূর্ব্বপক্ষকারীরা সংখ্যাবোধক অঙ্কগুলিরও সাম্য-প্রদর্শনে বঙ্গভাষার প্রত্নত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা প্রত্যেক অঙ্কের নাম ধরিয়া একে একে তাহা-দের বিবরণ বিবৃত না করিয়া একেবারেই দেখা-ইতেছি, যে, কতগুলি ভাষার এক দুই তিন প্রভৃতি অঙ্কগুলি কিরূপ অভিন্নাকৃতি। পাঠকবর্গ পার্শ্বের স্লিপে তাহাদের আকৃতি সাম্যের উপর একবার দৃষ্টিপাত করত আমাদের বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করুন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমূল হইতেই ভারতবর্ষের যাবতীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, সেই সকল ভাষার শব্দ বা বর্ণের যে পরস্পর সাম্য পরিদৃষ্ট হইবে, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই। তবে যে ভাষা হইতে যে ভাষা অধিক দূরবর্ত্তী, তাহাতে দূরত্বের ন্যূনাধিক্যে স্বল্পাধিক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

দুধ কেমন—সাদা ; সাদা কেমন—বগের মত ; বগ কেমন—কাস্তের মত। ইহাতে যেমন ক্রমিক সাম্য থাকিলেও দূরত্ব প্রযুক্ত দুধ ও কাস্তের আদৌ সাম্য নাই ; তদ্রূপ যে যে ভাষা হইতে যে যে ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে অনুশীলন করিয়া গেলে সহজেই উভয়ের সমতা দেখা যাইবে, কিন্তু আদিম ও অন্ত ভাষার অনুশীলন করিলেই একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পূর্ব্বকথিত রীতিতে বাঙ্গালা ভাষার ক্রম নির্ণয় করিয়া পাঠকবর্গের মন-স্তুষ্টির জন্যই আমরা এই দুরূহ কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিয়াছি ; কিন্তু, তাহাতে সিদ্ধ্যসিদ্ধি সেই সর্ব্বান্তর্য্যামীর ইচ্ছাধীন। জানিনা, তিনি কি প্রকারে আমাদের মুখ রক্ষা করিবেন। তাঁহার শক্তি ব্যতীত আমাদের এক গাছি তৃণ নাড়িবারও ক্ষমতা নাই।

বাঙ্গালাভাষা কোন সময়ের ?

সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, হিন্দী, উৎকল প্রভৃতি ভাষা হইতে কিরূপে বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা অব্যবহিত পরেই প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে কোন্ সময় হইতে উহা উক্ত নামে আখ্যাত হইতেছে, তন্নির্ণয়ের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আমাদের ধারণা, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই বঙ্গভাষা স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে *। কেননা, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিআন নামক চৈনিক পরিব্রাজক এতদ্দেশে মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদীয় নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়, যে মাগধী প্রাকৃত হইতে হিন্দী,এবং হিন্দী হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হওয়া দুই তিন শতাব্দীর কমে কখনই সম্ভব নহে। বাঙ্গালার বাল্যকালের কোনও গ্রন্থ অস্মদ্দেশে বর্ত্তমান নাই। সুতরাং, এ বিষয়ের স্থির মীমাংসা হওয়াই এক প্রকার অসম্ভব। যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাও ত পাঁচ শত বৎসরের বৈ নয়। সম্প্রতি কৃষ্ণমঙ্গল নামে একখানি বাঙ্গালা কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহার বয়ঃক্রম ছয় শত বৎসরের ন্যূন নহে। বাঙ্গলা-সাহিত্য-বিবরণ বিষয়ে যে যে মহাত্মা গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই দ্বিজমাধব বিরচিত কৃষ্ণমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই। আমরা যথাযোগ্য স্থলে উক্ত পুস্তকের সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। এক্ষণে ঐ প্রাচীনতম কৃষ্ণমঙ্গল হইতেও বাঙ্গালা ভাষার শৈশবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ভাব ভঙ্গির কিছুই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অন্ধকারে হস্তামর্ষণে পদার্থাববোধ যেমন আয়াসসাধ্য, করস্পৃষ্ট বস্তুরও স্বরূপাবধারণ যেমন কালসাপেক্ষ; তদ্রূপ কোন্ সময়ে বঙ্গ ভাষা একবংশজাত ভাই ভগিনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সুবিধামত স্বীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, তন্নির্ণয়ও আয়াসসাধ্য ও কালসাপেক্ষ। যে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, কি চতুর্দ্দশ শতাব্দী আমরা বঙ্গভাষার বয়ঃক্রম বলিয়া অনুমান করিতেছি, এতৎ সময়ের মধ্যে অনেকগুলি তন্ত্রও রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ তন্ত্রের ভাষাদৃষ্টে স্বতই এরূপ অনুমান উপস্থিত হয়, যে তাহাদের রচনা কালে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম ও নূতন নূতন কথা কহিবার শক্তি হইয়াছে। বাঙ্গালার বাল্যাবস্থার সেরূপ অনেক শব্দ তন্ত্র মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়; কামধেনু তন্ত্রের দ্বাত্রিংশ পটলে লিখিত আছে—

গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য আসনে ন বসেত্তদা।
কাশীক্ষেত্রসমাভূমির্গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥

এস্থলে 'আসনে ন বসেৎ' ইত্যাদি বাক্যে 'বসেৎ' ক্রিয়া বস্ ধাতুজ। কিন্তু, সংস্কৃত বস্ ধাতুর অর্থ বাস করা, উপবেশন করা নহে। আসনে বাস করা বলিলেও অসঙ্গত হয়। অথচ বাঙ্গালা ভাষায় আসনে বসা প্রচলিত আছে। তজ্জন্য বোধ হয়, বাঙ্গালা 'বসা' হইতেই উক্ত তন্ত্রের 'বসেৎ' ক্রিয়াপদ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং, সহজেই এইরূপ অনুমিতি আইসে

---

* প্রোফেসর লাসেন (Lassen) এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসরের ঊর্দ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না।

যে, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির পর ঐ তন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে।

এক্ষণে যদি কেহ এইরূপ আপত্তি করেন যে, ব্যবহৃত হওয়ায়, কালক্রমে সংস্কৃত বস্ ধাতুরই অর্থান্তর ঘটিয়া বস্ ধাতুরই 'বসা' অর্থ হইয়া পড়িয়াছে; তাহা হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় 'বসা' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সংস্কৃতের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতের প্রচলন হইয়া উহার যতদূর বিকৃতির সম্ভাবনা, তাহাই হইয়া অনতিবিলম্বে সংস্কৃতের প্রায় একরূপ শেষাবস্থা ঘটিল। তদবধি সংস্কৃত মৃতবৎই আছে। মৃত ভাষার আর বিকৃতি সম্ভবে না আলোচনাকারীরা কেবলমাত্র পূর্ব্বপদ্ধতিগ্রহণেই আপনাপন অভীষ্ট সম্পাদন করেন। সুতরাং, প্রাকৃতাবস্থায় সংস্কৃতের যাহা বিকৃতি দেখা যায়, উহার তদিতর বিকৃতি ঘটেও নাই, ঘটিবেও না। তবে স্থানে স্থানে যতটুকু অন্যথা প্রত্যক্ষ হয়, সেগুলি রচনাকালীন ভাষানুপ্রাণিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তজ্জন্যই বঙ্গভাষার প্রচলনকালে যে যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে অগত্যা ভাষার শব্দ বা রচনা প্রণালী নয়ন গোচর হইয়া থাকে।

সপ্তবিধ আচারের বিশেষ-কথন-ব্যাপারে দক্ষিণাচারের উল্লেখের সময় তন্ত্রে লিখিত আছে—

দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিণানুষ্ঠিতোঽসৌ মতঃ প্রিয়ে।

এস্থলে এক বিশেষ ব্যতিক্রম দেখুন; সমস্ত পদের মধ্যে সন্ধি সংস্কৃত ভাষায় নিত্য, বাঙ্গালা ভাষায় বৈকল্পিক; সুতরাং 'দক্ষিণামূর্ত্তি-ঋষিণা', ইত্যাদিতে সমাস থাকিলেও সন্ধি না হওয়া বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধীয় নয় ত কি? এটীতে বাঙ্গালার ধরণ জাজ্জ্বল্যমান।

কামধেনু তন্ত্রে অন্যত্র লিখিত আছে—

'নিশ্চয়ং দেবদেবেশ কথ্যতাং পরমেশ্বর'।

এস্থলে 'নিশ্চয়ং' পদটী ক্রিয়ার বিশেষণ। কিন্তু বিশেষ্য পদে ক্রিয়ার বিশেষণ সংস্কৃত ভাষায় আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা যেমন বাঙ্গালায় শুদ্ধই হউক, আর অশুদ্ধই হউক, 'নিশ্চয় যাইব, নিশ্চয় করিব' ইত্যাদি বলিয়া থাকি, বোধ হয়, তদভ্যাসবশতই তন্ত্রীয় উক্ত 'নিশ্চয়ং' ক্রিয়ার বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু তন্ত্রে 'দদেদ্বলিম্' 'জুয়েদ্ধবিঃ' ইত্যাদিরূপ প্রয়োগেরও বহুল সমাবেশ আছে। দা ও হু ধাতুর বিধিলিঙে দদ্যাৎ ও জুহুয়াৎ হইয়া থাকে। তন্ত্রে হইল দদেৎ ও জুয়েৎ; ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যে, ইদানীং অস্মদ্দেশে মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীও যেমন অভ্যাসবশত কৃ ধাতুর বিধিলিঙ স্থলে 'করেৎ' বলিয়া ফেলেন, তদ্রূপ সহজাত অভ্যস্ততা-নিবন্ধনই দা ও হু ধাতুর বিধিলিঙে 'দদেৎ' ও 'জুয়েৎ' হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত অনেকানেক তন্ত্রে 'শৃণ্যভীতিং', 'হবিম্', 'মতঃ', 'চন্দ্রসূর্য্যাস্থ' ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োগে ব্যাকরণের শৈথিল্য-দর্শনে নিশ্চয়ই এইরূপ ধারণা জন্মে, যে, বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তির পর উহাদের রচনাকার্য্যের সমাধা হইয়া থাকিবে।

শুদ্ধ শব্দ বিষয়ে নহে, বঙ্গীয় ভাবেরও সমাবেশ তন্ত্র মধ্যে দেখা যায়। নীলতন্ত্রে লিখিত আছে—

যদি নাথ ন ব্রবীষি মম দিব্যং তদস্তু তে।

স্বামীকে মাথার দিব্য দিয়া কোনও কিছু করান, যেমন ইদানীন্তন যোষিদ্বর্গদের অভ্যস্ত, তন্ত্রে সেই ভাবটীও জাজ্বল্যমান। প্রাচীন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ ভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সুতরাং, অনেকগুলি তন্ত্রের উৎপত্তি, বাঙ্গালা ভাষার পরেই বটে।

তাই বলিয়া, সকল তন্ত্রই আধুনিক নহে।

উহাদের মধ্যে কোন কোনটী অত্যন্ত প্রাচীন। সে সকলের সবিশেষ বিবরণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া আমরা তদবধারণে হস্তক্ষেপ করিলাম না।

বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইলে তন্ত্রাদির পরেই বোধ হয়, কুলদীপিকাদি গ্রন্থনিচয় বিরচিত হইয়া থাকিবে। পাঁচ হইতে আটশত বৎসর পর্য্যন্ত উহাদের বয়ঃক্রম বলিয়া অনুমান হয়। ঐ সকল গ্রন্থে বংশ বা গ্রাম সম্বন্ধে যে সকল শব্দ পাওয়া যায়, সে গুলির অধিকাংশ সংস্কৃত বা প্রাকৃত নহে। ঐ সময়ে এতদ্দেশে মুসলমানদিগের রাজত্ব হইলেও, তাহাদের অনেক শব্দ আরবিক বা পারসিকও নহে। সে গুলি বোধ হয়, নানা ভাষার সংকলনে এমন এক বিসদৃশ আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে, যে দর্শন মাত্রেই তাহাদের জন্ম স্থির করা দুঃসাধ্য। মুখটী, ডিণ্ডী, সাহরী, রাই, পোড়ারি, হড, গুড়, পর্কটী, কোয়ারী, পলশায়ী, ঘোষলী, সেযক, বসুধাবী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, লাউডেন, চম্পটী, ঝাম্পটী ইত্যাদি শব্দ গুলির মূলানুসন্ধান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অধিকন্তু, ভট্টনারায়ণাদির সঙ্গে দশরথাদি যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহাদের উপাধি বসু, ঘোষ, গুহ মিত্র ও দত্ত এই শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দ হইলেও কিরূপে কুলবাচক হইল, তাহাই বিস্ময়াবহ। আবার যে দেশ হইতে তাহারা ঐ সকল উপাধি লইয়া আসিয়াছিল, সে দেশে কোনও কালে ঐরূপ উপাধি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য মনে হয়, যে হয়ত উহারা এদেশে আসিয়া ঐ সকল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে; তৎপরে কুলদীপিকাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। কুলদীপিকার রচনা অবিকল বাঙ্গালা। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥

আমরা যেমন বাঙ্গালায় 'দশরথ বসু' বলিয়া থাকি, এখানে সংস্কৃতেও ঠিক তদ্রূপ লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃততে 'দশরথবসুঃ' ইত্যাদিরূপ একপদ না হইলে অর্থান্তর ঘটিতে পারে। এইরূপ ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ, বিরাটাখ্যো গুহকঃ, বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ, দত্তঃ পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকঃ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন পদ লিখিত হইয়াছে। এগুলকে বাঙ্গালার নকল বলিয়াই মনে হয়; এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার বাল্যাবস্থা অতীত হইয়াছে।

বল্লাল সেনের সময়ে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপ্রদত্ত তাম্রফলক সকল দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে, যেন অক্ষরগুলি দেবনাগর ও বাঙ্গালার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। বাস্তবিক উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বঙ্গীয় ভাষা ও বর্ণমালার জাতকরণ ও নামকরণ হইয়াছে। অন্নপ্রাশনাদি অন্য সংস্কার হয় নাই। বল্লালের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে নানাবিধ মতান্তর থাকিলেও আট শত হইতে নয় শত বৎসরের ন্যূন বা অধিক কখনই নহে। ইহারও তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষার জন্ম হইলে, এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম বারশত কি তেরশত বৎসর হইবে। ইহাতে হিন্দীর দুই তিন বৎসর পরবর্ত্তীও হইয়া পড়িতেছে। ফাহিআননামা চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভ্রমণব্যপদেশে ভারত ভ্রমণ করিতে করিতে তৎকালে বাঙ্গালায় মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষোলশত বৎসর পূর্ব্বে ফাহিআন এতদ্দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহার দুই তিনশত বৎসর পরে বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তিতে কোন সন্দেহ থাকেনা। অতএব বঙ্গীয় ভাষার বয়ঃক্রম বারশত কি তেরশত বৎসর। আমরা অক্ষর মালা প্রদর্শনকালে বল্লালীয় তাম্রফলকস্থ অক্ষর সকলের অবয়বের নিদর্শন অত্যল্প পরিমাণে প্রদান করিতে ত্রুটি করিবনা।

হোএন থসাঙ্ নামক আর এক চৈনিক পরিব্রাজ্ সপ্তম খৃষ্টাব্দে ভারতভূমে ভ্রমণ করিতে আইসেন। তিনি কামরূপ ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলের ভাষা মধ্য ভারতের ভাষা হইতে বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভাষাকে আমাদের আসামী ভাষা বলিয়া মনে হয়। আসামী ভাষা বাঙ্গালার পরবর্ত্তী; এবং বাঙ্গালার উপাদানেই উহার জন্ম। সুতরাং হোএন থসাঙের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার সত্তায় আর কোনও সন্দেহ থাকিল না। অধিকন্তু, তিনি উড়িষ্যার বিষয়েও লিখিয়াছেন,যে, তথাকার ভাষা মধ্য ভারতের ভাষা হইতে বিভিন্ন। তৎকালে মধ্য ভারতে হিন্দী ও উড়িষ্যায় উৎকল ভাষার বেশ চলন হইয়াছে; সুতরাং উভয় ভাষা যে বিভিন্ন হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই। বঙ্গদেশের ভাষাকেও তিনি ঐরূপ মধ্যভারতের ভাষা হইতে বিভিন্ন বলিয়াছেন। সেই সময়ের বঙ্গ এক্ষণকার বঙ্গের সীমানুরূপ না হইলেও বর্ত্তমান বঙ্গের কতকটা যে তদন্তর্গত, তাহা ত নিঃসন্দেহ। সুতরাং, তাঁহার ভাষাকেও বঙ্গীয় ভাষা বলায় কোন দোষ সংঘটন হয় না। অতএব, তাঁহার সময়ে বঙ্গ ভাষার জন্ম হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার সংগঠন।

যে যে ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই আমরা বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে কিরূপে ঐ সকল ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষা সংগঠিত হইল, অতঃপর তাহাই বিবৃত হইবে। ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দেরই বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার দেখা যায়; তজ্জন্য সেই সকল শব্দের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। তবে প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ শব্দ আমাদের ভাষায় অন্তর্নিবিষ্ট, পশ্চাল্লিখিত শব্দ নিচয় তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল।

প্রাকৃত	বাঙ্গালা
সেজ্জা	সেজ
মউড়	মৌড়
বউল	বৌল বা মৌল
মউর	মৌর
লোণ	লোণ বা নুন
মহু	মৌ
সিয়াল	শিয়াল বা শ্যাল
গব্ভিণী	গাভিন
পুত্ত	পুত
পল্লাণ	পালান
ছার	ছার
মজ্ঝ	মাঝ
মিচ্ছা	মিছা
বম্হণ	বামন
তেল	তেল
পাস	পাশ
মাআ	মা
মোগ্গর	মুগুর
অম্ব	আঁব
বগ	বগ
জেথ্	যেথা
ইথু	এথা
হলদ্দা	হলুদ
লট্ঠী	লাঠি
ছ	ছ বা ছয়
ণঙ্গল	নাঙ্গল
দুদ্ধ	দুধ
মসান	মশান
সরিস	সরিসা
আঅরিস	আরসি
রূপ্প	রূপ, রূপা
তম্ব	তাঁবা
পন্নরহ	পনর

প্রাকৃত	বাঙ্গালা
মচ্ছি	মাছি
কজ্জ	কাজ
পচ্চিম	পশ্চিম
গব্ভর	গভর
দাঢ়া	দাড়া
মাস	মাস
পোত্থি	পোথি
কাহাবণ	কাহন
কেত্থু	কোথা

এতদ্ব্যতীত আরও প্রাকৃত অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে সকলের সংগ্রহ দ্বারা আরও বাহুল্যরূপে তালিকার কলেবর পুষ্টির কোনই আবশ্যক নাই। অতঃপর প্রাকৃত কোন্ কোন্ ধাতু বাঙ্গালায় প্রচলিত, তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রাকৃত	বাঙ্গালা
চিণ	চেনা
ছিন্দ	ছেঁড়া
বুঢ	বাড়া
ণচ্চ	নাচা
বুজ্ঝ	বোঝা
সক্ক	সকা (হিন্দী)।
ধুণ	ধোনা
শুণ	শোনা
জাণ	জানা
কর	করা
লগগ	লাগা
বুজ্ঝ	বোঝা
পুচ্ছ	পুছা
ফুট	ফোটা
গাঅ	গাওয়া
থাঅ	থাকা
পড়	পড়া
পঢ়	(বই)পড়া
মল	মলা
বুড্ড	বোড়া
হো	হওয়া
কিণ	কেনা
বেড	বেড়া
খা	খাওয়া

কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত মস্জ ধাতুর স্থানে প্রাকৃতে 'ডুব্ব'ও হয়; তাহা হইতেই আমাদের 'ডোবা' হইয়াছে। এইরূপ 'ঢক্ক' হইতে ঢাকা'। 'ছিন্ন' হইতে 'ছিণান'। 'বিচ্চে' হইতে 'বেচা' 'জপ্প' হইতে 'জপা', 'বোল্ল' হইতে বলা; 'দেখখ' হইতে 'দেখা'। আমরা পূর্ব্বোক্ত ধাতুগুলির কোন কোনটী প্রাকৃত গ্রন্থে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বটে, তথাপি আমাদের ধারণা যে, উহারা হিন্দীতেই ঐরূপ রূপান্তর লাভ করিয়া থাকিবে। প্রাকৃতে নহে। প্রাকৃতে দৃশ ধাতুর স্থানে 'পেক্খ' ও ব্রূ ধাতুর 'ভণ' আদেশই দেখা যায়। 'দেখ্খই' বা 'বোল্লই' ইত্যাদি একেবারেই বিরল-প্রচার ও অপ্রচলিত। তজ্জন্য আমাদের অনুমান ব্রূ ধাতুর স্থানে 'বোল' এবং 'দৃশ' ও 'প্রেক্ষ' ইহাদের একৈক কি উভয় স্থানে 'দেখ' হওয়া হিন্দীতেই ঘটিয়া থাকিবে। এবংবিধ আরও অনেক সংস্কৃত ধাতু হিন্দীতে রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, যথা-যোগ্য স্থলে তাহাও আমরা প্রদর্শন করিব।

প্রাকৃত ও পালী প্রকৃত পক্ষে একই। পালী প্রাকৃতেরই ভেদ মাত্র। অনেকে ইহাকে প্রাকৃতের মাগধী শাখার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু, মাগধী প্রাকৃত ও পালীতে কতকটা পার্থক্য আছে; তৎসমুদায় এই স্থানেই উল্লিখিত হইতেছে।

মাগধী প্রাকৃত বিষয়ে সংক্ষিপ্তসারের সূত্র—

মাগধ্যাং ষসোঃ শঃ।৮।৮৬।

অর্থাৎ,মাগধীতে মূর্দ্ধন্য ষ ও দন্ত্য স স্থানে তালব্য শ হয়। যথা, শোশ (রোষ), শাহু (সাধু)।

এখানে উভয় উদাহরণেই শকার হইয়াছে, কিন্তু, পালীতে অনেকস্থলেই প্রাকৃতবৎ দন্ত্য সকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, সব্ব (সর্ব্ব) সগগ (সর্গ), সনেহ (স্নেহ)। ইত্যাদিস্থলে পালীতে মাগধীবৎ কার্য্য হয় নাই।

মাগধীর অন্য সূত্র এই—

রো লঃ ৮।৮৭

অর্থাৎ র স্থনে ল হয়; যথা, মহালাঅ (মহারাজ); চলনং (চরণং)

পালীতে সর্ব্বত্র এ সূত্রানুযায়ী কার্য্য হয় না! যথা, রুক্‌খ (রুক্ষ), রাজা (রাজা)।

মাগধীর আর একটী সূত্র এই—

চিট্ঠঃ স্থঃ। ৮।৯১।

অর্থাৎ স্থা ধাতুর স্থানে চিট্ঠ আদেশ হয়। যথা, চিট্ঠদু। প্রাকৃত ও পালীতে 'ঠাঅ' আদেশই দেখা যায়। তদ্ভিন্ন প্রাকৃতে পঞ্চমী স্থানীয় 'ঙস্' স্থানে 'দো' 'ইদু' ও 'হি' হয়। মাগধীতে 'ঙসো হং' ইত্যাদি সূত্রে 'ঙস' স্থানে 'হং' হইবার বিধি আছে। যথা, বম্ভণাহং (ব্রাহ্মণাৎ) পালীতে 'হং' হয় না। বরং প্রাকৃতানুযায়ী দো, ইদু প্রভৃতিই হইয়া থাকে। এবম্বিধ দুই একস্থলে পালী ও মাগধীতে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়; তাহা হইলেও আমাদের ধারনা, যে, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, দ্রাবিড়ী, অবন্তিকা প্রভৃতি শাখা মধ্যে সামান্যরূপ যে যে বিভিন্নতা আছে, সে গুলি হয়ত কথোপকথনাদিতে ধর্ত্তব্যমধ্যে আসিত না। কেবল ব্যাকরণাদিতেই বিধিবদ্ধ হইয়া থাকিত মাত্র। যাহা হউক, পালীকে মাগধী প্রাকৃত বলিতে আমাদের বিশিষ্ট আপত্তি নাই।

যখন পালী মাগধী প্রাকৃত বলিয়াই পরিগণিত হইল, তখন প্রাকৃত সম্ভব বাক্যনিচয়ই যে উহার উপাদান, তাহা বলা বাহুল্য। প্রাকৃত ও পালীর শব্দ নিচয় প্রায়ই এক, দৈবাৎ কোথাও কোথাও সকার, ণকার ও অন্যান্য বর্ণে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায়। নিম্নলিখিত শব্দ সকলের উপর দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠকবর্গ উহাদের একতা অনুধাবন করিতে পারিবেন।

পালী	প্রাকৃত
ইত্থি	ইত্থী
দিট্ঠি	দিট্ঠি
রুক্‌খ	রুক্‌খ
খেম	খেম
থন	থণ
সেট্ঠ	সেট্ঠ
সব্ব	সব্ব
অজ্জ	অজ্জ
পুত্ত	পুত্ত
অবিজ্জা	অবিজ্জা
মজ্‌ঝ	মজ্‌ঝ
বিজ্জুলা	বিজ্জুলী
গত্ত	গত্ত
নচ্চ	ণচ্চ
পোক্‌খর	পোক্‌খর
পক্ক	পক্ক
সিনেহ	সিনেহ
সগ্গ	সগ্গ
ঞাতম্	ণাতম্
পুপ্পং	পুপ্পং
ঠানানি	ঠাণাণি
হিরী	হিরী
মচ্ছ	মচ্ছ
তুণ্হীং	তুম্হীং

পালীর পঠমো, ভুতিয়ো, চত্বারো, একাদস, তেরস্, চতুদ্দস, পন্নরস্, সোলস ইত্যাদি শব্দ সকল যে সংস্কৃত ভাঙ্গা তাহা পাঠ মাত্রেই বুঁঝা যায়। উহা হইতেই হিন্দীর তেরহ, চোদ্দহ, পন্নরহ, ষোলহ উৎপন্ন, এবং তাহা হইতেই আমাদের তের, চৌদ্দ, পনর, ষোল হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। আর মারহাটী গুজরাটী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, মৈথিলী, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষা সকল প্রকৃত হিন্দী হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হওয়াতে শব্দ সকলেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু, উহারা কোন কোন কালে এবং কোন্ কোন্ ভাষায় তাদৃক্ ব্যতিক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী শব্দ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। পালী চতুদ্দস হইতে প্রথমত চউদ্দস, তৎপরে চোদ্দস, তাহা হইতে চৌদ্দহ হইয়া সর্ব্বশেষে চৌদ্দ হইয়াছে; নতুবা পালী চতুদ্দস হইতে যে হিন্দী চৌদ্দহ হইয়াছে ইহা সম্ভবপর নহে। মধ্যে অন্য কোথাও চউদ্দস ও চোদ্দস হইয়াছিল, তাহাতে আদৌ সন্দেহ থাকিতে পারে না। তদ্রূপ সংস্কৃত হরিদ্রা হইতে প্রথমত হরিদ্দা তৎপরে হরদ্দা, তাহা হইতে হলদ্দা ক্রমে হলুদ্দা হইয়া সর্ব্বশেষে হলুদ হইয়াছে। নতুবা সংস্কৃত হরিদ্রা হইতে একেবারেই বাঙ্গালা হলুদ হয় নাই। মধ্যে আর কোথাও ঐ রূপ গুলি ছিল। কিন্তু, কোন্ সময়ে এবং কোন্ ভাষায় উহার প্রথম সংঘটন হয়, তন্নির্ণয় একরূপ অসাধ্য। মারহাটী, গুজরাটী প্রভৃতিতে দুই একটী শব্দের তদ্বৎ মধ্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু, তদ্দ্বারা, একটী শব্দের জন্য এক একটী ভাষার উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করা অপেক্ষা, তাদৃশ আয়াসকর কার্য্যের অবতারণা না করাই শ্রেয়বোধে ক্ষান্ত হইলাম।

সাহেবগণ পালীকে প্রাকৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণ যেমন বিভিন্ন,—তাঁহাদের ও আমাদের মতও তেমনি বিভিন্ন। যখন স্থান বিশেষের প্রাকৃতই পালীনামে আখ্যাত হইয়াছে, তখন উহাকে প্রাকৃতের সমকালীন বলাই যুক্তিসঙ্গত। পালী নামে কোনও স্বতন্ত্র ভাষা হয় নাই; উহার এবংবিধ নামকরণই বা কোথা হইতে হইল, তাহা সাহেবগণই জানেন। প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে তাহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। অধিকন্তু, সাহেবগণ গাথা নামে আর একটী ভাষারও উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা তাহাতেও সম্মত নহি। গাথা শব্দে কবিতা বিশেষ বুঝায় মাত্র। ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে গাথা সকল যেরূপ সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে, তাহা পুরাণ বা কাব্যাদির সংস্কৃত নহে। উভয়ে প্রভূত বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান। তন্নিবন্ধন শ্বেতাঙ্গ সূরিগণ উহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া থাকেন। আমরা, দেখিতেছি, গাথা স্বতন্ত্র ভাষা নহে। উহা প্রাকৃতেরই অগ্রজ। শব্দের কার্কশ্য ও কাঠিন্য নিবন্ধন প্রাকৃতোচিত বাক্য যেরূপ সম্প্রসারণ বিশ্লেষণাদি কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়, গাথাতেও উহার অন্যথাত্ব ঘটে নাই। অপিচ, গাথাতে বৈদিক ব্যাকরণের নিয়মও অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে কতকগুলি গাথার শব্দ সন্নিবেশিত হইল, তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, উহারাও একবিধ প্রাকৃত।

সংস্কৃত	গাথা
ধারয়ন্তি	ধারেন্তি
ন চ	না চ
মায়া	মায়
লভসে	লভে
সদা	সদ
যদা	যদ

সংস্কৃত	গাথা
যথা	যথ
রাত্র্যাঃ	রাত্রিয়ে
স্নান	সিনান
স্ত্রী	ইস্ত্রি
তুর্য্য	তুরীয়
ক্লেশ	কিলেশ
দেব্যাঃ	দেবিয়ে
নির্ম্মলান্	নির্ম্মলং
আসনাৎ	আসনিনা
ঊর্দ্ধৌহস্তৌ	ঊর্দ্ধহস্তা
দদাসি	দদসি
রংস্যসে	রমিষ্যসি
উত্তিষ্ঠ	উত্থি
শৃণু	শুনুহি
ভবিষ্যসি	ভেষ্যি
শ্রুত্বা	শুনিত্য

উল্লিখিত শব্দ সকলের মধ্যে সিনান, তুরীয়, কিলেশ প্রভৃতি শব্দে সম্প্রসারণ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। বিশুদ্ধনির্ম্মলং, আসনিনা প্রভৃতি পদে 'সুপ্তিঙুপগ্রহেত্যাদি' পাণিনীর বৈদিক সূত্রানুসারে সুপ্ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। ঊর্দ্ধহস্তা স্থলে 'সুপাং সুলুক্' সূত্রের কার্য্য দেখা যাইতেছে; এবং রমিষ্যসি, শুনুহি প্রভৃতিতে প্রাকৃতবৎ কার্য্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব গাথা, প্রাকৃত বা পালী স্বতন্ত্র ভাষা নহে। উহাদের পর ভাষাশব্দের যোগদ্বারা অনেকে প্রাকৃত ভাষা, পালী ভাষা এইরূপ বলিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তত্তৎ স্থলে ভাষা শব্দের অর্থান্তরগ্রহ করিতে হইবে। সাধুভাষা, গ্রাম্যভাষা বলিলে যেমন একটা স্বতন্ত্রভাষার বোধ হয় না, তদ্রূপ এস্থলেও প্রাকৃতভাষা বা পালীভাষা দ্বারা স্বতন্ত্র ভাষা বুঝাইবে না।

হিন্দী, বিশেষতঃ ইহার শাখাবিশেষ ব্রজ ভাষা ও মৈথিলী ভাষাই বাঙ্গালার প্রধান উপাদান। বহুদিবস হিন্দী ভাষার প্রচলন হইলে, ক্রমে ক্রমে ব্রজ ও মৈথিলী ভাষার উৎপত্তি হয়। উহারাও একবিধ হিন্দী। কিন্তু, কি প্রকারে বা কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন হইয়া হিন্দী হইতে উক্ত দুই ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা স্থির করা সুকঠিন। তদ্ব্যতীত মারহাটী, গুজরাটি, ভোজপুরী, সিন্ধী প্রভৃতি আরও কয়েকটি হিন্দীর শাখা আছে, সে সকলের সহিত বাঙ্গালার বড় অধিক সংস্রব নাই। হিন্দীর ভূরি ভূরি শব্দ সেই সকল ভাষা মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু বিভক্তির আকৃতি বা ক্রিয়া প্রকরণে তাহাদের মধ্যে প্রভূত ব্যত্যয় আছে। প্রাকৃত শব্দনিচয় কোথাও অল্প বিকৃত, কোথাও বা প্রকৃত অবস্থাতে হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়। আবার উহা হইতেই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি তদ্বিধ শব্দ প্রদত্ত হইল।

হিন্দী	বাঙ্গালা
গাভন	গাভিন
আধা	আধ
চাংদ	চাঁদ
মাঝ	মাঝ
হাথ	হাত
মুঠ	মুট
ভাত	ভাত
কায়ত	কায়েত
দেউল	দেউল
অংধার	আঁধার
আপণ	আপন
বাহ্মণ	বামন
মোটা	মোটা
বাসরু	বাছুর
গোরু	গোরু

হিন্দি, বিশেষতঃ ইহার শাখাবিশেষ ব্রজভাষা ও মৈথিলীভাষা বাঙ্গালার প্রধান উপাদান। বহু দিবস হিন্দী ভাষার প্রচলন হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রজ ও মৈথিলীভাষার উৎপত্তি হয়। উহারাও একবিধ হিন্দী। কিন্তু, কি প্রকারে বা কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন হইয়া হিন্দী হইতে উক্ত দুই ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। তদ্ব্যতীত মারহাটী, গুজরাটী, ভোজপুরী, সিন্ধী প্রভৃতি আরও কয়েকটী হিন্দির শাখা আছে; সে সকলের সহিত বাঙ্গালার বড় সংশ্রব নাই। হিন্দীর ভূরি ভূরি শব্দ সেই সকল ভাষার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়; বিভক্তির আকৃতি বা ক্রিয়া-প্রকরণে তাহাদের মধ্যে প্রভূত ব্যত্যয় আছে। প্রাকৃত শব্দনিচয় কোথাও অল্পবিকৃত, কোথাও বা প্রকৃত অবস্থাতেই হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়। উহা হইতে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে তদ্রূপ কতকগুলি শব্দ প্রদত্ত হইল।

হিন্দী	বাঙ্গালা
গাভিন	গাভিন
আধা	আধ
চাংদ	চাঁদ
মাঝ	মাঝ
হাথ	হাত
মুঠ	মুট
ভাত	ভাত
কায়ত	কায়েত
দেউল	দেউল
অংধার	আঁধার
আপন	আপন
বাম্হণ	বামন
মোটা	মোটা
বাসরু	বাছুর
গোরু	গোরু
বিচ্ছূ	বিছা
মাউসী	মাসী
সাঁজ	সাঁজ
কছু	কিছু
জিব্হা	জিভা, জিবা
অটকল	আটকাল
উংচ	উঁচু
অংব	আঁব
চমার	চামার
কাকা	কাকা
উন্টা	উন্টা
পেট	পেট
টট্টু	টাট্টু
থংড	ঠাণ্ডা
ঘোড়া	ঘোড়া
কংকর	কাংকর
বাপ, বাবা,	বাপ, বাবা
সাংকু	সাঁকো
নাতু	নাতী
গেরু	গেরি
অজ	আজ
আরু	আর
কংধ	কাঁধ
অচংভ	আচম্বা
জেঠ	জেঠা
জেঠাঙ্গ	জেঠাই

হিন্দী	বাঙ্গালা
আড়াল	আড়াল
কাল(কল্য)	কাল
পরসো	পরশু

পূর্ব্বোদ্ধৃত শব্দগুলির অধিকাংশই মারহাটী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতেও পরিদৃষ্ট হয়।

উড়িষ্যাভাষার উৎপত্তি বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। ক্রিয়া-প্রকরণে বাঙ্গালাভাষা ইহার দ্বারা অনেকটা পরিপুষ্ট হইয়াছে। যথা-স্থানে তৎসমুদায় নির্দ্দিষ্ট হইবে। উৎকল ও বাঙ্গালা ভাষার শব্দ সকল একরূপ। যে কোনও ভাষার একখানি অভিধান থাকিলেই উভয় ভাষার বার আনা শব্দের জন্য কোনও ভাবনা থাকে না। গ্রাম্য বা প্রচলিত শব্দ সকলে অনেকটা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে গ্রন্থ প্রচলিত শব্দ সকল এক বলিয়া আর এস্থলে উল্লিখিত হইল না। তবে উৎকলের টুকি হইতে বাঙ্গালার টুকু, গুড় হইতে গুল, ও বিড়া হইতে বিঁড়া হইয়াছে। উহার গোটা, টি, টা প্রভৃতি বাঙ্গালাতেও প্রচলিত আছে। যঁহি, কাঁহি, নাঁহি, কেহি, কতেক, এধার, সেধার প্রভৃতি অপভ্রষ্ট হিন্দি শব্দ। এমন্ত, যেমন্ত, কেমন্ত, তেমন্ত, হইতেই বাঙ্গালায় এমন, যেমন, কেমন তেমন ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকিলে, উৎকল ভাষা অতীব সুগম হইয়া আইসে।

আমরা যে যে ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি বলিয়াছি, অতঃপর কয়েকটী শব্দ দ্বারা ঐ সকল ভাষা হইতেই যে বাঙ্গালাভাষার সমুৎপত্তি,তাহাই বিশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিব অনেকের ধারণা যে, সংস্কৃত শব্দসকল অপভ্রষ্ট হইয়া একেবারে বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা আমাদের অনুমোদিত নহে। এবম্বিধ অনেক শব্দ বাঙ্গালায় প্রচররূপ থাকিলেও সকল শব্দই যে ঐরূপ, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, অপভ্রংশ-কাণ্ডে উভয় শব্দের মধ্যে বহুল পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয় না; ক্রমশঃ সেই কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। মনে করুন, সংস্কৃত দীর্ঘি শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'দীঘি' হইতে পারে; কিন্তু বধূ হইতে যে একেবারে "বৌ" হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইতে হয়। সুতরাং, বধূ ও বৌ এতদুভয়ের মধ্যে অন্য কোন ভাষা আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। তদ্বিধ কয়েকটী শব্দই আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিব।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	হিন্দী	উৎকল	বাঙ্গালা
পক্ক	পক্ক	পাক্কা	পকা	পাকা
পুস্তি	পোত্থি	পোথি	পোথি	পুথি
বড্	বড্ড	বড়া	বড়	বড়
গড্ডোল	গাড্ডল	গাড়ল	গাড়ল	গাড়ল
গড্ডূক	গড্ডুক	গাড়ুক	গাড়ু	গাড়ু
চতুষ্পদী	চউপদী	চৌপাই	”	চৌপায়া।
ক্ষার	ক্খার	ক্ছার	”	ছার
স্তম্ভ	থম্ভ	থংভ	থম	থাম
দধি	দহি	দহী	দহি	দই
দ্বার	দুবার	দুবার	দুয়ার	দুয়ার
দুগ্ধ	দুদ্ধ	দুধ	দুধ	দুদ
প্রস্তর	পত্থর	পত্থর	পথর	পাথর
বধূ	বহূ	বহু	বউ	বৌ

সংস্কৃত পক্ব শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'পাকা' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; একথা বলিলে বক্তার দুঃসাহসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা প, ক ও ব এই তিনটী অক্ষরে 'পক্ব' শব্দ হইয়া 'পাকা' শব্দের বেলায় 'ব' কোথায় গেল ? এবং দুইটি আকারই বা কোথা হইতে আসিল ? সহজেই এরূপ প্রশ্ন মনে হইবে। একেবারে এতটা পার্থক্য হওয়াই অসম্ভব। এতদনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল, যে, সংস্কৃত 'পক্ব' হইতে প্রাকৃত 'পক্ক' হইয়াছে। প্রাকৃতে কেবল একটী 'ব'কার স্থানে একটী 'ক'কার আসিল। এক্ষণে ঐ প্রাকৃত 'পক্ক' হইতে হিন্দী 'পাক্কা' হওয়া কিছু আশ্চর্য্যকজনক নহে ; কারণ, উহাতে কেবল একটী আকার বেশী। হিন্দীতে 'পক্কা এইরূপও লিখিত হয়। তাহা হইলেই ঐ হিন্দী 'পক্কা,' হইতে উৎকল 'পকা' ও তাহা হইতে বাঙ্গালায় পাকা হইতে পারে। যেহেতু, উৎকলে একটী 'ক'কারের লোপ এবং বাঙ্গালায় একটী আকার অধিক। এইরূপ, ক্রমশ একটী কম বা একটী বেশী দ্বারা অপভ্রংশ ব্যাপার সমাধা হইয়া থাকে। একেবারে দুই চারিটী শব্দের কম বেশী বড় হয় না। অতএব, সংস্কৃত পক্ব হইতে বাঙ্গালার পাকা নহে। মধ্যে প্রাকৃত, হিন্দী ও উৎকল আছে। তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত শব্দ গুলির দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে, যে, বাঙ্গালা ভাষা তদ্ভব ভাষা হইতে সমুৎপন্ন, তাহাতে আদৌ দ্বৈধী নাই।

অনেক সংস্কৃত শব্দও অপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাদের কতকগুলি সন্নিবেশিত হইল। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী হিন্দী বা অন্যান্য ভাষাতেও পরিলক্ষিত হইতে পারে।

সংস্কৃত	বাঙ্গালা
চ্যবন	চুয়ান
চেড়	চেলা
ছাদন	ছাওয়া
জটিত	জড়ান
যোজন	যোড়ন
ঝটিতি	ঝট
দদ্রু	দাদ
লগ্ন	লাগন
দীর্ঘি	দীঘি
ধোত্র	ধোতী
ননংদৃ	ননদ
নমন	নাবান
ফুৎ	ফুঁ
বর্দ্ধন	বাড়ান
বাটী	বাড়ী
পৃষ্ঠ	পীঠ
ঝট	ঝড়
তাপন	তাতান
তপ্ত	তত
তিক্ত	তিত
স্থান	থান
হংডী	হাঁড়ী
পবীঙ্গা	গরক
পলায়ন	পালান
বল্কল	বাকল

এই তালিকার মধ্যে যে যে বাঙ্গালা শব্দ দেওয়া গেল, উহাদের মধ্যেও কোন কোনটি হিন্দী বা উৎকলে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। সকল গুলিই যে একেবারে সংস্কৃত ভাঙ্গা, সাহস করিয়া কোন ক্রমেই এমন কথা বলা যায় না। জনক-জননীর চিহ্ন সন্তানে থাকিবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি ?

ক্রমশঃ হিন্দী ভাষার ন্যায় আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতেও আরবী ও পারসী শব্দের বহুল পরিমাণে সমাবেশ হইয়া পড়িয়াছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, কথোপকথনাদিতে আজকাল যত শব্দ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে সংস্কৃতমূলক শব্দ একার্দ্ধ, পারসী বা আরবী শব্দ অপরার্দ্ধ। তাহার দিঙ মাত্র নিদর্শন প্রদর্শিত হইতেছে। সংস্কৃত স্থান জাত 'ঠাঁই' শব্দ আর এখন আমাদের ব্যবহারে আসে না। ফার্সীর 'জগা'-জাত'জায়গা' শব্দই এখন উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্ষেত্রজাত খেত ছাড়িয়া এখন আমরা 'জমীন' জাত 'জমী' ধরিয়াছি। 'বলে'র বল এখন খুব কম; 'জোরে-র'ই জোর বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। 'মত্ততা কেবল কয়েক জন ভদ্রলোকের কাছে; কিন্তু 'নেশা' ছোট বড় কাহারও কাছে বাকী নাই। নেকা, নেঙ্গা, বোবা, হাবা, কালা, খাঁদার প্রচলিত শব্দ পূর্ব্বে কি ছিল, জানা যায় না। 'আবরণ' গিয়াছে; 'পরদা' চলিতেছে। 'কার্য্যা-লয়ে'র বদলে 'কারখানা' হইয়াছে। 'বিনিময়' নাই,'বদল' আছে। একার্থ ধাতুঘটিত'পরিচ্ছদ' ও 'পোসাকের' মধ্যে আমরা শেষটীরই বেশী বেশী আদর করিয়া থাকি। 'খাতির'এখন অদ্বি-তীয়। 'খাঁকতির'ই বা কসুর কি? 'খোরাকির' জন্য সকলেই লালায়িত। যাহারা নহে, তাহারা 'খেতাব' ও 'খেলাতে'র জন্যই ব্যস্ত। জুতা, পয়জার, খড়ম, চোগা, চাপকান, জামা, এজার, টুপি, চশমা, ছড়িতেত কাহারও অভাব দৃষ্ট হয় না। পল্লীগ্রামে হট্টজাত 'হাট' আছে বটে, কিন্তু নগরে 'বাজার' 'দোকান' ভিন্ন কথা নাই। 'লাভে'র বেলায় খুব কম, কিন্তু 'নুক সানে'র বেলাতেই বেশী বেশী। সকলেই বলেন 'গরীব'; যিনি বড় মাতৃভাষাপ্রিয়, তিনি না হয়, উহার পর 'দুঃখী' কথাটি যোজনা করিয়া মাতৃভাষারই সেবকত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'পসারে'র জন্য লোকে হাঁ করিয়া রহিয়াছে। 'আক্কেল' ছাড়া কে আছে? ঘরে বাহিরে, দোকানে বাজারে, পথে ঘাটে, ময়দানে, বাগানে সর্ব্বত্রই 'জিনিষ'। এইরূপ নানা প্রকারে সংস্কৃত শব্দ স্থানে পারসিক ও আরবিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। আর কত বলিব। আমরা এ বিষয় লইয়া আর অধিক আন্দোলন করিব না। এক্ষণে বঙ্গীয় ভাষার বিভক্তির আকৃতি ও ক্রিয়া প্রকরণের বিবরণ প্রকাশিত করিলেই আমাদের কার্য্য সমাধা হয়।

বিভক্তির আকৃতি।

আমাদের বিভক্তির আকৃতির অধিকাংশই মৈথিলী ভাষা হইতে সংগৃহীত। অন্যান্য ভাষার ন্যায় ইহারও সাত বিভক্তি। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। সংস্কৃত-প্রসূত আর সকল প্রাচ্য ভাষাতেই সেই প্রথমা বিভক্তির লোপ হইতে দেখা যায়; সুতরাং, বাঙ্গালা ভাষাতেও কর্ত্তৃকারকের কোন চিহ্ন থাকে না। যথা, রাম যাইতেছে; গোরু ডাকিতেছে, উভয়ত্র কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন নাই।

মৈথিলী ভাষার কর্ম্মকারকে 'কেঁ' হয়। কিন্তু, মিথিলার প্রদেশবিশেষে কেবল 'কে' হইয়া থাকে। ঐ 'কে' হইতেই আমাদের কর্ম্মকারকে 'কে' ব্যবহৃত হয়। যথা, তোমাকে বলিব; তাহাকে ডাক। স্থল বিশেষে ঐ 'কে'-র লোপও ঘটে। যথা, জল আন; ভাত খাও। বাঙ্গালার কর্ম্মকারকে কোনও কোনও স্থানে 'রে'ও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, আমারে ডাকিও; হরিরে সঙ্গে করিয়া আনিও। 'রে' পদ্যেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গদ্যে উহার প্রয়োগ খুব কম। কোথা হইতে 'রে

আসিয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। পুনরুল্লেখ করিব না।

মৈথিলী ভাষার করণকারকে হিন্দীর 'সে' হইতে প্রথম প্রথম সঁ, সোঁ হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা প্রাচীন প্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত। ইদানীং মিথিলাবাসিগণ করণকারকে 'এ' ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুনা যায়, নানা-কারণে মিথিলা প্রদেশের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্টতা ছিল। তজ্জন্যই বাঙ্গালাভাষা মৈথিলী ভাষার উপকরণ অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে। আমাদের করণ কারকেও 'এ' প্রচলিত আছে। যথা; জলে আগুন নিবে। অন্যান্য করণ চিহ্ন পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, তজ্জন্য এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল না।

মৈথিলের সম্প্রদান চিহ্ন 'কে'। আমাদেরও তাহাই। সংস্কৃত-ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় সম্প্রদানের তাদৃশ সার্থকতা দেখা যায়না। এজন্য হিন্দী প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় উহার উল্লেখও নাই। তত্তৎ ভাষায় সম্প্রাদান কর্ম্মস্থানীয় হইয়া থাকে। বাঙ্গালার সম্প্রদানকেও কর্ম্ম বলিলে বলা যায়।

মৈথিলীর অপাদান চিহ্ন সঁ, সোঁ। হিন্দীর সহিত ইহার কতকটা সাম্য আছে। বাঙ্গালার অপাদান মৈথিলীর বিন্দু বিসর্গও গ্রহণ করে নাই। আমাদের অপাদান চিহ্ন থেকে, হইতে। মারহাটী থী, থকী হইতে বাঙ্গালার থেকে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত স্থিত্বা হইতে বাঙ্গালার থেকে হইয়াছে। স্থিত্বার অর্থ থাকিয়া। সুতরাং, ঘর থেকে অর্থাৎ ঘরে থাকার পর। এ কথাটী নিতান্ত অসঙ্গতও নহে। তৈলিঙ্গী ভাষার অপাদান চিহ্ন 'ড়ু'; উহা হইতেই উৎকলের রু, ঠারু। ঠারুর অর্থ আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। সংস্কৃত স্থা ধাতু স্থানে প্রাকৃতে 'থা' হয়। ক্রমে 'থা' হইতে 'ঠা' হইয়াছে। তাহা হইলেই 'ঠা' শব্দের অর্থ স্থান। 'ঠারু' শব্দের অর্থ স্থান হইতে। সুতরাং, গৃহ ঠারুর অর্থ গৃহের স্থান হইতে অর্থাৎ গৃহ হইতে। ইহাতে আমাদের 'থেকে'র সহিত বড় বিসম্বাদ ঘটিতেছে না। 'ঘরে থাকিয়া বাহির হইল' বা 'ঘরের স্থান হইতে বাহির হইল, একই কথা। আমাদের আর একটী অপাদান চিহ্ন হইতে। ইহা কোথা হইতে আসিল, তন্নির্ণয় এখনও আমাদের সাধ্যাতীত। কাহারও কাহারও মত, প্রাকৃতে পঞ্চমীর বহুবচনে 'হিংতো', 'সুংতো' হয়। ঐ হিংতো হইতেই আমাদের 'হইতে' হইয়াছে। আমরা এক্ষণে ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিব না। সম্যক্ পরিজ্ঞাত না হইয়া কোনও কথা বলা আমাদের অনভ্যস্ত। জানিতে পারিলে সকলকে বিদিত করিতে ত্রুটি করিবনা, তবে প্রাকৃতিক 'হিংতো' 'সুংতো' অপেক্ষাও সুসঙ্গত একটী কথা আমাদের মনে লাগিয়াছে। বলিতে পারিনা, যে সেইটী হইতেই আমাদের 'হইতে' উৎপন্ন। যাহা হউক, কতকটা সঙ্গত বলিয়া এস্থলে বিবৃত করা গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত 'ভূ' ধাতু প্রকৃতে 'হো' হইয়া হিন্দীতে 'হোয়' হইয়াছিল। উহাতেই 'ত'-যোগে 'হোয়ত' পদ অনেক স্থানেই হিন্দীতে দেখা যায়। উহা অসমাপিকা ক্রিয়া; এবং উহার অর্থ হইয়া। ব্রজভাষাতেও এই 'হোনত' অনেক দেখা যায়। যথা, ব্রজ হোয়ত আঅল। অর্থাৎ ব্রজ হইয়া আসিল। অদ্যাপি এতদেশেও অপাদানে হইয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, কালীঘাট হইয়া বাড়ী যাইবে। হিন্দীর এই হোয়ত'কালক্রমে 'হোয়তে' হইয়া উচ্চারণ-সাম্যজন্য প্রথম প্রথম বাঙ্গালায় 'হৈতে' হইয়াছিল; ভারতচন্দ্রাদির গ্রন্থে ভূরি ভূরি হৈতে'র প্রয়োগ আছে। উক্ত হৈতে ই এক্ষণে 'হইতে

হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বোধ হয়, হিংতো অপেক্ষা এইটীই অধিক সুসংলগ্ন হয়। সম্প্রতি ষষ্ঠী ও সপ্তমীর বিবরণ প্রদত্ত হইলেই বিভক্তির ব্যাপার শেষ হইয়া যায়।

মৈথিল ভাষার ষষ্ঠীর চিহ্ন ক, কের ও র। 'ক' হিন্দীর 'কা' হইতে গৃহীত। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় ষষ্ঠী স্থানে কের বা কার এবং 'র'র ব্যবহার দেখা যায়; যথা,কতকের,অদ্যকার তাহার। কিন্তু, উৎকল ভাষার ষষ্ঠীর চিহ্ন কেবল 'র'। ভোজপুরীতেও কর, কেকর ইত্যাদি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হিন্দী কা, পাঞ্জাবী দা, মারহাটী চা, নেপালী কো, সিন্ধী জো, গুজরাটী নো। এতগুলি ভাষার ষষ্ঠী চিহ্ন পৃথক পৃথক। তজ্জন্য বাঙ্গালার 'র' মৈথিল বা উৎকল হইতে আসিয়াছে বলিলে, উহাদের 'র' কোথা হইতে এবং কি প্রকারে আসিল, তাহার নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। মারবারীদিগের কথোপকথনে ষষ্ঠীতে র প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ-রাসনামক কাব্যেরও ষষ্ঠীস্থানে 'র' দেখা যায়। হিন্দীর মধ্যে পৃথ্বীরাজ-রাসই প্রাচীনতম গ্রন্থ। উহাতে সম্বন্ধ স্থানে 'র' থাকায়, পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে 'কা' কোথা হইতে আসিল, ইহা লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলেন; যাহা হউক, ভোজপুরী 'কর' এই বিবাদের কতকটা নিরাকরণ করিয়াছে। উহা ক ও র'র মধ্যে অবস্থিত।*

*প্রাকৃত ভাষায় ষষ্ঠী স্থানে কেলক,কেরকও দেখা যায়। উহা হইতেই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভোজপুরী কর হইয়া থাকিবে। উহার 'কর'এর, মূল প্রাকৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু, প্রাকৃতে সংস্কৃতানুযায়ী কোন কোন স্থানে 'স্স' হইয়া, আবার কোথাও বা 'কেলক' 'কেরক' হইল কিরূপে; ইহার মূলানুসন্ধান বড়ই দুরূহ। দুই এক জন সাহেব অনুমান করেন, সংস্কৃত 'কৃতক' হইতে প্রাকৃতের 'কেরক' হইয়াছে। আমাদের কিন্তু, ইহা ভাল বোধ হয় না।

উহার পূর্ব্বতন ভাষাগুলি ষষ্ঠীতে 'ক' লইয়াছে; এবং অধস্তন ভাষাগুলি সম্বন্ধে 'র' গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে, যে, উড়িয়া, বাঙ্গালা ও আসামী ভাষা উহার, পর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

অধিকরণে মৈথিলীতে মেঁ, মোঁ পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। উহার আধুনিক অধিকরণ চিহ্ন 'এ'; বাঙ্গালাতেও অধিকরণে এ হয়। উৎকল ভাষার অধিকরণ চিহ্ন 'রে'। উহার সহিত বাঙ্গালার কোন সংশ্রব নাই।

কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালার কর্ম্মকারকের 'কে' প্রকৃত পক্ষে বিভক্তির চিহ্ন নহে। উহা 'প্রাক্ টেরক্ স্বার্থে' এই সূত্রানুযায়ী 'টি'র পূর্ব্বে অকাদেশ। কারক চিহ্ন হইলে সর্ব্বত্রই তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হইত।

এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই। লেখক মহাশয় যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন,তাহা তাঁহার এবংবিধ অসঙ্গত ধারণাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তিনি টি'র পূর্ব্বে যে অকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা সম্প্রাতিপদিকের পক্ষে নহে। তদ্বিষয়ে মুগ্ধবোধের সূত্রে এই—

"ত্যাদিব্যাসভোসৃক্তিস্ত্রিস্ত্রের্ব্বাক্ প্রাক্ টের্ব্যকদশ্চ"।

ইহার অর্থ এই। ত্যাদ্যন্ত, অব্যয়, স, ভ ও স্ ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বনাম পদ, এবং কেবল সর্ব্বনাম শব্দের টির (অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণের) পূর্ব্বে বিকল্পে অক্ হয় এবং অব্যয়ের ক স্থানে দও হয়।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে তিঙন্তপদ, অব্যয়, স, ভ, ওস্ ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বনাম পদ এবং সর্ব্বনাম শব্দ ভিন্ন অন্যত্র অক্ হইতে পারে না। কিন্তু, লেখক মহাশয় উহার উদাহরণ দিয়াছেন, যথা, কন্যা এব কন্যকা। পাঠকগণ! এই 'কন্যা এব কন্যকা' স্বার্থে ক'র উদাহরণ। টির পূর্ব্বে অকের উদাহরণ নয়। তাহা হইলে, 'হরি'

এই শব্দের টির পূর্ব্বে অক্ করিলে 'হরকি' হইয়া পড়ে, 'হরক' হয় না। তবেই তাহা হইতে ক্রমে হরিকে কি প্রকারে হইবে।

লেখক মহাশয়ের মত, ঐ 'অকই' 'কে' হইয়া কর্ম্মকারকবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, রামক—রামকে।

যদি তাহাই হইল, তবে 'হরকি'র ইকার স্থানে একার করিয়া 'হরকে ডাক' ইত্যাদিরূপ বাক্যে 'হরিকে' না 'হরকে, ডাকা যাইবে? কারণ, হরিশব্দে অক্ যোগে নিষ্পন্ন 'হরকি' স্থানেই কর্ম্মবৎ 'হরকে' হইয়াছে। অতএব, কাহাকে যে ডাকা যাইবে, সে বিষম সমস্যার কথা। আমাদের বোধ হয়, নাড়া চাড়া বিদ্যার দোষেই লেখকমহাশয় এরূপ বিভ্রান্ত হইয়াছেন। অপঠিত বিদ্যা বিদ্যাই নয়। যাহা হউক, এক্ষণে উহাকে স্বার্থে 'ক' ধরিয়া লইলেই বা কি হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। সকল প্রাতিপদিকের উত্তরও স্বার্থে ক প্রত্যয় হয় না। যাবাদি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর স্বার্থে ক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ক প্রত্যয় দ্বারা আর একটী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহার উত্তর সুবাদি বিভক্তি যুক্ত হইলে, তবে তাহারা সুবন্ত পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। কন্যা শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' করিয়া কন্যকা শব্দ হইল। উহাতে বিভক্তি যোগ হইলে কন্যকাকে, কন্যকাদ্বারা, কন্যকাতে এইরূপ পদ বাক্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। 'ক' প্রত্যয়ের রূপান্তরে 'কে' হইলে, কখনই উহাকে পদ বলিয়া গণ্যকরা যায় না। পদ না হইলেও বাক্যে প্রযুক্ত হইবেনা। অতএব, রামকে ডাক, হরিকে বল ইত্যাদি স্থলে স্বার্থে ক নহে; কর্ম্মবিভক্তিস্থানীয় 'কে' নিশ্চিত। স্থলবিশেষে, সেই বিভক্তির লোপ হয় বলিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্য জল খাও, বই পড় ইত্যাদি স্থলে জলকে, বইকে এরূপ প্রয়োগ হইবে না। সংস্কৃতেও 'মধুগৃহাণ' 'বারি পিব' ইত্যাদি স্থলে বিভক্তির লোপ হইয়াছে বলিয়া যে উহাদের উত্তর আদৌ বিভক্তি হয় নাই, এরূপ বলা অসঙ্গত। সুতরাং, আমাদের কর্ম্মকারকের 'কে' টির পূর্ব্বে অক্ বা স্বার্থে 'ক' কিছুই নহে। উহা বিভক্তির আকৃতিই বটে, তাহা নিঃসন্দেহ।

ষষ্ঠী-স্থানীয় 'র' লইয়াও লেখক মহাশয় 'টাঙসির্ণঃ' সূত্র দ্বারা ণ স্থানে র করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বেচ্ছোক্তি এবম্বাদিক স্থলে শোভা পায় না, অন্যত্র পাইতে পারে। মূর্দ্ধন্য ণকারের ডকারবৎ উচ্চারণ হইলে অন্যত্রও তদ্রূপ হইবে, একথা সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার্য্য। প্রাকৃতাধ্যায়ে সংক্ষিপ্তসারের আর একটী সূত্র এই।

ইণঃ শসৃঙসোর্ণোঃ।

ইণ উত্তরয়োঃ শসৃঙসোঃ স্থানে ণো ভবতি, যথা, অগ্গিণো। ইহার অর্থ এই—ইকারান্ত, উকারান্ত, শব্দের পরস্থিত শস ও ঙস্ স্থানে ণো হয়; যেমন অগ গিণো।

এস্থলে দ্বিতীয়ার বহুবচন ও পঞ্চমীর একবচন উভয় স্থলেই 'অগ্গিণো' হইয়াছে। উহারও মূর্দ্ধন্য ণকার স্থানে ডকার হইবার আপত্তি কি? তাহা হইলে তদুভয় স্থলেও বাঙ্গালার 'র'কার হইত। কিন্তু, বাঙ্গালার দ্বিতীয়ার বহুবচন বা পঞ্চমীর একবচনে রকার হয় না। অধিকন্তু, মূর্দ্ধন্য ণকারের ডকারবৎ উচ্চারণ হইতে পারে, রকারবৎ নয়। অতএব, উক্তরূপ মূর্দ্ধন্য ণকার হইতে বাঙ্গালার ষষ্ঠীর 'র' হয় নাই। আমরা একরকমে উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। বোধ করি, তাহা নিতান্ত অসঙ্গতও হইবে না।

মৈথিল ভাষায় অস্মদ ও যুষ্মদ শব্দের বহুবচনে 'হমরা' ও 'তোহরা' হয়। উহা হইতেই

বাঙ্গালার 'আমরা' 'তোমরা' হইয়াছে। সংস্কৃত এতদ্ শব্দ স্থানে মৈথিল ভাষার 'এহি'। উহা হইতেই বাঙ্গালার এই। সংস্কৃত যদ,হিন্দী জো, মৈথিল জে, বাঙ্গালা যে। সংস্কৃত তদ, হিন্দী সো, মৈথিল সে, বাঙ্গালা সে। অন্যান্য বিভক্তিতে তদ্‌শব্দস্থানে মৈথিলীতে 'তাহি' হইয়া থাকে। যথা, তাহি কৈঁ, তাহি সঁ ইত্যাদি। উহা হইতেই উৎকল ভাষায় 'তাহা' হয়। যথা, তাহাকু, তাহা ঠারু। উৎকলের ন্যায় বাঙ্গালাতেও 'তাহা' ব্যবহৃত হইতেছে। যথা, তাহাকে, তাহাদ্বারা। অতএব, বাঙ্গালার 'তাহা' উৎকল হইতে গৃহীত ; এবং উৎকলের 'তাহা' মৈথিলীর 'তাহি' জাত, তাহা নিঃসন্দেহ।

সম্ভ্রমস্থলে তদ্ শব্দস্থানে মৈথিল ভাষায় তনিকা, তনিকাকে, এবং কিম্‌শব্দ স্থানে কনিকা কনিকাকে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহা হইতেই আমাদের ভাষায় তিনি, তাঁহাকে এবং কনি, কাঁহাকে হইয়াছে। সংস্কৃত কোহি হইতে হিন্দী কেহি, মৈথিল কেহো, গ্রাম্য কেও, উৎকল কেহি, গ্রাম্য কেউ, বাঙ্গালা কেহ, গ্রাম্য কেউ নিষ্পন্ন, ইহা একরূপ অবধারিত। বিভক্তির আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। অতঃপর ক্রিয়া প্রকরণের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।



ক্রিয়াপ্রকরণ।

সংস্কৃত ভাষায় যেমন লড়াদি দশ বিভক্তিতে ক্রিয়ার কাল নির্ণীত হয়; বাঙ্গালায় তদ্রূপ নহে। উহাতে সামান্যতঃ তিন কাল; বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ। সংস্কৃত ভাষায় বর্ত্তমানকালে প্রথম পুরুষের এক বচনে 'তি' হয়। প্রাকৃতে কোন কোন শাখায় ঐ 'তি' স্থানে 'ই' হইয়া থাকে। উক্ত 'ই' হইতে প্রাচীন হিন্দীতে 'ঐ' হইতে দেখা যায়। উহারই হ্রস্ব হইয়া উৎকলে 'এ' কার হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও সেই একার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিম্নে কতক-ধাতুর তদ্ভাবে বর্ত্তমানকাল নিষ্পন্ন করা যাইতেছে।

ধাতু	সংস্কৃত	প্রাকৃত	প্রাচীন হিন্দি	উৎকল	বাঙ্গালা
স্মৃ	স্মরতি	সুমরই	সুমরৈ	স্মরে	স্মরে
কৃ	করোতি	করই	করৈ	করে	করে
স্ফুর	স্ফুরতি	স্ফুরই	স্ফুরৈ	স্ফুরে	স্ফুরে
শ্রু	শৃণোতি	শুণই	শুনৈ	শুনে	শুনে
ভণ	ভণতি	ভণই	ভণৈ	ভণে	ভণে
ক্রী	ক্রীণাতি	কীণই	কীনৈ	কীনে	কিনে
হস	হসতি	হসই	হসৈ	হসে	হাসে
ব্রূ	ব্রবীতি	বোল্লই	বোলৈ	বোলে	বলে
ভূ	ভবতি	হোই	হোয়	হএ	হয়
দা	দদাতি	দেই	দেয়	দেএ	দেয়
জল্প	জল্পতি	জল্পই	জপৈ	জপে	জপে
ভৃ	ভরতি	ভরই	ভরৈ	ভরে	ভরে
মস্জ	মজ্জতি	বুড্ডই	বুড়ৈ	বুড়ে	বুড়ে
চর	চরতি	চরই	চরৈ	চরে	চরে

সমস্ত ধাতুরই অনিশ্চিত বর্ত্তমান এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য আর অধিক বাহুল্যরূপে লিখিত হইল না। এক্ষণে নিকট বর্ত্তমানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। আমি দেখিতেছি, তুমি দেখিতেছ, সে দেখিতেছে ইত্যাদি স্থলে মৈথিল ভাষায় 'হম দেখৈতছুঁ,' 'তোহ দেখৈতছহ,' 'সে দেখৈতছি' এবং উৎকল ভাষায় 'আম্ভে দেখুঅছুঁ' 'তুম্ভে দেখুঅছ,' 'সে দেখুঅছি' হইয়া থাকে। বাঙ্গালার 'দেখিতেছি' প্রভৃতি স্থলে মৈথিল ভাষার 'দেখৈতছি'র সঙ্গেই অনেকটা একতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। উৎকল ভাষার সঙ্গে ততটা নহে। আমরা যেমন সংক্ষেপে 'আমি দেখছি,' 'তুমি দেখছ,' 'সে দেখছে' ব্যবহার করি, উৎকল ভাষাতেও তদ্রূপ সংক্ষেপে 'আম্ভে দেখুছুঁ', 'তুম্ভে দেখুছ,' সে দেখুছি' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এস্থলে উৎকল ভাষারই সহিত বাঙ্গালার সাম্য দেখা যাইতেছে। যাহা হউক, নিকট বর্ত্তমানে বাঙ্গালার ক্রিয়া মৈথিলী-জাতই বটে। দেখছি, দেখছ উহা হইতেই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে।

অন্যান্য সকল ভাষা অপেক্ষা উৎকল ভাষায় আর একটী বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে যেমন প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'অন্তি' প্রয়োগ হইয়া থাকে, উৎকল ভাষাতেও তদ্রূপপ্রয়োগ দেখাযায়; যথা, 'সেমানে দেখন্তি' = তাহারা দেখে। 'সেমানে দেখিঅান্তি' = তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। এই অন্তি প্রয়োগ হিন্দি প্রভৃতি অন্য কোন ভাষায় দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত ও প্রাকৃত জাত উৎকল ভাষা মাতা ও মাতামহীর এই লক্ষণটী পরিহার করে নাই।

ঘুরস্থ বর্ত্তমানে বাঙ্গালার 'আমি দেখিতেছিলাম,'তুমি দেখিতেছিলে,''সে দেখিতেছিল' ইত্যাদি স্থলে মৈথিল ভাষায় 'হম দেখৈতছলহুঁ,' 'তোঁ দেখৈতছলহ, 'সে দেখৈতছল' এবং উৎকলভাষায় 'আম্ভে দেখুথিলুঁ','তুম্ভে দেখুথিল', 'সে দেখুথিলা' হইয়া থাকে; এই স্থলেও 'দেখিতেছিলাম' ইহার সঙ্গে 'দেখৈতছলহুঁ' এই পদের অধিক সমতা দৃষ্ট হইতেছে;আর সংক্ষিপ্ত'দেখিতেছিনু'প্রভৃতির উৎকলের 'দেখুথিলুঁ'র সঙ্গেই অধিকনৈকট্য। মৈথিলী হিন্দী বাঙ্গালাকে সর্ব্ববিষয়েই পরিপুষ্ট করিয়াছে। হিন্দী 'দেখতা থা'র 'থা' হইতেই উৎকলের 'থিলুঁ' হইয়া থাকিবে। মৈথিলীতে উক্ত 'থ' স্থানে 'ছ' হইয়াছিল; বাঙ্গালাতে তাহাই রক্ষিত হইয়াছে।

এইবার অনিশ্চিত ভূতকালের বিষয় আলোচনা করা যাউক। 'আমি দেখিলাম', 'তুমি দেখিলে', 'সে দেখিল' ইত্যাদি স্থলে মৈথিলীতে 'হম দেখলহুঁ', 'তোং দেখলহ', 'সে দেখল' এবং উৎকল ভাষায় 'আম্ভে দেখিলুঁ, 'তুম্ভে দেখিল', 'সে দেখিলা' হইয়া থাকে। আমাদের বোধহয় মৈথিল 'দেখলহুঁ' বা উৎকল'দেখিলুঁ'ইহাদের যে কোনটী হইতে প্রথম প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় 'আমি দেখলুঁ' ইত্যাদি হইয়া থাকিবে; ক্রমে উহা হইতেই দেখিলাম হইয়াছে। দেখিতেছিলাম স্থলেও উক্ত পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে; অর্থাৎ আমি দেখছিনু ইত্যাদি হইয়া ক্রমে উহা হইতেই দেখিতেছিলাম ইত্যাদি হইয়াছে। আমাদের ভাষায় যে দেখিলা, করিলা, যাইলা, আইলা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি উৎকল জাত। কারণ, মৈথিলীতে কেবল দেখল, কবল, আঅল হইতেই দেখা যায়। অকার স্থানে ইকার হইয়া দেখিল, কবিল, থাইল, ইত্যাদি আধুনিক প্রয়োগ দাঁড়াইয়াছে।

দূরস্থ অতীতকালে বাঙ্গালার 'আমি দেখিয়াছিলাম', 'তুমি দেখিয়াছিলে', 'সে দেখিয়াছিল" ইত্যাদি স্থলে মৈথিল ভাষায় 'হম দেখৈঅছলহুং', 'তোঁ দেখৈঅছলহ', 'সে দেখৈঅছলহ' এবং উৎকল ভাষায় 'আম্ভে দেখিথিলুঁ,' 'তুম্ভে' দেখিথিল,' 'সে দেখিথিলা' হইয়া থাকে। হিন্দীর 'দেখা থা' হইতে উৎকল ভাষার'দেখিথিলুঁ' হইয়া থাকিবে।

সামান্য বা নিকট ভূতকালে আমি দেখিয়াছি, তুমি দেখিয়াছ, সে দেখিয়াছে ইত্যাদি স্থলে মৈথিলী ভাষায় 'হম দেখৈঅছহুঁ','তোং দেখৈঅছহ', সে দেখৈঅছহি' এবং উৎকল ভাষায় 'আম্ভে দেখিঅছুঁ', 'তুম্ভে দেখিঅছ,' 'সে দেখিঅছি' হয়। উৎকলের 'দেখিঅছি'র সঙ্গে বাঙ্গালার 'দেখিয়াছে'র অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। 'দেখিয়াছিল' = 'দেখি আছিল'; 'দেখিয়াছে' = 'দেখিআছে'। উৎকল ভাষা এইটীকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে। সংস্কৃত অস্তি, প্রাকৃত অত্থি,

উৎকল আছি, বাঙ্গালা আছে! মৈথিলীতেও অছি ব্যবহার লক্ষিত হয়। মৈথিলী ও উৎকলে নানাবিষয়ে সাম্য দেখা যায়। বোধ হয় বাঙ্গালার সঙ্গে মিথিলার যেরূপ ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল, ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উড়িষ্যার সহিত আরও অধিকতর ঘনিষ্টতা জন্মিয়া থাকিবে। দুইটী ভাষাকে ইহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা বলিয়া বোধ হয়।

কতকগুলি নীরস বিষয় লইয়া আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের শ্রবণখেদ জন্মাইতেছি। কি করি, কর্ত্তব্যসাধন বড় গুরুতর ব্যাপার। এক কথার বারংবার প্রয়োগে হয়ত অনেকে চটিবেন। এক্ষণে এ বিষয়ে আর অধিক আন্দোলন করিব না। সংক্ষেপে ভবিষ্যৎকালের উল্লেখ করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব। উহার অবান্তর ভেদাদির বর্ণনার আবশ্যক নাই।

ভবিষ্যৎ কালের তব্য স্থানে প্রাকৃত ভাষায় ইব্বঙ' হয়; যথা কর্ত্তব্যং=করিব্বঙ। তব্য ভবিষ্যৎ-কালদ্যোতক বলিয়া উৎকল ভাষায় ভবিষ্যদর্থে উক্ত 'ইব্বঙ' হইতে 'ইব' ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, 'আম্ভে দেখিবু' আমি দেখিব। 'তুম্ভে দেখিব'=তুমিদেখিবে। 'সে দেখিব'=সে দেখিবে। মৈথিল ভাষায় অবযোগে ভবিষ্যৎ কাল নিষ্পন্ন হয়। যথা দেখব=দেখিব। এস্থলে উৎকল 'দেখিবু' হইতে বাঙ্গালার 'দেখিব' উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। মৈথিল ও উৎকল কৃদন্ত ক্রিয়াপদের সহিতও বাঙ্গালার ভূয়িষ্ঠ সাম্য আছে, বাহুল্য ভয়ে আর সে সকলের অবতারণা করা গেল না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, বয়ঃক্রম ও সংগঠন বিষয়ে আমাদের মন্তব্য আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকাশিত করিলাম। এক্ষণে উহার বর্ণমালার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাইতেছে।

বঙ্গীয় বর্ণমালার উৎপত্তি বিবরণ।

বঙ্গীয় ভাষার উৎপত্তি, বয়ঃক্রম প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার বর্ণমালার উৎপত্তি বিষয়ক বিবরণেরও উল্লেখ আবশ্যক। যেমন অনেকগুলি ভাষার মধ্য দিয়া বঙ্গভাষা আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি লাভ করত স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছে, তদ্রূপ নানাজাতীয় বর্ণমালার ক্রমিক বিকৃতির সহায়তায়ও যে সর্ব্বশেষে বঙ্গীয় বর্ণমালার সমুৎপত্তি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথৈব অসন্দিগ্ধ। সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন হইলেও দেবনাগরীয় বর্ণমালা উহার সমকালিক নহে, অর্থাৎ বেদাদির সম্ভবকালে লিপি-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না থাকিলেও, যৎকালে উহার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, সেই আদিম বর্ণমালার নাম বা উহার বর্ণনিচয়ের আকার কিরূপ, তাহা অস্মদাদির ধারণাতীত বলিয়াই এবংবিধ নানা প্রকার গোলযোগের সংঘটন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে যাহাকে আমরা দেবনাগর শব্দে আখ্যাত করিতেছি, উহার ঐ আখ্যা কোন্ সময় হইতে প্রচলিত, তদবধারণেরও কোনও উপায় নাই। যদি পূর্ব্বোক্ত আদ্য বর্ণমালাই দেবনাগর শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত উহাই বয়ঃক্রমানুগতিক মূর্ত্ত্যন্তর-পরিগ্রহ-করত অবশেষে বর্ত্তমান দেবনাগরের আকারে পরিণত হইয়াছে, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

যেমন একই মনুষ্য পৌগণ্ডকিশোর-যুব-বৃদ্ধাদি বয়োভেদে আকৃতির অল্লাধিক বৈষম্য লাভ করে, তদ্রূপ একই দেবনাগর বৈদিকাদি বিভিন্ন কালে যে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির অধীন হইবে, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র নাই। দেবনাগর শব্দটী দেবনগর শব্দের উদ্ভব ভবার্থে ষ্ণ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; অর্থাৎ, দেবনগরে (স্বর্গাদি স্থানে) যাহার উৎপত্তি তাহাই দেবনাগর। তাহা হইলেই সংস্কৃত যেমন দেবগণের ভাষা, দেবনাগর বর্ণমালা-কেও তদ্রূপ সেই বিবুধগণের লিপি কার্য্যের উপাদান বলিতে হয়। হিন্দুদিগের মতে (সাহেবগণ বা তদ্ভক্তিগ্রস্ত দেশীয় মহাত্মারা উপহাস করিলেও) বেদোৎপত্তিকাল এক বৃন্দ ছিয়ানব্বই কোটি আট লক্ষ বাযান্ন হাজার নয় শত বিরেনব্বই বৎসর; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-সংখ্যক বৎসর পূর্ব্বে বেদের উৎ-পত্তি হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ এই, জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ প্রভৃতি ছয় মনুর অধিকার কাল সমতীত হইয়াছে; সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে; এবং সাবর্ণি প্রভৃতি সপ্তম মনুর অধিকার ভবিষ্যতে হইবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগকে চতুর্যুগ কহে; এইরূপ একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়। এক চতুর্যুগের পরিমাণ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসর। এইরূপ একাত্তর চতুর্যুগে অর্থাৎ ত্রিশকোটি সাতষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে এক মন্বন্তর হইলে ছয় মন্বন্তরে এক বৃন্দ চুরাশী কোটি তিন লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসর অতীত; এবং সপ্তম মন্বন্তরেরও বার কোটি পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয় শত বিরেনব্বই বৎসর গত; অতএব, উহাদের সমষ্টিতে জানা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত বেদোৎপত্তির এক বৃন্দ ছিয়ানব্বই কোটি আট লক্ষ বাযান্ন হাজার নয়শত বিরেনব্বই বৎসর অতীত হইয়াছে।

বেদ সকলের উৎপত্তি পূর্ব্বোক্ত-সংখ্যক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইলেও উহারা এতা-বৎ বর্ষ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবহারে আসি-তেছে না; কারণ, এক এক চতুর্যুগের অন্তে প্রলয় হয়। প্রলয়াবসানে পুনর্ব্বার কৃতাদি যুগের প্রবর্ত্তন হইলে মানবগণের অধ্যয়না-ধ্যাপনলিপিকর্ম্মাদি সর্ব্বকার্য্যের ব্যবহার হইতে থাকে। অতএব, প্রবর্ত্তমান চতু-র্যুগের কিয়ৎকাল ব্যতীত হইলে তদবধি লিপি কার্য্যাদির প্রচলন হইয়া আসিতেছে।

পুরাণাদিতে বিশ্বাস করিলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগেই লিপি কার্য্যের প্রচ-লন আছে, ইহা সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়। ইহা অতীব দুঃখজনক যে, এতদ্বিষয়ে শ্বেতকায বিপশ্চিদগণের সহিত আমাদের ভূয়িষ্ঠ মত-পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতীয় বিষয় বিশেষের উৎকর্ষ কিংবা সমীচীনতা স্বীকার করিতে যেন তাঁহারা শপথ-প্রতি-হত; তাই তাঁহারা তত্তদ্বিষয়ে সংযোজন-পরিবর্ত্তন-সংঘটন দ্বারা ভাবান্তর ঘটাইয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ছই একটী কথা বলা যাউক। সহস্র সহস্র বৎসরাবধি আর্য্য বিজ্ঞান-বেত্তৃগণের নির্দেশানুসারে অট্টালিকা চূড়ায় ত্রিশূলাকার লোহদণ্ড দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান-বেত্তারা উহার উপকারিতা বা সমী-চীনতা উপলব্ধি করিতে পারিলেও আর্য্য-প্রশস্তি-বিমুখ বলিয়াই প্রথম প্রথম তাঁহারা

অট্টালিকা-গাত্রে ঊর্দ্ধাধোলম্বমান এক এক লৌহদণ্ড নিবেশের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু, তাহাতেও অভিমত ফলপ্রাপ্তি না দেখিয়া আজকাল প্রাসাদ-শীর্ষে চতুঃশূল পঞ্চশূলাকারের এক এক লৌহদণ্ড বসাইতেছেন, তথাপি অভ্রান্তমতি আর্য্যমনীষিগণের সেই ত্রিশূলটী বসাইতে যেন তাঁহাদের জ্বর বোধ হয়। আর একটী উদাহরণ প্রদান করা যাউক। মান্দ্রাজদেশীয় সিভিল সার্বিস পদ-প্রতিষ্ঠিত R. Sewell নামে এক পণ্ডিত বলিয়াছেন,—

'I am not alone in my belief that several Indian forms have been derived from forms in religious use further west. Mr. Fergusson, for instance, thought that the well-known *Vaishnava* • *Garuda* was nothing more than the hawk-headed devinity of the Assyrians'.

তিনি আরও লিখিয়াছেন—

—'their astronomical and astrological systems, their divisions of time, and nomenculture days of the week, their alphabet, and their architecturul style, being all more or less derived from the Chaldians, Assyrians, Persians and Greeks—'

শুদ্ধ একরূপ দুই একটী বিষয়ে নহে, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের এই প্রকৃতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতীয় লিপি প্রণালী সম্বন্ধেও তাঁহাদের অভিপ্রায় পূর্ব্ববৎ। যাহাদের জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি একে একে সাত মন্বন্তর অতীত হইতেছে, তাহাদের অগ্রে যে কোন জাতির লিপি প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল, স্বজাতি-গৌরবাকাঙ্ক্ষী কোনও হিন্দুই তাহা স্বীকার করিতে পারিবে না। ডাক্তার Burnell প্রমুখ সুরিগণ বলেন, ভারতীয় লিপি-প্রণালী Semetic Source হইতে উৎপন্ন। Weber প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিতের মত যে, মিশর দেশে জুদিগের মধ্যেই সর্ব্ব প্রথম লিপি প্রণালী সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। Old Testamentই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তথা হইতেই ক্রমে ভারতে আনীত হইয়াছে।

আমাদের কেমনই দুরদৃষ্ট যে, সাহেবদের এই সমস্ত বাণী সদীক্ষ গুরুমন্ত্র-জ্ঞানে শিরোধার্য্য করিতে পারি না। যাঁহারা ঋগ্বেদকে সাড়ে তিন হাজার বৎসরের বলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের মত-সঙ্গতি সর্ব্বথৈব অসম্ভাব্য। অহো দুর্দ্দৈব!

প্রফেসর মেক্সমুলর বলেন 'that the Asoka alphabet was derived from the west. The Hindus themselves admitted that it was of foreign origin. Panini whose date is variously assigned to the fourth, third and second century B. C. calls it the 'Yavanani lipi', though the term Yavana may apply to any nation of so called barbarians out side India'.

পণ্ডিতবরের বিশ্বাসে আমরা অতীব সন্দিহান রহিয়াছি। পাণিনি কোথায় অশোকের বর্ণাবলীকে 'যবনানি লিপি' বলিয়াছেন, তাহা আমরা বহু অনুসন্ধানেও নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। অধিকন্তু, তিনি যখন অশোকের এক শতাব্দী পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কিরূপে অশোকের বর্ণাবলীকে প্রত্যক্ষ না করিয়া উহাকে 'যবনানি লিপি' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন? পাণিনি অশোকের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী; তিনি

যাহাকে 'যবনানি' বলিয়াছেন উহা Bactria দেশীয় বা গ্রীক বর্ণমালা। 'যবনানী লিপি' এইরূপ শব্দেই ব্যবহার হইতে পারে না। কারণ, 'যবনানী' শব্দেরই অর্থ 'যবনদের লিপি'। এতদ্বিষয়ক পাণিনীয় বার্ত্তিক সূত্র এই,—'যবনাল্লিপ্যাম্' অর্থাৎ যবন শব্দের উত্তর লিপি অর্থে আনুক্ আগম ও ঙীষ্ হয়; উদাহরণ যথা—যবনানাং লিপিঃ যবনানী। সুতরাং, 'যবনানী লিপি' এইরূপ অসংলগ্ন পদ প্রয়োগে ম্যাকৃসমূলরের ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতেছে। আমরা ত বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, আমাদের কপালগুণে সাহেবেরা সমস্তই বিপরীত বুঝিয়া থাকেন। কোথায় 'যবনানী' শব্দের অর্থ যবনদের লিপি, সাহেবগণ বলিয়া বসিলেন, অশোকের বর্ণমালাই 'যবনানী লিপি'। সাধু সাবধান!

পাণিনির অনেক পূর্ব্বে মাহেশ ব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছিল। সুতরাং, তাহার ও অনেক অগ্রে এতদ্দেশে লিপি প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। ইহা কেবল মাত্র আমাদের মনগড়া কথা নহে; যে ইংরাজদিগের কথায় আজকাল বেদবৎ প্রামাণ্য, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন—

It must not be forgotten that the alphabet was probably introduced long before Asoka's day; for though there is no known inscription extant earlier than 250 B.C. it is clear that the character must at that aum have undergone various modifications in India, since its introduction; for no alphabet corresponding to it has yet been discovered in Asia, though many exist of a date considerably earlier than the Budhist monarch.'

এই সাহেবদের কথাতেও বিকৃত-মস্তিষ্ক বাঙ্গালী তাঁহাদের ভ্রম ভাঙ্গিবে কি?

সংস্কৃতের ন্যায় আর কোনও প্রাচীন ভাষাতে ক, খ, গ, ঘ, দেখা যায় না। জেন্দ ও পেহেলভীতে ক, খ, গ, ঘ, আছে বটে, কিন্তু, জেন্দ ত সংস্কৃত-জাত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; পেহেলভীও পারসিক-সম্ভূত ও পালীর সমকালিক। তজ্জন্য উক্ত দুই ভাষায় ক, খ, গ, ঘ, দেখা যায়। ফলতঃ, আমরাত ভারতীয় বর্ণমালাকে বিজাতীয় মূল সম্ভব বলিয়া কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না।

Jhon Dowson নামে কোন শ্বেতকায় সুধী ভারতীয় বর্ণমালার বিজাতীয়োপকরণ আদৌ স্বীকার করেন না। তিনি লিখিয়াছেন—

'Why should it be thought a thing incredible that the Hindus should have invented for themselves an alphabet? They were the greatest masters of the details of language that the world has ever known, and as before urged, the perfection to which they carried their niceties of grammar and distinction of vocal sounds made an alphabet a necessity to them. Further, they showed their powers in the invention of characters by the formation of a system of numerical notation, which, so far as is known, has no parrallel.'

General Cunningham বলেন,—

It seems that the Indians, must

have worked out their system (of writing) quite independantly অর্থাৎ ভারতীয়গণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই আপনাদের লিপি প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

Dowson ও Cunningham সাহেবের মতে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আর্য্যদিগের (ভারতীয় ব্যতীত আর কোনও জাতিই আর্য্য নহে, তাহা আমরা সময়ান্তরে প্রতিপন্ন করিব) পূর্ব্বে যে আর কোন জাতি সভ্যতার উচ্চাসন লাভ করিয়াছিল, একথা আমাদের কাছে সর্ব্বতোভাবে অমর্ষণীয়। উঁহাদের প্রকৃষ্টতা স্বীকার করিয়া যিনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমরা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব; তদ্বিপরীত হইলেই সহ্য করিতে পারিব না; যথাসাধ্য উহার প্রতীকারে সচেষ্ট থাকিব।

সাহেবগণের অভ্রান্ত মতানুসারে ভারতের বর্ণমালার উৎপত্তি হাজার তিনেক বৎসর হইতে পারে। এতৎ-প্রতিপত্তির জন্য তাঁহাদের যে কয়েকটী প্রমিতি আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

তাঁহারা বলেন, যে মহাভারতে লিখিত আছে যে, বেদ বিক্রয়, বেদ লিখন, এবং উহার কদর্থীকরণে নিরয়গামী হইতে হয়। তিন হইতে ছয় শতাব্দী পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে মহাভারতের রচনা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

এতদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য এই যে, মহাভারতে যে কুরুপাণ্ডবদিগের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা কলি যুগের প্রারম্ভেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের প্রধান সহায় ছিলেন; যাঁহার চক্রে দুর্য্যোধনাদির পতন ও যুধিষ্ঠিরাদির অভ্যুদয় হয়, সেই বাসুদেব দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ হইয়া কলির কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন, একথায় কে অবিশ্বাস করিবে। অতএব, মহাভারতের বয়ঃক্রম পাঁচ সহস্র বৎসর; দুই হাজার আড়াই হাজার নয়।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়দিগের লিপী প্রণালী প্রচলিত ছিল। ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিল না। অধিকন্তু, মহাভারতের রচনাকালে দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বক্তা ও অদ্বিতীয় লিপিকুশল গণপতি লেখকের পদে বৃত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারতের রচনাকালে অনেকেই লিখিতে জানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গণেশই শ্রেষ্ঠ। বহুকাল ব্যবহৃত না হইলে আর এরূপ ঘটিতে পারে না। সুতরাং, মহাভারতের রচনারও দুই এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিপি কার্য্যের প্রথম প্রচলন অনুমিত হইতেছে। তবেই এক্ষণকার সাত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যদের লিখন-পদ্ধতি অবধারিত হইয়া পড়িল।

তৎপরে, রামায়ণের কথা পাড়িলে আরও অনেক পূর্ব্বে লিপিপদ্ধতির সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্নানার্থ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ক্রৌঞ্চনিধন সন্দর্শনে মহাত্মা বাল্মীকির মুখ হইতে

মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ
শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ
কামমোহিতম্॥

এই অভিনব ছন্দোবদ্ধ স্বচ্ছন্দপ্রবৃত্ত সর-

স্বতী-শ্রবণে যখন পিতামহ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রামচরিত বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন, এবং তদনুসারে রামায়ণ রচিত হইল; তৎকালেও লিপিকার্য্যের ভূয়িষ্ঠ প্রচলন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, লিপিবদ্ধ না হইয়া রামায়ণ রচিত হয় নাই। এক্ষণে রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয় করা যাউক। ইংরেজেরা অবশ্যই তিন হাজার বৎসর বলিবে। আমাদের দেশীয় কুলকণ্টকেরাও তাহাতে মত-প্রদান করিতে ছাড়িবেন না। ত্রেতাযুগের শেষে রামাবতার হইয়াছিল। তৎকালে রামায়ণের রচনা স্বীকার করিতে হইলে, উহার বয়ঃক্রম এক্ষণে আট লক্ষ বৎসরেরও অধিক। কিন্তু এই পৌরাণিক প্রবাদ সর্ব্ববাদিসম্মত নয় বলিয়া আমরা না হয় উহার পরিহার করতঃ ইতিবৃত্তমূলক লোকপরম্পরা-প্রচলিত প্রবাদের অনুসরণ করিতেছি। ইদানীং অস্মদ্দেশে যে সকল ক্ষত্রিয় (ছেত্রী) জাতি বাস করিতেছে, তাহাদের কেহ কেহ আপনাদিগকে লব কিংবা কুশের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দেয়।

মিবারের রাণাগণ সূর্য্যবংশীয়। রামচন্দ্র হইতে এই বংশ চলিয়া আসিতেছে। রামচন্দ্রের পুত্র লবের চতুঃপঞ্চাশৎ পুরুষ সুমিত্র হইতে এই রাজবংশের উদ্ভব হয়। সুমিত্র হইতে নবম কনকসেন সৌরাষ্ট্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপরে মহামদন সেন, সুদান্ত সেন, ও বিজয় সেন রাজা হন। ইনি বিজয়পুরের স্থাপয়িতা। অতঃপর পদ্মাদিত্য, শিবাদিত্য, পুরাদিত্য, সূর্য্যাদিত্য, সোমাদিত্য ও শীলাদিত্য ক্রমান্বয়ে রাজ্য করিয়াছিলেন। শীলাদিত্যের পুত্র গ্রহাদিত্য। ইহার পর তদ্বংশীয় নাগাদিত্য, ভাগাদিত্য, দেবাদিত্য, অশাদিত্য, কালভোজ প্রভৃতি রাজগণ একপ্রকার রাজ্যহীন ছিলেন। তৎপরে বাপ্পারাওএর উদ্ভব হয়। ইনিই এই বংশের প্রসিদ্ধ বীর। ইনি রামচন্দ্র হইতে অশীতি পুরুষ অন্তর। এক এক জনের রাজ্যকাল গড়ে ৬০ বৎসর ধরিলে রামচন্দ্র হইতে বাপ্পারাও পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০ বৎসর হইবে। আর বাপ্পারাও হইতেও বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ১০০০ বৎসর। অতএব এক্ষণকার ৬০০০ ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাম বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকালে রামায়ণ রচিত হইলেও উহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ছয় হাজার বৎসর। সুতরাং ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের লিপি প্রণালীর সত্তা স্থিরীকৃত হইয়া পড়িতেছে।

ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, যে, বৌদ্ধদেব বাল্যকালে নানা জাতীয় বর্ণ লিখন শিক্ষা করিয়াছিলেন। সাহেবদের মতে বৌদ্ধদেবের বয়ঃক্রম এক্ষণে ২২।২৩ শত বৎসর। হিন্দুরা জানে যে ২০১২ অতীত কলিতে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং, তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় দুইহাজার সাত শত বৎসর। যাহা হউক, যখন মহাভারত দ্বারা পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ও রামায়ণে ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিপি প্রণালী প্রমাণিত হইতেছে, তখন এই তিন হাজারের ও কমের কথার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

সংস্কৃতে যেমন খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ কেবল মাত্র তত্তদ্বর্ণ দ্বারাই সমাহিত হয়; পৃথিবীর অনেকানেক প্রধান প্রধান ভাষাতে তাদৃশ

উচ্চারণ কেবল মাত্র একটী বর্ণ-সাহায্যে সম্পন্ন হয় না; বর্ণান্তর-সংযোগ অপেক্ষা করে। গ্রীক ভাষায় মোটে 'থেটা' ও 'ফি' এই দুইটি বর্ণ আছে, তজ্জন্য উক্ত ভাষায় থ, ঘ, ছ, ঝ প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ-সমাধান অবশ্যই বর্ণান্তর-সমবায়-দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। হিব্রু ভাষায় 'ভেথ', 'খেথ' 'খাফ' 'ফে' ও 'থাভ' আছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতের সমসংখ্যক নহে। সুতরাং, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় লিপি প্রণালী কোন দেশের আমদানী নহে। উহা ভারত-সমুদ্ভূতই বটে, তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, সংস্কৃতের 'ম্' বা অনুস্বার পাঁচ বর্গে পরিণত হয়; পৃথিবীর আর কোনও প্রাচীন কি নব্য ভাষায় এতাদৃশ আগমবিধি দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় তিনটী শকার। শ, ষ, স। গ্রীক ভাষায় একমাত্র 'Sigma' আছে। হিব্রু ভাষায় 'Samech', 'Shin', 'Sigma', আছে বটে, কিন্তু, সামেচের উচ্চারণ কিছু স্বতন্ত্র; সুতরাং উক্ত ভাষাতেও 'শিন' ও 'সিন' ব্যতীত শকার নাই। আরবী ভাষায় 'ছে' 'ছাদ' 'ছিন' 'শিন' ইত্যাদি বর্ণ চতুষ্টয় বিদ্যমান থাকিলেও আদ্যত্রয়ের পার্থক্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরাত ঐ তিনটীর এক রকমই উচ্চারণ বুঝি। তৎপরে আরবী বর্ণ মালার বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসরের ঊর্দ্ধও নহে। সুতরাং, উহা হইতে সংস্কৃতে আসা সম্ভব নয়। অতএব যাঁহারা সংস্কৃতের লিপি প্রণালী বিজাতীয় মূলসম্ভব বলিয়া কল্পনা করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মতে তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রশস্তধী সম্পন্ন সুধীর সন্নিকটে অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন, সংস্কৃত বর্ণমালার স্বরবর্ণ মধ্যে ঋকার ও ৯কার আছে; আর কোন ভাষায় এরূপ আছে কি? ভারতের সবই নূতন ধরণের। কাহারও সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য ছিল না, থাকিবেও না। জোর করিয়া এতদ্দেশীয় বিষয়-বিশেষের সহিত অন্য দেশীয় বিষয় বিশেষের সামঞ্জস্য-প্রদর্শন-প্রয়াস কর্ত্তব্য নহে। ভারতের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, লিখন, পঠন, সবই যেন স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং সমুৎপন্ন হইয়া আবহমান কাল পর্য্যন্ত সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এহেন ম্লেচ্ছ সংঘর্ষণেও যখন ভারতীয়দিগের সেই সকল অক্ষুণ্ণ; কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

General Cunningham প্রমুখ পণ্ডিতগণ graphic art সম্বন্ধে যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসমুদায় কতকটা কৌতুকাবহ বটে, তজ্জন্য আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা বলেন, 'প্রথম প্রথম চিত্র দ্বারাই একার্য্য সম্পাদিত হইত; অর্থাৎ পর্ব্বত শব্দ বুঝাইবার জন্য একটি পর্ব্বতের চিত্র, অরণ্য শব্দের বোধের জন্য একটি বনের প্রতিরূপ অঙ্কিত হইলে তত্তৎশব্দের বোধ জন্মাইত। এইরূপ চাক্ষুষ সকল পদার্থের জন্য সেই সেই পদার্থের প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হইয়া কালক্রমে উহার কিঞ্চিৎ উন্নতি সংঘটনে অংশ-বিশেষ-দ্বারাই সমস্ত অবয়বের বোধ হইতে লাগিল। যথা, মনুষ্যশির দ্বারা মনুষ্য; পক্ষিশির দ্বারা পক্ষী। এবম্প্রকার কৌশল দ্বারা কেবলমাত্র চাক্ষুষ পদার্থের অভিব্যক্তির সুবিধা ঘটিল বটে, কিন্তু ভাববাচক বিশেষ্য শব্দ প্রকাশের অভাব জন্য উপায়ান্তর অবলম্বিত হইয়াছিল; অর্থাৎ, শৃগালের প্রতি-

রূপে ধূর্ত্ততা, বানর দ্বারা ক্রোধ, চরণযুগ্মে গমন, সশস্ত্র পাণিদ্বয়ে যুদ্ধ, খনিত্র চিত্রে খনন এবং চক্ষু দ্বারা দর্শন শব্দের বোধ হইত। পরন্তু, ইহাতেও সর্ব্বপ্রকার মনোভাব প্রকাশের সুবিধা সংঘটিত না হওয়ায় অধস্তন কালে ক্রমশঃ বর্ণমালার উৎপত্তি ঘটিয়াছে'।

Cunningham সাহেবের পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বনিচয়ের সারবত্তা থাকিলেও আর্য্যদিগের কাছে ও কথা বড় বেশী খাটিতে পারে না। যাহাদের জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেই বেদ বিরচিত হইয়াছিল এবং মনুষ্যাদির সৃষ্টির পর সেই বেদোক্ত বাণী তাহাদের কণ্ঠস্থ থাকায় যখন সেই বেদপ্রচলিত ভাষাই তাহাদের কথোপকথনের মূল হইয়াছিল, চিত্র দ্বারা সেই ভাষার প্রকাশ একবারেই অসম্ভব। কারণ, প্রথমেইত দেখা যাইতেছে, যে শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, অনুরক্তি, বিরক্তি, অনুমান, প্রমাণ, ন্যায়, যুক্তি, প্রেম, প্রয়াস, সংযোগ, বিয়োগ প্রভৃতি ভূরি ভূরি শব্দ কিরূপে চিত্রদ্বারা প্রকাশিত হইবে? ভাল, যদিও বহ্বায়াস ও বহু চিন্তন দ্বারা কোন গতিকে তাহার মীমাংসা ঘটে;* অথবা, আমরা না হয়, উহাদেরও সম্ভাবিতা স্বীকার করিয়া লইলাম; কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যাহারা একার্থক হইলেও বিভিন্ন লিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন স্তব ও স্তুতি; আকার ও আকৃতি; ব্যবহার ও ব্যবহৃতি, গমন ও গতি। কোন চিত্র দ্বারা ইহাদের বোধ জন্মাইতে হইলে অবশ্যই স্তবস্তুতি' একই চিত্র দ্বারা দেখাইতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কালে যখন বেদাদি, লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন কিরূপে উহাদের লিঙ্গের পার্থক্যবক্ষা ঘটিয়াছিল, তাহা অস্মদাদির বোধাতীত। শুদ্ধ

* পুরাকালের মিসর দেশীয় hieroglyph দ্বারা জানা যায়, যে, তৎকালে উক্তদেশে করতাল-বাদিনী স্ত্রীলোকের চিত্রে আহ্লাদ শব্দের বোধ জন্মাইত। ধূপদান পাত্রে সদগন্ধের জ্ঞান হইত। কিন্তু এইরূপ বহুবিধ শব্দের জন্য বহুবিধ চিত্রের প্রয়োজন হওয়াতে পরবর্ত্তীকালে এক এক শব্দে বহুতর অর্থ প্রকাশের নিয়ম হইয়াছিল। যেমন উপবিষ্ট মনুষ্য দ্বারা পিতা, ভ্রাতা, রাজা, শিক্ষক যাজক, পুরোহিত ইত্যাদি নানা প্রকার অর্থ বুঝিতে হইত। এইরূপ এক খণ্ড চর্ম্মে নানা জাতীয় পশু এবং চর্ম্ম নির্ম্মিত সমস্ত দ্রব্যই বুঝা যাইত। যাবতীয় মূল্যবান প্রস্তর এবং তন্নির্ম্মিত সকল অলঙ্কার একটী অঙ্গুলিতে বোধ-গম্য হইত। এবং হস্ত সম্পাদ্য সকল কর্ম্মের জন্য এক যষ্টি হস্তের ব্যবহার দেখা যাইত। আদি কালের আসিরীয় ভাষাতে মনুষ্যের নামের জন্য । এইরূপ একচিহ্ন ব্যবহৃত হইত; দেশের নামের জন্য এইরূপ এবং যাবতীয় শৃঙ্গী পশুর নামের জন্য এইরূপ চিত্র দেখা যাইত। চৈনিক heiroglyphyতে সৎ এই শব্দের জন্য এইরূপ এক চিত্রের প্রচলন ছিল।

এইরূপ নানা কারণবশতঃ আমার পূর্ব্বকথিত শব্দ নিচয়ের কথঞ্চিৎ সম্ভাবিতা স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু Sir. G. Cornewall Lewis নামক কোন পণ্ডিত তদীয় History of Ancient Astronomy নামক গ্রন্থে heiroglyphic প্রথার উপর তীব্র প্রতিবাদে বলিয়াছেন—'that the results (of heiroglyphs) have been obtained by a series of vicious hypothesis.' ফলত, heiroglyphic প্রথা যে কোন ক্রমেই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, তদ্বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই নহে, সংস্কৃতে একই শব্দ সাত বিভক্তিতে সাতরূপ আকৃতি গ্রহণ করে; তজ্জন্য অশ্রদ্ধার প্রতিরূপে অশ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধাম্, অশ্রদ্ধয়া, অশ্রদ্ধায়ৈ, অশ্রদ্ধায়াঃ, অশ্রদ্ধায়াঃ, অশ্রদ্ধায়াম্ ইহাদের কোনটিকে বুঝা যাইবে? তৎপরে আবার প্রত্যেক শব্দের এক বচন দ্বিবচন বহুবচনাদি বিভাগ ধরিতে গেলে মহা গোলযোগ*। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ঝঞ্ঝাট আছে, তন্মধ্যে একত সন্ধিপ্রকরণ। সন্ধিতে কোন কোন বর্ণের লোপ হয়; অথবা কোন কোন বর্ণস্থানে বর্ণান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য আমরা এস্থলে একটী বৈদিক মন্ত্রের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

অশ্রদ্ধামনৃতেহ্ দধাচ্ছ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ।

এস্থলে 'অদধাচ্ছ্রদ্ধাম্' এই অংশস্থ শ্রদ্ধা শব্দেরই প্রতিরূপ অঙ্কিত হইলে, পরবর্ত্তী কালেও 'অদধাৎ শ্রদ্ধাম্' এইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকিত। তাহাতে ত সন্ধিপ্রকরণের বৈয়র্থ্য প্রতিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। কেননা চিত্র দ্বারা কিছু 'চ্ছ্রদ্ধা' শব্দের জ্ঞান জন্মিতে পারে না; কারণ, উহা নিরর্থক। অতএব অস্মদ্দেশে Cunningham কথিত রীত্যনুসারে লিপিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যেখানে মনুষ্য-সৃষ্টির পর ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তথায় এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটিতে পারে না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। হিন্দুদের মূল ভাষা অপৌরুষেয়। মনুষ্যগণের সাহায্যে কেবলমাত্র উহার স্ফুরণ হইয়াছে অন্য কিছুই নহে। অনেকে হয়ত অনুমান যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অস্মদ্দেশেও মনুষ্যাদির জন্মের পর ভাষাসৃষ্টি প্রতিপন্ন করিতে সাহসী হইবেন; কিন্তু, স্থিরবিশ্বাসী লোকদিগের নিকটে অনুমানপ্রভৃতির প্রতিপত্তি অতি অল্প। সাহেবরাও নানা কৌশলেই বেদকে পৌরুষেয় বলিবার বহুবিধ উপায় করিয়াছেন। আত্মগরিমাবান্ লোক কোন্ মুখে তন্মতের পোষকতা করিবেন? বৈদিক ভাষা সমবায়ে যেরূপে বর্ণমালার ক্রমোৎপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা যথাযোগ্য স্থানে প্রকাশ করিব, এক্ষণে কানিংহাম সাহেবের আর একটী কথার আলোচনা করা যাউক।

তিনি বলেন, যে, Indo Pali বর্ণমালার খ, খননসাধন কোদাল হইতে সংগৃহীত; এইরূপ যব হইতে য; দন্ত হইতে দ; ধনু হইতে ধ; পাণি হইতে প; মুখ হইতে ম; বীণা হইতে ব; নাসা হইতে ন; রজ্জু হইতে র; হস্ত হইতে হ; লাঙ্গল হইতে ল; শ্রবণ হইতে শ।

সাহেবদের অনুমান সাহেবদের দেশেই খাটিতে পারে। আমাদের দেশে খাটিবে

* খ্রীষ্টীয় শকের তিন শতাব্দী অতীত হইলে একরূপ heiroglyphic ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাতে দ্বিবচন বহুবচনের জন্য এক প্রকার post fix এবং কারকের জন্য কয়েকটী preposition ব্যবহৃত হইত। কিন্তু, Monumental textএ সে সকলের নামগন্ধও নাই; অর্থাৎ, তাৎকালিক চিত্রদ্বারা লিঙ্গ-কারকাদির পার্থক্যবোধ হইত না। তৃতীয় শতাব্দীর ভাষা যে গ্রীক, লাটিন, আরবিক প্রভৃতি ভাষার অনুকৃতি-জন্য, তদ্বিষয়ে অনেকেরই ঐকমত্য আছে; যাহা হউক, মিসরদেশীয় heiroglyphic প্রথার অনুকরণে সংস্কৃত বর্ণমালার উদ্ভব হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ।

কেন? তাঁহাদের Alphabetএর মূল ইব্রানী (Hebrew) Aleph বৃষশৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। অথবা (Beth) ও না হয় গৃহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু, আমাদের দেশে ও সকলের সম্ভাবিতা কিরূপে হইবে? তাঁহারা যে পালীর উপর নির্ভর করিতেছেন, সেই পালীরও অনেক পূর্ব্বে এতদ্দেশে লিপিকার্য্যের ভূয়িষ্ঠ প্রচলনের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। পালীকে এই দেশের আদ্য বর্ণমালা বলা বিধেয় নহে; কারণ, অশোকের সময়ের পূর্ব্বতন পালীতে শ ও ষ এই দুই বর্ণের ব্যবহার দেখা যাইতেছে না। সুতরাং, অধস্তনকালীন বর্ণমালায় ঐ বর্ণদ্বয় কিরূপে প্রবেশ লাভ করিবে? যাহা হউক, General Cunningham সাহেব পদার্থ বিশেষ হইতে যে কয়েকটি বর্ণের উৎপত্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমরা সেই কয়েকটী প্রাচীন বর্ণ এস্থলে উদ্ধৃত করত পাঠকবর্গের দৃষ্টিবিষয়ীভূত করিতেছি, তাঁহারা সেই সেই দ্রব্যের সহিত উহাদের কতটা সাম্য আছে, বিচার করিয়া লইবেন।

প্রাচীন পালীর 'খ'র আকৃতি 'ʔ' এইরূপ; ইহার সঙ্গেত কোদালের কোনই সাম্য নাই। অতএব কোদালের প্রতিকৃতিতে পালীর 'খ'র উৎপত্তি কোন মতেই সম্ভব নহে। যবের আকৃতি ত পাঠকবর্গ জানেনই; দেখুন দেখি প্রাচীন পালীর ⅃ অন্তঃস্থ যকারের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্য আছে কি না। দন্ত হইতে 'দ'র উৎপত্তি হইলে উভয়ে অবশ্যই তুল্যদৃশ্যতা থাকিবে; কিন্তু দন্তে ও পালীর ⊐ দকারে তুল্যদৃশ্যতা কোথায়? সাহেব বলেন, পাণি হইতে প হইয়াছে; পাঠকবর্গ প্রাচীন পালীর ⋃ পকারে ও আপনাদিগের পাণিতে পার্থক্য আছে কিনা পরীক্ষা করুন। মুখ আছে বলিয়া মুখ হইতে 'ম'র কথা বলা তাঁহার মত লোকের শোভা পায় না। কারণ, পালীর ৪ মকারে ও মুখে একতা কৈ? কানিংহামের মত, যে বীণা হইতে 'ব'র উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু পালীর ◻ বকার বীণার আকারের অনুরূপ নহে। যদিও কিন্নরী, ব্রাহ্মণী, রুদ্র, শারদীয় প্রভৃতি আখ্যাভেদে বীণার আকারেরও কিছু কিছু ইতর বিশেষ হইতে পারে; কিন্তু বংশদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অলাবু যোজন ব্যতীত যে অন্যাকারের বীণা হইতে পারে, তাহা আমাদের অবিদিত। আমরা দেখিতেছি, কানিংহাম সাহেবের সকল অনুমানগুলিই সারবিহীন; কেবলমাত্র ধবিষয়ক অনুমানটীতেই তিনি যথাসম্ভব কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন; যেহেতু ধনুতে ও পালীর D ধকারে কতকটা সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে, একথা সত্য। পালীর I রকারের আকার উর্দ্ধাধোলম্বিত সরল রেখার ন্যায়; সাহেবের অভিপ্রায় যে উহা রজ্জুর অনুরূপ, সুতরাং, রজ্জু হইতে 'র' হইয়াছে। আমরা, এস্থলে রকারের আকৃতি সন্নিবেশিত করিলাম, রজ্জুর সহিত উহার তুলাবিচার সাধারণের নিকটেই রহিল।

কানিংহাম সাহেবের আর একটী কথা এই যে, নাসিকার আকারানুযায়ী পালীর নকারের আকার হইয়াছে।

তাঁহার এ কথারও সঙ্গতি অতি অল্প। পালীর নকারের আকৃতি ⊥ এক সমকোণ বিশিষ্ট সরল রেখার ন্যায়; ইহার সঙ্গেত নাসিকার আদৌ সাধর্ম্ম্য নাই। Princep

সাহেব প্রাক্ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পালী-বর্ণমালার যেরূপ প্রতিকৃতি প্রকটিত করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তদনুসারেই বর্ণনিচয়ের আকৃতি বিচার করিতেছি। কারণ, তাৎকালিক বর্ণমালার তাদৃক্ আকৃতিতে আমাদের বড় অধিক সন্দেহ নাই। দুই একটী বর্ণে অত্যল্প আকৃতিবৈষম্য থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু, সাধারণ্যে তত নহে।

এইবার পালীর লকারের আকৃতির বিচার করা যাইতেছে। সাহেব বলেন, উহা লাঙ্গলের আকৃতি-জাত। আমরা দেখিতেছি উহার আকৃতি লাঙ্গলের ন্যায় নহে। বরং কতকটা ইংরাজি 'ইউ'র ন্যায় U; উভয় রেখা সমশীর্ষ নহে; বামভাগস্থ রেখা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র; উহাই কি লাঙ্গলের আকৃতির অনুরূপ? মানিলাম, না হয়, আড়াই হাজার তিন হাজার বৎসরে তাৎকালিক লাঙ্গলেরও আকার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু, প্রদত্ত লকার চিত্রকে কোন মতেই খননোপযোগী বলিয়াত বোধ হয় না। অতএব, লাঙ্গল হইতে লকারের উৎপত্তি হয় নাই। তৎপরে হস্ত হইতে 'হ' হওয়ার কথার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পালীর U হকারে ও হস্তে তুল্যাকৃতিবিধান চেষ্টা একেবারেই বৃথা প্রয়াস। তবে জাগতিক সর্ব্ব পদার্থেরই পরিবর্ত্তিশীলতা অপরিহার্য্য বলিয়া যদি তিন হাজার বৎসরে হস্তের আকৃতিও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবংবিধ ধারণার অধীন হইয়া তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাজেই আমরা তদ্বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করিব! পাঠকবর্গ! হস্তের আকৃতির পরিবৃত্তি শুনিয়া অবাক্ হইবেন না ত?

অবশেষে আর একটীমাত্র বর্ণের বিচার হইলেই আমাদের কার্য্য সমাধা হয়। সেটী শকার-বিচার। সাহেবের অভিপ্রায় উহা শ্রবণ হইতে জাত।

আমরা সাহেবের উক্তরূপ অভিপ্রায়ে বিস্মিত হইয়াছি; বিস্ময়ের কারণ এই যে, অশোকের সময়ের পূর্ব্বে পালীর যে যে আকার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তালব্য শকারের ব্যবহার দেখা যায় না। বাস্তবিক, পালী যে প্রাকৃতের অপভ্রংশ, সেই প্রাকৃতেও সাধারণতঃ তালব্য শকারের প্রয়োগ কোথায়? তালব্য শকারই নাই, অথচ শ্রবণ হইতে উহার উৎপত্তি বলা বিস্ময়জনক নয়ত কি? অশোকের সময়েও যে শকার দেখা যায়, তাহার আকার ʃ| এইরূপ। ইহাও শ্রবণের সমাকৃতি নহে। অতএব, কানিংহাম্ সাহেবের সমস্ত অনুমানই একেবারে অপ্রামাণিক।

সাহেবদের মত, Indo Pali ও Arian Pali নামে দুই প্রকার বর্ণমালা আদিকালে বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতেই অনেকগুলি বর্ণমালার উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

আমরা স্থানান্তরে সে কথার পুনরুল্লেখ ও মীমাংসা করিব। এক্ষণে কানিংহাম সাহেবের উক্ত কথার প্রামাণিকতা কত দূর, তদ্বিষয়ক বিচারেই অগ্রে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আর্য্যদের (আর্য্য শব্দের প্রতিশ্রুত মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠকগণ আর্য্য শব্দে হিন্দু বুঝিয়া লইবেন) ধর্ম্ম, আর্য্যদের ভাষা, আর্য্যদের বর্ণমালা কিছুই অনুমানাদির উপর নির্ভর করে না; সুতরাং, তাঁহাদের যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংই সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে অনুমানা-

দিব সাপেক্ষতা আদৌ নাই। কোন কোন পদার্থের আকারে যদি Indo Pali বর্ণমালার সম্ভব হইযা থাকে, তাহা হইলে সকল গুলিরই তদ্ভবে সমুৎপত্তি ঘটিবেক, কেবল-মাত্র দুই চারিটীর নহে। কানিংহাম সাহেব সকলগুলির উৎপত্তির কারণ প্রদর্শন করিযা সর্ব্বতঃ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তৎপরেত, তৎকথিত পালিরও অনেক পূর্ব্বে এতদ্দেশে বর্ণমালা বা লিপিপদ্ধতি ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। আমরা এস্থলে সাহেবের বাক্যেই তাঁহার একটী ভ্রমপ্রদর্শন করিতেছি। যদি পাণি হইতে প এবং হস্ত হইতে হ হইয়া থাকে, তবে পাণি ও হস্ত কি ভিন্নাকারের পদার্থ? নতুবা উহা হইতে দুইটি ভিন্নাকারের বর্ণ বাহির হইবে কেন? সাহেবদের অঁটুনি খুব, কিন্তু গ্রন্থি প্রায ফশকা হয়। আমাদের ধারণা, তাঁহারা আর্য্যসংক্রান্ত বিষয়ে প্রায়ই বিপরীত বুঝেন। H. F. Talbot নামে কোন শ্বেতকায় বিপশ্চিৎ স্থির করিয়াছেন, যে, উর্দ্দু 'চাঁদি' (রৌপ্য) শব্দ হইতেই সংস্কৃত 'চন্দ্র' শব্দ উৎপন্ন হইযাছে!

অহো দুর্দ্দৈব! কোথায় চন্দ্রবৎ শুভ্র বলিয়া উহার অপভ্রষ্ট 'চাঁদ' হইতেই 'চাঁদি' শব্দের উৎপত্তি, তাহা না হইয়া 'চাঁদি' হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইল; এত অল্প বিড়ম্বনার কথা নহে। এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বিপরীত বুঝিয়াই তাঁহারা সর্ব্বনাশ করিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। বরং, আমাদের অনেকে আবার তাহাতেই মত প্রদান করত আপনাদের বাহাদুরী জানাইতেছেন। নিয়তি প্রতিকূল হইলে হিতে বিপরীত ঘটিবেই, এত শাস্ত্রীয় কথা। ইহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?

ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশের ইদানীন্তন বর্ণমালা পালীবর্ণমালারই অপভ্রংশজ বলিয়া স্থির প্রতীতি জন্মে। এককালে ঐ সকল দেশেও সংস্কৃত ভাষা অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয, কিন্তু, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং, তথা হইতেও প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালার কোন সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই। তথায় অস্মদ্দেশ প্রচলিত পুরাণাদির প্রচলন আদৌ নাই। সেখানে পিতকজাতকাদিই ধর্ম্ম-গ্রন্থস্থানীয়। অধিকন্তু, তত্তদ্দেশবাসীরা আজ পর্য্যন্ত লিখন-পঠনাদি সর্ব্বকার্য্যারম্ভে এতদ্দেশীয়দিগের শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীহরি, প্রভৃতির ন্যায় 'নমো ভুত্তায়', 'নমো তস্য ভগবতো' ইত্যাদিরূপ বুদ্ধ-স্মরণ-প্রণামাদি ক্রিযার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একারণ তাঁহাদের গ্রন্থাদির বয়ঃক্রম তিন হাজার বৎসরের উর্দ্ধ বলিযা কল্পনা করা যায় না। সুরিতলেপ নামে এক গণিত-বিষয়ক গ্রন্থ শ্যামবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে; তাহাদের ধারণা যে উহা প্রথম কল্পে (প্রথোম্ম ক্লব) ব্রহ্মা (ক্রোম) দ্বারা বিরচিত হইযাছিল। উহার ভাষা সংস্কৃতও নহে, তাহা হইলেও না হয় তাহাদের এ ধারণা বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারিত। অথচ পালীও নহে; কারণ প্রাচীন পালীতে উহার টীকা প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, উহাও একরূপ ভিন্নাকারের সংস্কৃত। দূরত্ব-বশত কিঞ্চিৎ ভিন্নাকার-পরিগ্রহ করিয়াছে। যাহা হউক, যদি আমরা উক্ত গ্রন্থের প্রাচীনতম কোন হস্ত-লিপি পাইতাম, তাহা হইলেও কতকপরি-

মাণে আমাদের ভাবনার পথ পরিষ্কৃত হইতে পারিত। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানত অত্যল্প, সংসারের অণু পরমাণু হইতেও আমরা ক্ষুদ্র। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষাদোষে দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; পাঠকগণ যে আমাদের কাছে এবিষয়ের সন্তোষজনক মীমাংসা পাইবেন, তাঁহাদের সে আশা যেন একেবারেই না থাকে। ঈশ্বরদত্ত শ্রবণ-শক্তি থাকাতে ভালমন্দ সকলই শুনিতে হয়; আমাদের কথাগুলিকেও উহাদের একতম ভাবিয়া শুনিয়া লইবেন এইমাত্র অনুরোধ। নতুবা, একটা সিদ্ধান্ত জানিলাম বলিয়া যে আপনারা আনন্দে অধীর হইবেন, মাদৃশ জনের কাছে, তাহা শশবিষাণবৎ নাম মাত্র পর্য্যবসিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এক্ষণে সাহেবদের Indian Pali ও Arian Paliর বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যাউক। তাঁহারা বলেন, যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উক্ত দুই প্রকার বর্ণমালার প্রচলন ছিল; সিন্ধুনদের সমীপস্থ জনপদ সমূহে Arian Pali ব্যবহৃত হইত। ইহা আরবীকারসীর মত দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত বা পঠিত হয়। আর হিমালয় হইতে পশ্চিমে গুর্জ্জর প্রদেশ এবং পূর্ব্বে গঞ্জাম রাজ্য ও সিংহল দ্বীপে Indian Paliর ব্যবহার দেখা যাইত; ইহা হইতেই ভারতীয় অন্যান্য বর্ণমালার সমুৎপত্তি হইয়াছে। অশোকের খোদিত লিপি সমূহে উভয়বিধ বর্ণমালাই পরিগৃহীত দেখা যায়।

Arian Pali ও Indo Pali অবশ্যই সাহেবদের দেওয়া নাম। তাহা যে আড়াই হাজার তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইহা কখনই সম্ভব নহে। আমরা যতগুলি অশোক খোদিত প্রস্তর লিপির বিবরণ পাঠ করিয়াছি, তাহাদের একটীও দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত নহে। সাহদিয় রাজাদিগের প্রাচীন আরবিক অক্ষরে লিখিত অনেক মুদ্রা দেখা যায়, অক্ষরের অস্পষ্টতার জন্য বোধ হয়, সেই গুলিতে সাহেবদের ভ্রম হইয়া থাকিবে। প্রাচীন ভাষা বা অক্ষরের স্বরূপ নির্ণয় গুরুতর কথা; তাহাতে ভ্রম হয় না, এরূপ লোক অতি বিরল। যাহা হউক Indian Pali ও Arian Pali যখন সাহেব দত্ত নাম, তখন আর উহার বিচারাদি বা মীমাংসা কিইবা করিব! ফলতঃ যে কোন প্রাচীন বর্ণমালা ভারতে দেখা যায়, সকল গুলিই (অবশ্য যাবনিক ছাড়া) দেবভাষার অক্ষর-মূলক, তাহাতে আর তিলার্দ্ধও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইবার আমরা নানা সময়ের নানারূপ অক্ষরের বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

পাঁচসহস্রবৎসরপূর্ব্বে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহার কতকটা নিদর্শন পাঠকবর্গের সম্মুখে প্রদত্ত হইতেছে। অবশ্য এত প্রাচীন কালের হস্তাক্ষর দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, তদুপরি আবার ইহার বিবরণ শুনিলে সকলেরই আহ্লাদের পরিসীমা থাকিবে না। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত নামক অতীব উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, একথা সকলেই অবগত আছেন। পাতিয়ালার মহারাজের বাটীতে অদ্যাপি একখানি অতীব জীর্ণ কোটিকীটদষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত আছে; এইরূপ প্রবাদ যে ঐ পুথিখানি মহাপুরুষ ব্যাসদেবের স্বহস্তলিখিত। উহা কোনরূপে সংগৃহীত হইয়া

এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত উক্ত রাজবাটীতে সুরক্ষিত এবং প্রত্যহ পূজিত ও চন্দন চর্চ্চিত হইয়া থাকে। সুযোগ পাইলে এবং অর্থাদির দ্বারা প্রলোভিত হইলে, পূজক ব্রাহ্মণগণ পুথিখানি খুলিয়া কাহাকে কাহাকেও অক্ষরের আকৃতি দেখাইয়া থাকেন। এক্ষণকার কোনও লোক আর ঐ অক্ষর পাঠ করিতে পারেন না। শুনা যায়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ রাজ্যে একজন পর্ব্বত-প্রমাণ বনবাসী যোগী আসিয়াছিলেন, তিনি নাকি ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলকে বিমোহিত করেন। যাহা হউক, মদীয়াধ্যাপক পাতিয়ালার মহারাজের সভাপণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দিগ্বিজয়ী মহাশয় অনেক কষ্টে আমাকে দুই চারিটী অক্ষরের নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন; সেই গুলিই যথাযথ খোদিত করিয়া পাঠকবর্গের গোচরে অর্পণ করিলাম। কিন্তু সে গুলি ক কি খ কি আর কোন বর্ণ তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। সেজন্য পাঠকগণের ক্ষোভ হইবে বটে, কিন্তু কি করি, তাহাতে আর উপায়ান্তর নাই। আমি বলিয়াছিলাম, ভাগবতের গোড়াতেই 'জন্মাদ্যস্য' আছে, আপনি ঐ চারিটি কোন গতিকে লিখিয়া আনিবেন, তাহা হইলেই আমরা এইটি 'জ', এইটি 'ন্ম', এইটি 'দ্য', এইরূপ বুঝিয়া লইতে পারিব; কিন্তু উক্ত পুথি ভাগবতের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা এত জীর্ণ শীর্ণ কীটদষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যে তাহাদের অক্ষরের আর আকৃতি প্রকৃতি কিছুই বোধগম্য হয় না। অতএব যাহা পাইয়াছি, তাহা দেখিয়াই সকলকে মনঃক্ষোভ মিটাইতে হইবে। নিম্নে দেখুন।

অক্ষরগুলি যেমন পাইয়াছি, তেমনি দিলাম, কিন্তু মূল পুথিতে উহাদের আকার ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কি বৃহৎ তাহা জানি না। একজন শ্বেতকায় পুরুষের হস্তে এই অনুসন্ধানের ভার থাকিলে, তিনি উহাদের আকৃতি এক ইঞ্চির কত অংশ ঠিক করিয়া স্কেল করতঃ লিখিতেন, দেশীয়দের এ সব ধারণাতেই আইসে না। যাহা হউক, পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ সুযোগে উহাদের কতকটা তথ্যানুসন্ধান করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়।

অশোকের বর্ণাবলীর সঙ্গে ইহাদের কোনটীরই সামঞ্জস্য নাই। কেবল শেষেরটি যদি 'ক' হয়, তাহা হইলে ওটী কতকটা পূর্ব্বকালের 'ক'র মত বটে। অশোকের পূর্ব্বকালের ক দেখিতে ঢেরার ন্যায়। এটী তাহা অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বের বলিয়া হয়ত, ঠিক ঢেরার মত হয় নাই; না হইলেও কতকটা যে তদ্রূপ ইহা নিঃসন্দেহ; বোধ হয় খুব প্রাচীন কালের 'ক' ঐরূপই ছিল, ক্রমে ক্রমে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা উহাকেই ব্যাসদেবের অর্থাৎ পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব কালের 'ক' ধরিয়া লইলাম; ক্রমশঃ ককারের আকার যেরূপ পরিবৃত্তি লাভ করিয়াছে, যথাযথ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ককারের আকার + এইরূপ ছিল, ক্রমে অশোকের সময়ে এইরূপ আকৃতি হয়; উহার পর এইরূপ; তাহা হইতে এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমাদের বোধ হয়, এই ককার আরও পশ্চিম দেশে গিয়া তামালীর ককাররূপে পরিণত হইয়াছে।

তামালীয় ককারের আকার ক এইরূপ; ইহা হইতে অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ ককার হইতেই প্রাচীন নাগরীর ককারের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। প্রাচীন নাগরীর ককারের আকার এইরূপ। বর্ত্তমান দেবনাগরের ককারের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার মাত্রাটি কেবলমাত্র একদিকে, অর্থাৎ বামে প্রসারিত; দুই দিকেই নহে। আর ইহার স্কন্ধভাগটি অধিকতর দীর্ঘ।

তিব্বতীয় ভাষার অনেক অক্ষরের আকৃতিতে বাঙ্গালার অনেক অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহার ককারের আকার বড় কদাকার। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ককারের সহিতই উহার সমতা দেখা যায় না *। যাহা হউক, উল্লিখিত পুরাতন নাগরীর ককার বাঙ্গালা ককারের মূল। কালক্রমে উক্ত ককারের ঘাড় ছোট হইয়া যায়; এমন কি কুণ্ডলীর উপরেই মাত্রা পড়ে; তাহা হইলেই যখন উহা ক এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল তখনই উহা হইতে বাঙ্গালা ক উৎপন্ন হইয়াছে। ১২।১৩ শত বৎসর বাঙ্গালাভাষার বয়ঃক্রম, ইহা আমরা বাঙ্গালা ভাষার বয়ঃক্রম বিচারে প্রমাণিত করিয়াছি। বল্লালসেনের যে সকল খোদিত লিপি আমরা পাইয়াছি, উহাদের অক্ষরগুলি কতক বাঙ্গালা ও কতকটা হিন্দীর মত বোধ হয়। ইহাতে স্বতই এইরূপ অনুমান হইবে, যে নাগরী হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তির উহাই সন্ধিস্থল।

ক'র বিচার একরকমে নিষ্পন্ন হইল। এক্ষণে খ'র আকৃতি নির্দ্দেশ করা যাউক। বাসদেবের হস্তলিখিত খ কিরূপ, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই। কিন্তু, আড়াই হাজার বৎসরের যে সকল লিপি আমরা দেখিয়াছি, উহার খ'র আকৃতি এইরূপ। ক্রমে উহা হইতেই এইরূপ আকার হয়। তৎপরে, উহা হইতেই পালি ভাষায় খকারের আকার এইরূপ দাঁড়ায়। ইহার পর কি প্রাচীন নাগরী, কি তিব্বতীয় বর্ণাবলী, কি মধ্য এসিয়ার বর্ণমালা, কি উৎকল দেশীয় অক্ষর সকল, কোনটীরই খ বাঙ্গালা খকারের সদৃশ নহে; তজ্জন্য আমাদের বোধ হয়, উক্ত পালী খ কালক্রমে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ [illegible] বিযুক্ত হইয়া এইরূপ আকৃতি [illegible] বঙ্গীয় খকাররূপে পরিণত হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় খকারের আর কোন পূর্ব্বরূপ আমাদের নয়নগোচর হইতেছে না।

বাসদেবের গ কিরূপ আমরা জানি না; কিন্তু আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বে গকারের আকার Λ এইরূপ ছিল, তাহা জানা গিয়াছে। ক্রমে অশোকের সময়ে উহা ∩ এইরূপ আকারে পরিণত হয়। ইহার পরবর্ত্তী কালের অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালের যে সকল মুদ্রা দেখা গিয়াছে, উহার গকার ∩ এইরূপ। জানি না ইহা হইতেই মধ্য এসিয়ার নাগরী অক্ষরের গকার উৎপন্ন হইয়াছে কিনা। আকৃতি-সাম্য কিন্তু ভুয়িষ্ঠ পরিদৃষ্ট হয়। উহার আকার গ এইরূপ। ইহার পরই তিব্বতীয় ও পুরাতন নাগরীর বর্ণমালা কিছু স্বতন্ত্র ভাবে গকারের আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে। অর্থাৎ, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত উহার উপরি-ভাগটী গোলাকার দেখা যাইতেছিল, এই দুই ভাষায় আর তদ্রূপ দেখা যায় না; এক্ষণে উহা বা এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের নাগরীর গকার গা এইরূপ; ইহা হইতে কিন্তু আমাদের বাঙ্গালার গ উৎপন্ন নহে; বাঙ্গালার গ উৎকলীয় গকার হইতে উৎপন্ন। উৎকলীয় ভাষার গকারের আকৃতি এই প্রকার, গোলত্ব সাম্যে উহা হইতেই বাঙ্গালার গ'র উৎপত্তি সহ-

* সাহেবদের অনুমান, মধ্য আসিয়ার বর্ণমালা প্রাচীন নাগরী অক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী; ঐ অক্ষরগুলিই তিব্বতীয় অক্ষরের জন্মদাতা। আমরা এই অক্ষরগুলি দেখিয়াছি; তিব্বতীয় অক্ষরের ন্যায় শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বটে; যদি কেবলমাত্র এই সমতা দৃষ্টেই উহাকে তিব্বতীয় বর্ণমালার জনক বলিতে হয়, বলিলাম; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বর্ণগুলির আকৃতি সাম্য খুবই অল্প।

অনুমিত হইয়া থাকে। এস্থলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, যে পুরাতন নাগরী। পরবর্ত্তী ঔৎকলীয় বর্ণমালা উহার গ'র অনুকরণ করে নাই কেন? ইহার উত্তর এই যে, উৎকল ভাষা অনেকটা তেলেগু ভাষার নিকট ঋণী; পূর্ব্বকার গোল গ হইতে তেলেগুর গ হয়; পরে উৎকলেও সেই গোল ভাব আছে, ক্রমে বাঙ্গালায়ও সেই ভাব সম্পূর্ণ বাজায় রহিয়াছে, অতএব উহাই বাঙ্গালার গকারের মূল।

তৃতীয় বর্ণের উৎপত্তি বিবরণ শেষ হইল। এইবার চতুর্থ বর্ণের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশের ঘ'র আকৃতি স্বতন্ত্র ছিল; পূর্ব্বকার গুরুমহাশয়গণ আনাগোনার ঘ লিখাইতেন। আনাগোনার ঘ'র আকৃতি কিরূপ, তাহা বোধ হয়, পাঠকবর্গ বিস্মৃত হন নাই। অশোকের সময় হইতে গুপ্তবংশীয় রাজাদের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত আনাগোনা 'ঘ'বই প্রচলন ছিল। ঐ সময়ের ঘ এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা হইতেই পুরাতন নাগরীর ঘ এইরূপ আকারে পরিণত হয়। ইহাই ঔৎকলীয় ঘকারের জনক; উৎকল বর্ণমালার ঘকারে এই আকারের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে, কেবল উপরিভাগটি গোল, এইমাত্র বিশেষ। এই ঔৎকলীয় ঘ কি পুরাতন নাগরীর ঘ হইতে বাঙ্গালা ঘ উৎপন্ন হয় নাই। বর্ত্তমান নাগরীর ঘ হইতেই বাঙ্গালার ঘ হইয়াছে। দুইটি ঘ পাশাপাশি রাখিয়া দিই একবার দৃষ্টিপাত করিলেই উহাদের আকৃতি সাম্য স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইবে। ঘ ঘ। অতএব বেশ জানা যাইতেছে, বর্ত্তমান দেবনাগরীর ঘই আমাদের চতুর্থ বর্ণের মূল।

শব্দোৎপত্তি স্থলে পূর্ব্বে আমরা যেমন দেখাইয়াছি একটা মৌলিক শব্দ পরপরবর্ত্তী ভাষায় ক্রমশঃ কেমন পরিবৃত্তি লাভ করিয়া শেষে এক নূতন শব্দ হইয়া উঠিয়াছে; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বর্ণোৎপত্তিস্থলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই; ইহাতেও পূর্ব্বাপর অল্পাধিক সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপর অল্পাধিক সাদৃশ্যপ্রদর্শনই আমাদের প্রমাণের প্রধান বল। ককারাদি বর্ণচতুষ্টয়ে এই রীতি সর্ব্বতোভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চম বর্ণের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

অনেক প্রাচীন কাল হইতে অশোকের সময় পর্য্যন্ত আমরা দেখিতেছি 'ঙ'র আকৃতি এইরূপ। ইহার পরবর্ত্তী কালে এবং গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের সময়ে ঐ 'ঙ'র নিম্নস্থ সরল রেখাটী অগ্রভাগে ঈষৎ বক্র হইয়া অধোমুখ অর্থাৎ এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর আমরা দেখিতেছি তিব্বতীয় ভাষার ঙ এইরূপ। ইতিমধ্যে পুরাতন নাগরীতে ঙ ঙকারবৎ আকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্ত্তমান দেবনাগরীর পঞ্চম বর্ণের আকৃতি ङ এইরূপ। উহা হইতে আমাদের 'মাথাপাগাড়' ঙ হইয়াছে*।

প্রথম পাঁচটির বর্ণের মূলানুসন্ধান ও উৎপত্তি প্রদর্শিত হইল। অপরাপর বর্ণেরও তদ্রূপ প্রদর্শন অধুনাতঃ আমরা স্থগিত রাখিলাম। কারণ, ইহাতে নানাবিধ অক্ষরের সমাবেশ থাকায়, কার্য্যটি বড়ই বায়সাধ্য ও প্রভূত সময় সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। যদি কখন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার আবশ্যক হয়, তৎকালে বক্রী কার্য্য যথাযথ সম্পন্ন করিব। এক্ষণে এই স্থলেই আমাদের গ্রন্থসমাপ্তি হইল।

* এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা অনেক অক্ষরের নাম করিলাম; কিন্তু, তিব্বতে আর এক রকমের অক্ষর আছে, সেগুলিকে 'বর্জু' বর্ণমালা বলে। ইহার অনেক (প্রায় সকলই) অক্ষর বঙ্গীয় অক্ষরের তুল্যাকার। যিনি বাঙ্গালা অক্ষর পড়িতে পারেন, তিনি দেখিলেই অনায়াসে এই অক্ষরগুলিও পড়িতে পারিবেন। ইহাদিগকে কেহ কেহ ১২। ১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে মগধদেশ হইতে তিব্বতে সমানীত বলিয়া প্রমাণিত করিলেও আমরা এগুলিকে আধুনিক বলিয়াই বিশ্বাস করি। তজ্জন্য, ইহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই। নতুবা ইহাদের সহিত বঙ্গাক্ষরের যেরূপ আকৃতিসাম্য, তাহাতে প্রথম দৃষ্টিতে অনেকেই ইহাকে বঙ্গাক্ষর না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না।

সম্পূর্ণ।